





সংসার-চক্র।

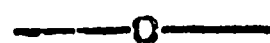
ধর্ম্মমূলক সামাজিক উপন্যাস।



শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।



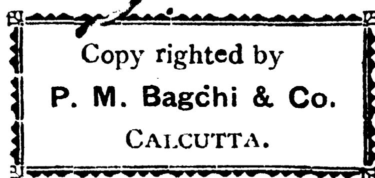
প্রথম প্রচারণ।

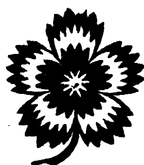


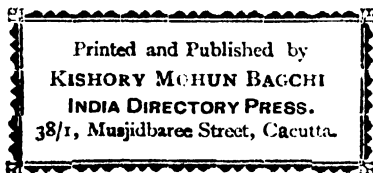
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং।

কলিকাতা

মূল্য ২ টাকা।






Printed and Published by
KISHORY MOHUN BAGCHI
INDIA DIRECTORY PRESS.
38/1, Musjidbaree Street, Cacutta.

উপহার পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থখানি

আমার



প্রদত্ত হইল।

তারিখ শ্রী

সাং

নিবেদন।

জীবনসংগ্রামে আজকাল মানুষ এত বিব্রত যে ধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব সকল বিশেষ মস্তিষ্কচালনা করিয়া উপলব্ধি করিতে কাহার সময় হয় না, বা কেহ তাহা চেষ্টা করেন না—যাঁহারা করেন, তাঁহারা সাধারণ পাঠক নহেন। সাধারণ পাঠক পাঠিকা উপন্যাসছলে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন—তাহাই তাঁহাদের রুচিপ্রদ।

এই জন্য আজকাল বাজারে এত উপন্যাসের প্রচার এবং তাহার কাটতিও এত অধিক। উপন্যাস সরল ও সহজবোধ্য, ভাবার পথ প্রদর্শক, ভাল হইলে বঙ্গভাষার পরিপুষ্টিসাধনে ইহার ক্ষমতাও বড় কম নহে। "সংসার-চক্র" ধর্ম্মমূলক উপন্যাস খানিকে পাঠক পাঠিকার রুচিপ্রদ করিতে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই।

পূর্ব্বে আমার বর্ণাশ্রম ও অন্যান্য উপন্যাস এবং সাধকজীবনী বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া অ[illegible] মধ্যে তিন চারিটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সংসার-চক্র [illegible] ভাবে পাঠকের চিত্তবিনোদন করিতে পারিলে, আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

বিনীত—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

উৎসর্গ পত্র।

—:০:—

স্বনামধন্য ধার্ম্মিকপ্রবর,

আর, লগিন এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সাহা মহোদয়

কল্যাণবরেষু।

মহাত্মন্!

আপনার সহিত প্রথম দিনের আলাপে আপনার ধর্ম্মময় ভাব-ভক্তি-সুললিত বচন-পারিপাট্য এবং ততোধিক আপনার কমনীয় স্বভাব এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সমধিক আনন্দ প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমার বহু পরিশ্রমের এই "সংসার-চক্র" নামক ধর্ম্মমূলক উপন্যাসখানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া সুখী হইলাম। দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই সামান্য উপহারে আপনি কিছুমাত্র প্রীতি অনুভব করিলে—পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

১০৮ পঞ্চাননতলা রোড,
দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাওড়া।
১৯শে ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সংসার-চক্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর ঘরে যখন প্রচুর অন্ন ছিল, সংসার-চিন্তা যখন তাহাদিগকে একান্ত অধীন করিতে পারিত না; তখন এদেশের কেহই দাসত্বের জন্য আপনাদের শান্তিনিকেতন পল্লীবাস ছাড়িয়া প্রবাস-বাসের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত না। এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালী মোটা-ভাত, মোটা-কাপড়ের জন্য, সংসার কেমন করিয়া চলিবে—তাহার চিন্তা করিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিত না, পরন্তু অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়া সুখে দিন কাটাইতে পারিত; আদান-প্রদানেই সমস্ত কায চলিত, ঋণ করিতে হইত না। তখন সকলে অঋণী অপ্রবাসী হইয়া জীবন কাটানই প্রার্থনীয় মনে করিত; তাই তখন বিদেশযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা এবং দাসত্ব করিলে তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হইত। এখন আর সে কাল নাই বলিয়া দাসত্ব ও প্রবাস-বাস বাঙ্গালী-জীবনের মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে।

সে আজ বেশী দিনের কথা নহে—মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বৎসর গত হইয়াছে। হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া গ্রামে কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় নিজের পুণ্যময় পবিত্র পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজন পরিশূন্য হিন্দুস্থানী পাড়সে বিত জৌনপুর জেলায় বদলী হইয়াছেন। কাশীনাথ প্রথমে

ডাক্তারী পাশ করিয়া ঐ জেলার সরকারী হাঁসপাতালে চাকুরী লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া, সংসারের অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে না পারিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে আবেদন করায় তাঁহাকে মোটা-মাহিনায় উক্ত জেলার হাঁসপাতাল-অধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বেতন হইল—একশত টাকা আর সরকারী বাড়ী বিনামূল্যে ভোগদখল করিতে পাইলেন। নূতনের পক্ষে এমন সুবিধা আর হইবে না ভাবিয়া—তিনি সপরিবারে, দুইটী শিশু পুত্র-কন্যা ও দূর-সম্পর্কীয়া এক দিদিশ্বাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থান জৌনপুরে গমন করিলেন।

জৌনপুরে যাইয়া কাশীবাবুকে বড়ই বিব্রতে পড়িতে হইয়াছিল। সেই নির্বান্ধব-পুরী জৌনপুরে বাঙ্গালীর বসবাস নাই বলিলেই হয়, যতক্ষণ হাঁসপাতালে রোগী দেখিতেন, চিকিৎসা করিতেন, ততক্ষণ বেশ থাকিতেন; অবসর সময়ে যখন কাহার সঙ্গ লইবার আবশ্যক হইত, তখন আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতেন না। হিন্দুস্থানীরা যদিও ডাক্তার বাবুকে খুব খাতির যত্ন করিত, আবশ্যক হইলে চাকরের কায করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিত, তথাপি কেমন স্বজাতির মায়া—বাঙ্গালী না দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল; দূর হইতে চিকিৎসার জন্য কখন কখন দুই একজন বাঙ্গালী আসিত বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না।

একদিন একটী ভদ্রলোক ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে আসিলেন। ইহাঁর বাটীতে কোন স্ত্রীলোকের চিকিৎসার্থ ডাক্তার বাবুকে যাইতে হইবে। ইহাঁর সহিত ডাক্তার বাবুর পরিচয় হইল। ভদ্রলোকটীও প্রবাসী, নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে নিবাস—আজ প্রায় দুই বৎসর হইল জৌনপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। গৃহে সদ্যপ্রসূতা পত্নীর চিকিৎসার্থ ডাক্তার বাবুর শরণাপন্ন হইয়াছেন। কাশীবাবু

প্রবাসে একজন ভদ্রলোক বন্ধু পাইয়া তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজের কাযকর্ম্ম সারিয়া লইলেন, অর্থাৎ সমাগত রোগীগণের ঔষধ ও ব্যবস্থা প্রদান করিয়া তিনি রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর চিকিৎসার্থ গমন করিলেন। পথে রোগিনীর পীড়ার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সমস্ত শুনিয়া লইলেন। প্রবাসে বন্ধুহীন স্থানে পত্নীর এরূপ পীড়াতে রামনিধি যারপর-নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের মাষ্টার, পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল-চিত্ত, নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু হইয়া থাকেন, সামান্য বিপদাপদে তাঁহাদের কাতরতার সীমা থাকে না। কাশীবাবু রামনিধি বাবুকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া এবং দুই একদিন রাত্রিজাগরণে তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন; নানাপ্রকার সাহস প্রদান করিয়া তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। পীড়া তাদৃশ সাংঘাতিক নহে, তথাপি শিক্ষক মহাশয় একেবারে যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রসবের পর সামান্য জ্বর হইয়াছে; উদরের পীড়াও সামান্য আছে। পত্নীর সূতিকারোগ অতি সাংঘাতিক বিবেচনা করিয়া রামনিধি অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিতগণের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সাধারণ লোক অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়া থাকে। পত্নীর কয়েকদিনের অসুস্থতাতেই তিনি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কাশীবাবু ব্রাহ্মণকে সাহস দিয়া বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই মশাই! শীঘ্র আরোগ্য হইবেন।" সংসারে দূর-সম্পর্কীয়া তাঁহার বিধবা ভগ্নী ছিলেন, —নাম শ্যামা, তিনি অতি সাবধানে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কাশীবাবু প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। অভাব-অভিযোগে প্রকারান্তরে সাহায্য করিতেও ত্রুটী করিলেন না। শিক্ষক মহাশয়ের সামান্য বেতন, সংসার-কার্য্যে একটী মাত্র ভৃত্য ব্যতীত আর কিছুই রাখিতে পারেন নাই। কাশীবাবুর এ জেলায় অল্পদিনের মধ্যে খুব

হাতযশ হইয়াছিল। জেলাবাসী সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তারের হুকুমানুসারে কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর লোক রামনিধির সহায়তা করিতে লাগিল। ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনা, পথ্যসংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্য—আর রামনিধিকে দেখিতে হইল না; শিক্ষক মহাশয় কিছু শান্তি পাইলেন।

প্রবাসে, স্বজাতিবিহীন-স্থানে একজন স্বজাতি, স্বধর্ম্মী পাইলে, প্রাণের মধ্যে কিরূপ টান, কিরূপ একটা আকর্ষণী-শক্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কাশীবাবু ও রামনিধিবাবুর মধ্যে অতি অল্পদিনের মধ্যে এইরূপ একটা সদ্ভাব-সূত্র আপনাপনি বাঁধাবাঁধি হইয়া গেল। রামনিধি, কাশীবাবু অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না। পণ্ডিত রামনিধি জেলাস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন, ব্রাহ্মণ খুব নিষ্ঠাবান্—সন্ধ্যা-আহ্নিক-জপ-তপেই সময় অতিবাহিত হয়, আর প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্টকার্য্য ছাত্রগণের অধ্যাপনা করিয়া দিনপাত করেন। সামান্য পঞ্চাশ টাকা বেতনে অতি-কষ্টে প্রবাসের খরচ চালাইয়া দেশে বৃদ্ধা জননী ও পিসীমাতার জন্য এবং জমীদারের খাজনার জন্য প্রতিমাসে কিছু কিছু পাঠাইতে হয়, কাযেই ইহাতে তাঁহার আর এক কপর্দ্দকও সংস্থানের সম্ভাবনা থাকে না। নিজের অবস্থাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট নহেন, ভগবান্ যাহা দিয়াছেন, তিনি যেরূপ ভাবে চালাইতেছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট চিত্ত না হইলে, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা হয়—তাহাতে পরকাল নষ্ট হয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা তিনি, যখন দিবার হইবে অবশ্যই দিবেন, তিনি কাহারও পক্ষপাতী নহেন—যে যতটুকু পাইবার উপযুক্ত, কর্ম্মফল অনুসারে যাহার যতটুকু প্রাপ্য—তিনি অবশ্যই তাহা দিবেন। আমি ইহার অধিক উপযুক্ত নহি, কর্ম্মফলে যাহা আমার উপযুক্ত নহে, বৃথা অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিজ অবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ভগবানের বিষনয়নে পতিত হইয়া

রকাল হারাইতে হইবে। শাস্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণ পরকালের ভয় অত্যন্ত করিতেন, তাই তাঁহার স্বভাব চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল, অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হইতেন—"অসন্তুষ্টা দ্বিজানষ্টাঃ" এই শাস্ত্রবাক্য সমস্ত জীবনে মানিয়া আসিয়াছেন; এখনও প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। পত্নী মোক্ষদা দেবীও স্বামীর মত ধর্ম্মপরায়ণা; স্বামীপূজা তাঁহার জীবনের ব্রত; স্বামীর সন্তোষ সাধন, স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেই সতী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন; এহেন পত্নীর পীড়াতে পণ্ডিত রামনিধি চারিদিক অন্ধকার দেখিবেন না কেন? যেই যে প্রাণের শক্তি, মনের সন্তোষ, হৃদয়ের হৃদ্বিহারিণী দেবী, পণ্ডিতেরাই ত অকপটে "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" বলিয়া প্রাণের দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। সংসারসংগ্রামে এ দেবীর সাহায্য না লইয়া কে কবে বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছে?

ডাক্তারবাবুর প্রাণপণ চিকিৎসায় মোক্ষদা দেবী অতি অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। বিনা অর্থব্যয়ে এত বড় একটা রোগ নিরাময় হইল দেখিয়া পতিপত্নী বন্ধুবরের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। পত্নীর আরোগ্যলাভের পর ডাক্তারবাবু একবার তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়া, বলিলেন—"বহুদিন একস্থানে রহিয়াছেন, একবার দেশে পাঠাইয়া দিন; বৃদ্ধা জননী নবপ্রসূতা পৌত্রীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন এবং ইঁহারও স্থান পরিবর্ত্তন জন্য দৈহিক অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে।" পত্নীর সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া কিছুদিন থাকিতে হইবে, স্বহস্তে পাক করিতে বা পরান্ন আহার করিতে হইবে ভাবিয়া রামনিধি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভাই! আবার খরচান্ত কেন? যখন উপরে ভগবান্ রহিয়াছেন, আর তোমায় উপলক্ষ্য রূপে পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা কি?" কিন্তু ডাক্তারবাবুর নিকট সে আপত্তি স্থান পাইল না, তিনি বলিলেন—"আহারাদির কষ্টের জন্য ভাবনা

নাই, যতদিন উনি না আসেন, ততদিন তুমি আমার বাসায় আহার করিও; প্রবাসে আসিয়া পরগোত্রে, পরহস্তে ভোজন করিব না বলিলে কি চলে?" বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর পীড়ায় কয়দিন তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিয়াছিলেন। কাশীবাবু তারপর বন্ধুকে পরিহাসচ্ছলে কাণে কাণে বলিলেন—"ও চাঁদমুখ না দেখিলে কি একদিনও থাকিতে পার না?" রামনিধি হাসিয়া বলিলেন—"তা নয় ভাই! এই দূরদেশ হইতে যাওয়া আসায় কত কষ্ট—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ?" ডাক্তার-বাবু বলিলেন—"তাহাতে আর ক্ষতি কি, তোমার শ্যালককে সংবাদ দাও—তিনি আসিয়া লইয়া যান। আর একান্তই যদি পরহস্তে আহারের আপত্তি থাকে; ভগ্নীকে রাখিয়া দাও।" রামনিধি বলিলেন—"যদি দেশেই একান্ত পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে শ্যামাকে রাখিলে চলিবে না, মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন, পিসীমাতাও ততোধিক, এরূপ অবস্থায় খুকীর লালন-পালন করিবে কে? ও ত একান্ত অশক্ত।" কাযেই সকলকে পাঠাইয়া কাশীবাবুর বাসাতেই রামনিধি আহারাদি করিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মোক্ষদার অগ্রজ আসিয়া তাহাদিগকে দেশে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-ভবনে।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই একটু বয়স হইলে প্রায়ই স্বপাকে অথবা স্বগোত্রে আহারাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে শরীর ভাল থাকে, হঠাৎ কোন ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। রামনিধি আজীবন শাস্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণ; ইংরাজী শিক্ষার পর চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া অবধি স্বপাকেই আহারাদি করিতেন। বিবাহের পর হইতে সতীসাধ্বী

পত্নীর হস্তে ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল; কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে স্বহস্তেই জঠরানলে আহুতি দিতেন, পরের দ্বারা এ কার্য্য কখন সমাহিত করেন নাই। সুদূর প্রবাসে আসিয়াও এ নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু এবার ত আর তাহা চলে না। পত্নীকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—তাহার আরোগ্য হইয়া আসিতে অন্ততঃ তিন চারি মাস লাগিবে। এই সুদীর্ঘ কাল স্বহস্তে পাকাদি এবং গৃহ-কর্ম্ম করিয়া কি পরের দাসত্ব চলে? কখনই বা ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে, আর কখনই বা গোসেবা করিবেন। রামনিধি নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া তিনি দুইটী গাভী প্রতিপালন করিতেন, প্রাতঃকালে স্বহস্তে তাহাদের সেবা করিয়া স্নানাদি করত পূজায় বসিতেন, ইহা তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। কাযেই এসকল অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া, পরের উপর এই সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদনের ভার দিয়া উদরের জ্বাল নিবারণ করাই কি বড় হইল? ইহা অপেক্ষা বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করায় দোষ কি? তিনি অযাচিত ভাবে বিনা অর্থে যে বিপদে উদ্ধার করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যও তাঁহার বাটীতে আহার করা উচিত; যখন তিনি এত অনুরোধ করিতেছেন, তখন কোন ক্রমেই তাঁহার এ অনুরোধ উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না।

রামনিধি অত্যন্ত সরল ধার্ম্মিক ও নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সুন্দর প্রকৃতি এবং সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেই, তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত; ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভাবে তাঁহার সৌজন্য ও বাক্যের কমনীয়তা একবার মাত্র সহবাসেই লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তাঁহার দেহের কেমন একটা লাবণ্য ছিল, যাহা সাধারণ মানুষে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণের নানাবিধ গুণ সত্ত্বেও তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অবধিই কালীবাবু যেন কেমন মুগ্ধ হইয়া গিয়া-

ছিলেন। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া হৃদয়ে কেমন আনন্দ উপভোগ করিতেন তাই তিনি রামনিধিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। স্বজাতিহীন প্রবাস-বাসের জন্য তাঁহাকে সঙ্গী পাইয়া যে কাশীবাবু, ব্রাহ্মণের এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন - তাহা নহে। ব্রাহ্মণকে বিশিষ্ট হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার তপোদৃপ্ত সরলভাব ডাক্তারবাবুকে যারপরনাই মোহিত করিয়াছিল। তখন বিদেশীয় সভ্যতার নূতন বন্যা দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে প্রায় একস্রোতে ভাসাইয়াছিল, সকলেই নবীনভাবে বিভোর, নূতন প্রলোভনে প্রলুব্ধ। এ হেন সময়ে এমন একজন সর্বতোভাবে হিন্দুভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ প্রবাসের নিভৃত নিবাসে থাকিয়া এরূপভাবে হিন্দুভাব বজায় রাখিতে—তিনি আর কাহাকেও দেখেন নাই। এই জন্য কাশীবাবু রামনিধিকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন—তাঁহাকে এত খাতির-যত্ন করিতেন।

এইখানে পাঠকের হয় ত সন্দেহ হইতে পারে যে, কাশীবাবু ব্রাহ্মণ হইলেও বোধ হয়—আচার-ভ্রষ্ট ম্লেচ্ছভাবাপন্ন; কিন্তু আমরা বলি কাশীবাবু যেরূপ কার্য্য করেন, সরকারী হাঁসপাতালের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া তিনি যেরূপ সাবধানে চলিয়া থাকেন, অপর কেহ হইলে বোধ হয়, তাহা পারিত না, যথেচ্ছা আহার-বিহার করিয়া প্রকৃত পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। সে হিসাবে কাশীবাবু গঙ্গা সলিলের ন্যায় নির্ম্মল। তিনি অখাদ্য-কুখাদ্য কখন ভোজন করেন নাই; নীচজাতি-স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত তিনি স্পর্শ করিতেন না। আহারের সময় হয় ত স্ত্রীর হাতে, না হয় দিদিশাশুড়ীর হাতে ভিন্ন কখন ভোজন করেন নাই, তবে তিনি মৎস্য মাংস খাইতেন; চাকুরীর খাতিরে সাহেবীয়ানা পোষাকও পরিধান করিতেন; সময় পাইলে কখন কখন গায়ত্রী একবার আওড়াইতেন মাত্র। তবে রোগীর আধিক্য হইলে, তাহাদের ব্যবস্থাদি করিয়া বা পরের চিকিৎসায় বাহিরে যাইয়া আসিতে বেলা হইলে, তিনি প্রায়ই সে

সকল ভুলিয়া যাইতেন—উদরের জ্বালা ধরিলে তাঁহার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকিত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বলিয়া থাকে—ঠিক সময়ে আহার, ঠিক সময়ে শয়ন, শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক; কাজেই ডাক্তার কাশীনাথ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এ সকল বিষয়ে একান্ত আস্থাবান্ ছিলেন। শরীররক্ষা অগ্রে, তার পর ধর্ম; কলিতে অন্নগত-প্রাণ জীবের ক্ষুধার সময় আহার করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা পিত্তাধিক্য হইয়া শরীরে পীড়ার সঞ্চার হইতে পারে। কাশীবাবুর এইরূপ সামান্য দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ ছিল না; সর্ব্বাপেক্ষা গুণ ছিল—তাঁহার দরিদ্রের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করা; তিনি দয়ার অবতার ছিলেন—দরিদ্রলোক চিকিৎসা অভাবে মারা যাইতেছে—পথ্যাভাবে রোগ আরোগ্য হইতেছে না, কাশীবাবু এমন স্থলে সরকারী কাম সমাধা করিয়া তাহাদের চিকিৎসার্থ যাইতেন, প্রাণের সহিত চিকিৎসা করিতেন, পথ্যের অভাব হইলে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের জীবনদান করিতেন।

এই সকল মহৎগুণেই কাশীবাবু সামান্যদিনের মধ্যে জেলার সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। খ্যাতি, প্রতিপত্তি তারপর নাই বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার চিকিৎসার প্রতি লোকের বিশ্বাস এত দৃঢ় হইল যে, কাশীবাবু যে রোগীকে দেখিবেন, আয়ু থাকিলে সে নিশ্চয়ই ভাল হইবে, আর তিনি যে রোগীকে জবাব দিবেন, সে আর কুত্রাপি ভাল হইতে পারিবে না, যম তাহার শিয়রে উপস্থিত। এ হেন গুণবান্, দয়াবান্, দরিদ্রের মা বাপ কাশীনাথ, যদি সময়াভাবে দুই একদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক নাই করেন—তাহাতে আসে যায় কি? যাহার মনঃপ্রাণ নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার, সময়াভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক না করিলে তাহাতে দোষ কি? তবে করিতে পারিলে সোণার সোহাগা হইত।

জৌনপুর জেলায় কাশীডাক্তারের নাম জানে না—তাহাকে মান্য করে না, এমন লোক নাই। সামান্য দিনের মধ্যে বিশেষভাবে

কাশীনাথের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইল—অর্থাগমও খুব হইতে লাগিল। বন্ধু রামনিধিকে পাইয়া, অবসর সময়ে তাঁহার মুখে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া কাশীনাথ হৃদয়ে প্রভূত আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। রামনিধির সহিত এমন সৌহৃদ্য হইল যে, তিনি যাহা বলিতেন—কাশীনাথ তাহার অন্যথা কিছুতেই করিতে পারিতেন না। রামনিধিকে তিনি আদর করিয়া "নিধি" বলিয়া ডাকিতেন। বাটীতে পত্নী এবং শাশুড়ীকে বলিয়া দিলেন—"সংসারের রন্ধন-কার্য্য যেমন করিয়া হউক করিও, কিন্তু "নিধির" জন্য যেন খুব পবিত্র ভাবে স্নানাদি করিয়া রন্ধন করা হয়, নিধি যথার্থ ব্রাহ্মণ, আমাদের মত ভ্রষ্টাচারী নয়।" কাশীবাবুর পত্নী ও শাশুড়ী খুব ধার্ম্মিকা ছিলেন, ব্রাহ্মণের জন্য যতদূর সম্ভব পবিত্রভাবে অতি-সন্তর্পণে পাকাদি করিয়া দিয়া নিজেদের পাকাদি করিতেন।

পরিতৃপ্তিই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য, যে ভোজনে পরিতৃপ্তি না হয়, তাহা পীড়ার আকর। রামনিধি বন্ধুগৃহে, বন্ধু-পত্নীর হস্তে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, পরহস্তে—পরগোত্রে ভোজনে তাঁহার কোন পীড়া বা শারীরিক গ্লানি উপস্থিত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা এরূপ ভক্তিভাবে যত্নের সহিত তাঁহাকে আহার করাইতেন, যাহা কাহারও গুরুর ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ।

রামনিধি বন্ধুভবনে আহার করিতেন, আর অবসরক্রমে সকাল সন্ধ্যায় বন্ধুর পুত্র কন্যাটীকে কাছে লইয়া বাল্যোচিত শিক্ষাপ্রদান করিতেন। কন্যা লীলাবতী ও পুত্র তারাদাস অল্পদিনের মধ্যে অধ্যয়ন-পটু হইয়া উঠিল। শিশু দুইটী বেশ মেধাসম্পন্ন থাকিলেও রামনিধি অদ্যাবধি যাহা শিখাইয়াছেন, তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যে এই অল্পদিনের মধ্যে তাহারা যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে—অন্য শিক্ষকের হস্তে চারি বৎসরেও সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। কাশীনাথ ও তদীয় পত্নী ষোড়শী দেবী পুত্র-

কন্যার প্রতি রামনিধির পুত্রাধিক স্নেহ ও শিক্ষাদানে ঐকান্তিক শ্রমশীলতা দেখিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। কন্যা লীলাবতী, পুত্র তারাদাস অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়, আর তারাদাসের এখনও পাঁচ পূর্ণ হয় নাই, সবেমাত্র চারি বৎসর ছয় মাস। ইহার মধ্যে বালকের মেধাশক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ যে, সে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্ত বলিতে পারে, কথার জড়তা একপ্রকার নাই বলিলেই হয়—আপনাদের বংশাবলীর কুলজী সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছে। লীলা—শিবের ধ্যান, প্রণাম বেশ সুচারুরূপে বলিতে পারে, তা ছাড়া সে প্রায় তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

রামনিধির প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে—তারাদাসের উপর, তিনি অনেকানেক বালক দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশু কখন দেখেন নাই। ইহার রূপ যেমনি গুণও তদ্রূপ, একদিন যে কথাটী শ্রবণ করে—তাহা আর কখন বিস্মৃত হয় না। বালকের স্বভাব—যে বেশী ভালবাসে, সে তাহারই অত্যন্ত অনুরক্ত হয়। রামনিধি তারাদাসকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া তারাদাসও তাঁহার কথা শুনিত, তিনি যাহা নিষেধ করিতেন, প্রাণান্তেও তাহা করিত না।

রামনিধির প্রাণ, পুত্রস্নেহে ভরপুর, কিন্তু ভগবান্ এ স্নেহ পরিসেবনের পাত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন না। উপর্য্যুপরি তাঁহার দুইটী পুত্র হইয়া মারা গিয়াছে; যে কন্যাটী হইয়াছে—তাহা তৃতীয়; ভগবান্ কি ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন? দয়াময় যদি দয়া করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে বন্ধুকে অনুরোধ করিয়া তিনি তারাদাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন—তাহাকে জামাতা করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইবেন। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের আন্তরিক ইচ্ছা—ভগবান্ কি পূর্ণ করিবেন না?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

•••••••••••••

দেব-দর্শনে।

কুমারখালী গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী এক সময় বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহাদের চতুষ্পাঠীর নাম তখন খুব প্রসিদ্ধ ছিল, অনেক ছাত্র এখানে থাকিয়া জ্ঞানলাভে হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করত মানবজন্ম সফল করিয়াছে; অনেক বড় বড় বিদ্বান্ ও সাধক এই বংশের অলঙ্কার স্বরূপে কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এখন বংশমর্য্যাদা-গুণে গ্রামের সকলেই ইহাঁদের মান্য করে কিন্তু সে বৃহৎ গোষ্ঠী আর কই। কাল যে একে একে সামান্য দিনের মধ্যে তাহার সমস্ত গ্রাস করিয়াছে, শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় রাখিয়াছে কেবল রামনিধিকে,; সেই কেবল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া বংশের নাম লোপ হইবার বিষয়ে বাধা দিতেছে। দেশে থাকিয়া উদরের সংস্থান হয় না বলিয়া রামনিধি আজ প্রবাসে; বৃদ্ধা জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া নয়নের মণি—আশার ধন পুত্ররত্নকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুত্রের সংবাদ না আসিলে, বৃদ্ধা ঘর বাহির করিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলেন।

বংশের বাড়-বাড়ন্ত কিছুই নাই। রামনিধির কয়েকটী পুত্র পূর্ব্বেই কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। এবার একটী কন্যারত্ন প্রসবের পর যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া বহুকষ্টে প্রসূতি রক্ষা পাইয়াছেন। শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই কিছুদিন স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে মোক্ষদা পূজনীয়া শ্বাশুড়ীর চরণতলে জুড়াইতে দেশে আসিয়াছেন; অনেকটা সুস্থও হইয়াছেন, কন্যাটীও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া পিতামাতা ও পিতামহীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

প্রতি সপ্তাহেই রামনিধিকে বাটীর সংবাদ দিতে হয়। মোক্ষদা-স্বহস্তে

সে সংবাদ প্রদান করেন—তাঁহাকে খুব সাবধানে থাকিতে লিখেন। উত্তরে ডাক্তার বাবুর বাটীর আদর-যত্নের কথা শুনিয়া ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য কত প্রার্থনা করেন।

মোক্ষদা কঙ্কালসার, কালিমাময়, বিকটমূর্ত্তি লইয়া বাটীতে আসিয়াছিলেন। আজ একমাসকাল শ্বাশুড়ীর আদরযত্নে, শ্যামার প্রাণান্তকর সেবা-শুশ্রূষায় এবং প্রতিবাসিগণের আদর ভালবাসায় আবার পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া পাইয়াছেন। মোক্ষদা—অনুপমা সুন্দরী, দরিদ্রের আঁধার কুটীরে দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ন্যায় পবিত্র-গৃহে এ হেন রত্নের সমাবেশ না হইলে আর হইবে কোথায়? এ বংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সৌন্দর্য্যের আকর, গুণে অতুলনীয়া—গঠনপ্রণালীতে চিরধন্যা। বৃদ্ধা জননী মহামায়া কালের গ্রাসে যাইতে বসিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার রূপের ঔজ্জ্বল্য, দেহের পারিপাট্য এবং গুণের একত্রে সামঞ্জস্য দেখিলে, তাঁহাকে দেবী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। মোক্ষদা এই দেবী স্বরূপিণী শ্বাশুড়ীরই গুণে গুণান্বিতা, তাঁহারই শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, তবে আদর্শ রমণী না হইবেন কেন? মেয়েটী হইয়াছে একটী ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের আধার—মোটা সোটা স্বাস্থ্য-সমন্বিতা, তিল-ফুলের মত নাসিকা, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুঃ, নিটোল হস্তপদ, যুগ্ম ভ্রুযুগল; অনেক রাজার ভাণ্ডারে এ রত্ন পাওয়া দুষ্কর—তা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে কালের কটাক্ষে কি এ ধন স্থায়ী হইবে? এমন যে অনেকগুলি একে একে যমের জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিয়াছে; তাই সন্দেহ হয়—পিতা মাতার হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে—পিতামহীর শেষের আশা পূরণ করিতে এ কন্যা কি বাঁচিবে?—পূর্ব্বেকার কথা ভাবিলে আশাত নাই—তবে ভগবদিচ্ছায় কি না হইতে পারে?

মোক্ষদা পীড়িতা হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামান্তর হইতে মহামায়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেখিতে আসিলেন; কন্যা দেখিয়া কোলে করিয়া

বত আদর করিলেন। মোক্ষদা মামা-শ্বশুরের পদধূলি লইয়া কন্যার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আহা মা! একটা মাটীর ঢেলা নেয়েও কি ভগবান্ বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন না; আশীর্ব্বাদ করি—মেয়েটী আমার মত দীর্ঘজীবন লাভ করুক।" মহামায়া বলিলেন—"ভাই! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ত অমোঘ, কিন্তু আমার ভাগ্যে ফলে কই?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দিদি! তোমাদের গুরুদেবও ত খুব সিদ্ধপুরুষ, এই সময় তাঁহাকে দেখাইয়া একটা গ্রহযাগ কিম্বা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া তাহার ফলাফল বিচার করিলে ভাল হয় না?"

মহামায়া বলিলেন—"তুমি যা বলিলে ভাই! আমারও তাই মত, দেশ-বিদেশে থাকিয়া কখন কি হইয়া যায়—আমি ত দেখিতে পাই না, এবার আমার কাছে এসেছে, ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে—আমার এ সকল কাযকর্ম্মগুলো একবার ভাল ক'রে ক'রতে ইচ্ছা যায়—তারপর না বাচে—জানবো নিতান্তই ভাগ্য। তাঁর মত লোকের দ্বারা শিশুর ইষ্ট-চিন্তা করাইলে, একটা না একটা প্রতিকার হইবেই, তিনি ত সামান্য লোক নন্? তবে তাঁহাকে এখন পাই কোথা, তিনি বহুদিন আসেন নাই, কোথায় আছেন—তাহাও জানি না; তুমি কি একবার তাঁর সন্ধান ক'র্‌তে পার?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কেন পার্‌বো না দিদি! এই সেদিন আমি তাঁহাকে কলিকাতার পথে যেতে দেখেছি, তাঁহার সহিত দেখা হইলে—তিনি তোমাদের সমস্ত কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। কাটোয়ায় থাকেন, অজয়নদের তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আচ্ছা! আমি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনাইতেছি।"

তার পর চারি পাঁচ দিন পরে পূর্ণানন্দ স্বামী রামনিধির পৈত্রিক বাস-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "দেবতার আগমনে বাস্তু পবিত্র হইল, আমরা পবিত্র হইলাম" বলিয়া—মহামায়া গলবস্ত্রে পায়ের উপর

াথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। মোক্ষদাও কন্যাটিকে দেবতার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিয়া ভূলুণ্ঠিতা হইয়া পদধূলি লইলেন। গুরু পূর্ণানন্দ—ংসারী;—ছেলে পুলের মায়া তিনি ভাল বুঝেন—সেই পারুল ফুলের াত মেয়েটীকে পদতলে ভূমিষ্ঠা দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া মাতৃমূর্ত্তি বিবেচনায় মুখচুম্বন করত বলিলেন—"মেয়েটী কি রামের? আহা! বেশ মেয়েটী ত, যেন ননীর পুতুল!"

মহামায়া চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"বাবা! ননীর পুতুল ত বটে, অমন যে দুইটী গেছে, এবার একটু প্রতিকার ক'রে দিন, নতুবা ছেলে মানুষরা কেবলই পুত্রশোক ভোগ ক'র্‌বে! রাম আমার শোক পেয়ে পেয়ে যেন এক রকম হ'য়ে গেছে—আর বৌমাটীও খেয়ে-শুয়ে সুখ পায় না।

পূর্ণানন্দ এই বাটীর গুরু ও পুরোহিত দুইই। যখন বংশ খুব উজ্জ্বল ছিল, লোক-জনে যখন এ সংসার পরিপূর্ণ ছিল, যখন এ সংসারে নানা-প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, তখন অনবরত উপস্থিত থাকিয়া—তিনি সেই সকল ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতেন। গুরুদেব গৃহে থাকিলে আর কোন বিপদাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, হইলেও গুরুদেবের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলে যমের বাবার সাধ্য নাই যে তাহাকে আক্রমণ করে—তখনকার গৃহ-কর্ত্তাদের এইরূপই ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। গুরু—পুরোহিত গৃহের দেবতা, যেখানে সদয়ভাবে তাঁহারা বর্ত্তমান—সেখানে কি আপদ বিপদ তিষ্ঠিতে পারে? এইরূপ প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলেই তখন হিন্দু-সংসার এত আধিব্যাধির আকর ছিল না। আর গুরু-পুরোহিতও তখন দেব-কল্প ছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বাস্তবিক গৃহ পবিত্র হইত, উপদেশে গৃহস্বামীর জীবন-পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন শিথিল হইয়া পড়িত, সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তখন সকলেই পরমানন্দে কালযাপন করিত। কর্ম্মী গুরু-পুরোহিতের উপদেশে তখন হিন্দুসংসার পরিচালিত হইত

বলিয়া—তখন হিন্দুসংসারে সুখ ছিল, শান্তি ছিল, ইহা ধর্ম্মের আগার বলিয়া যে আসিত, সে-ই পরিতৃপ্ত হইত, সে-ই জুড়াইতে পারিত। এখন সে দেবোপম গুরু-পুরোহিত আর নাই—হিন্দুসংসারও এখন অধর্ম্ম-গহ্বরে পতিত হইয়া নানা কলুষ-কালিমায় মণ্ডিত হইয়াছে।

এখন গুরু-পুরোহিতগিরি একটা ব্যবসার পন্থা হইয়াছে। তখন তাঁহারা শিষ্য-যজমানের মঙ্গলের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করিতেন, আর এখন অশেষ প্রকার পাকচক্রে ফেলিয়া তাহাদের মস্তক মুণ্ডন ও সর্ব্বনাশ সাধন করাই গুরু-পুরোহিতের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। কার্য্যে কোন ফল নাই অথচ অর্থের বাহুল্য খুব বাড়িয়াছে। তখন গুরু-পুরোহিত শিষ্য-যজমানের গৃহ আপনার গৃহ এবং তাহার পোষ্যবর্গ আপনারই আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদের মঙ্গলবিধানে তৎপর হইতেন। তাঁহারা সুসিদ্ধ কর্ম্মী ছিলেন, অর্থের লালসা তাঁহাদের এত প্রবল ছিল না, কারণ তাঁহারা ঠিক ব্রাহ্মণের মত দিনযাপন করিতেন। এত বিলাসিতা এবং ভোগ লালসায় তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন না। যাঁহারা জন্ম জন্মান্তরে এ সকল প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে ভোগ করিয়া ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত হইয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার এত অধঃপতনের সাধ কেন?

গুরু পূর্ণানন্দ প্রকৃত কর্ম্মী, ত্যাগীর আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে ব্রাহ্মণ—ধর্ম্ম করেন, কর্ম্মে যাঁহার মতি দৃঢ়, তাঁহার অর্থের অভাব হয় না; উদরের জন্য তাঁহাকে দিশেহারা হইয়া ইতস্ততঃ করত পরের দাসত্ব করিতে হয় না, কারণ তাঁহারা যে অল্পে সন্তুষ্ট। শরীরী বলিয়াই যেটুকু দরকার, সেইটুকু গ্রহণ করেন; দুঃখের আকর ভোগাভিলাষ তাঁহারা পদতলে দলিত করিয়া আত্মানন্দে বিভোর—ইহাই ব্রাহ্মণত্ব, ইহাই গুরুর গুরুত্ব এবং পুরোহিতের পুরোহিতত্ব, যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এবং শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তাঁহার অন্নাভাব কোথায়? শালগ্রাম শিলা

স্বর্ণপ্রসূ—যথার্থ শিলায় ব্রহ্মনারায়ণের স্বরূপত্ব বোধে পূজা করিলে অভাব অভিযোগ থাকে না. কিন্তু সে শিলা মেলা দুষ্কর—সাধক ভিন্ন চিনিয়া লওয়াও দুঃসাধ্য।" গুরু পূর্ণানন্দ কখন কোন শিষ্য-যজমানের নিকট ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য অর্থের বিনিময় করেন নাই। শিষ্য বা যজমান সাধ্যানুসারে দক্ষিণা-স্বরূপ যাহা প্রদান করিত, তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট হইতেন, আবার অভাবগ্রস্ত শিষ্যকে তিনি সাহায্য করিতেও ক্রটী করিতেন না, কারণ তাহারা যে পুত্রের সমান, পিতার থাকিলে পুত্র পাইবে না?

কন্যাটীকে কোলে লইয়া গুরুদেব আদর করিতেছিলেন বলিয়া মোক্ষদা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। গুরুদেবের গাত্রে পদস্পর্শ হইলে পাছে তাহার বাছার কোন অমঙ্গল হয়, এই জন্য তিনি বার বার কন্যাটীকে আনিবার জন্য শ্বাশুড়ীকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। পূর্ণানন্দ শুনিয়া বলিলেন—"মায়া! বৌমা কি বল্‌ছেন?" মহামায়া বলিলেন—"খুকী আপনার কোলে উঠেছে, ইহাতে তাহার অকল্যাণ হবে মনে ক'রে, বৌমা উতলা হয়েছে, তাই উহাকে কোল থেকে নিতে বল্‌ছে।"

পূর্ণানন্দ। বটেরে বেটী! আমি কি নাতি-নাতিনীকে বাটীতে কোলে করি না? খুকী আমার কে? আমার রামের মেয়ে যে। তবে তোরা আমাকে পর ভাবিস্?

মোক্ষদা যোড়হাত করিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মহামায়া বলিলেন—"বাবা! খুকী এই সবে দুই মাসের হ'য়েছে; ওর কোষ্ঠী ক'রে দিন, আর একবার ওর অদৃষ্টের ফলাফলটা দেখুন দেখি, এবারেও কি অন্য বারের মত কাঁদাতে এসেছে? একবার দেখে দিন ত; আপনার কথা শুন্‌লে আর আমাদের কোন ভাবনা থাকে না।"

"আচ্ছা মা! আজ অপরাহ্ন হয়েছে, এখন ত আর হয় না, তোমরা উদ্যোগ করে রাখ, কাল সকালে দেখ্‌বো!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোষ্ঠীর ফল।

মানুষের ভাগ্যচক্র ভগবান্ কি ভাবে গঠন করিয়াছেন; জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সম্যক্ বুৎপত্তি থাকিলে, তাহা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। তদনুসারে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখিলে নরনারীর চিরজীবনের ফলাফল সহজে অবগত হওয়া যায় এবং তৎকালীন ভাগ্যচক্রের কোনও গ্রহ কোপদৃষ্টি বা প্রতিকুল দৃষ্টি করিলে শাস্ত্রানুসারে তাহার শান্তি-বিধান করিলে শুভ ফললাভ হওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। এই জন্য পূর্ব্বে হিন্দুমাত্রেই পুত্রকন্যাগণের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। সুনিপুণ জ্যোতিষীর দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে কোষ্ঠীখানি জীবনের দর্পণ স্বরূপ হইয়া থাকে। কখন কিরূপ সময় হইবে—কিরূপ আধিব্যাধিতে দেহতরী বানচাল হইবে, জানিতে পারিলে—পূর্ব্ব হইতে তাহার শাস্ত্রীয়-শান্তি বিধানানুসারে চলে। এইজন্য পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ঠিকুজীকোষ্ঠী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

রামনিধি এতদিন প্রবাসে থাকিয়া, এ সকল বিষয়ের সুবিধা করিতে পারেন নাই। এবার বোধ হয় ভগবান্ তাঁহার কন্যাটীকে জীবিত রাখিবেন বলিয়া স্বদেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং বড় শুভক্ষণে তাঁহার ইহপরকালের দেবতা গুরুদেবও গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এমন শুভ সংযোগ হয় না—এই জন্য মহামায়ার বড়ই ইচ্ছা পৌত্রীর ভাগ্যফল, তাহার মরণ-বাঁচনের বিধি-নির্দ্ধারিত একটা কোষ্ঠীর ফল এই মহাপুরুষের দ্বারা গণাইয়া লইবেন। আজ শুভদিনে তাহার উদ্যোগ আয়োজনও করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ণানন্দ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিজের সন্ধ্যাহ্নিক সমাধা করত

অতি প্রফুল্লচিত্তে শিষ্যকন্যার ভাগ্যফল গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি যখন সমস্ত গণনা শেষ করিলেন, তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া, মোক্ষদা, শ্যামা এবং রামনিধির পিসীমাতা সকলেই যোড়করে অনাহারে গুরুদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত অভয়বাণী শুনিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন। গুরুদেব গণনার পর ইষ্টদেবীর পূজাদি শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"মা! এবার খুকীর জীবনের কোনও ভাবনা নাই। তবে দশ বার বৎসর হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার পাকচক্রে পতিত হইয়া নানা দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত হইবে, তাহাতে জীবনহানির কোনও সম্ভাবনা নাই। ত্রিশ বৎসরের পর সৌভাগ্যযোগ; খুব সুখশান্তিতে কালযাপন করিবে। তবে এক কায করিতে হইবে, অষ্টম বর্ষেই ইহার বিবাহ-যোগ রহিয়াছে; সেই সময় সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া দিও, তাহা হইলে গৌরীদানের ফললাভ হইবে, তাহার দ্বারা ভাগ্যফল অনেকটা দৃঢ়ও হইবে।" গুরুদেব মোটামুটী সমস্ত বলিয়া দিলেন কিন্তু দুর্ঘটনার বিষয় সকল বিবৃত করিলে পাছে আত্মীয়স্বজন ভীত হন, সেই জন্য তাহা অপ্রকাশ রাখিলেন। জীবনহানির সম্ভাবনা যখন নাই, তখন আর এত ভাবনা কেন? তিনি আরও বলিলেন—"সেই সময় গ্রহপূজাদি করিয়া শান্তিবিধান করিলেই গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া সুফল প্রদান করিবেন, সে বিষয় চিন্তা করিয়া এখন হইতে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিও না। সাধারণ নরনারীর ভাগ্যচক্র একেবারে নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয় না; একটা না একটা বিঘ্ন থাকিবেই থাকিবে—ইহাত অসাধারণ স্ত্রীপুরুষের ভাগ্যফল নয়! তবে যে সকল ঘটনা-বৈচিত্র্য ইহার জীবনে সংঘটিত হইবে, তাহা অতি অদ্ভুত। মোটের উপর কন্যাটী খুব সৌভাগ্যশালিনী হইবে।"

গুরুদেব যাহা বলিলেন—তাহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই।

কন্যাটী জীবিত থাকিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইবে শুনিয়া, মোক্ষদার আনন্দের সীমা রহিল না। আহা! অভাগিনী, এই বয়সেই দুইটী কুসুমকোমল প্রাণের ধনকে কালের মুখে তুলিয়া দিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল; মনে করিয়াছিল—এজীবনে বুঝি পুত্র কন্যার লালন-পালন, তাহাদের চাঁদবদনে মধুর মা বুলি শুনিয়া নারী জন্ম সফল করিতে পাইবে না; উপর্য্যুপরি দুইটী পুত্রের মৃত্যুতে মোক্ষদা নিজেকে মৃতবৎসা দোষ-দুষ্টা মনে করিয়া বড়ই ঘৃণ্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। অপুত্রা, মৃতবৎসা দোষ নারীজীবনে মহা ঘৃণার বিষয়। যে নারীজীবনে মাতৃত্ব সংঘটন না হইল, পুত্রকন্যার জননী না হইয়া যে নারীজীবন অতিবাহিত হইল—তাহা ত নিষ্ফল, পুন্নাম নরক যে তাহাদের পরকাল নষ্ট করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিবে। পরকাল ত পরের কথা, ইহকালেই যে জীবনের প্রধান সুখলাভ হইবে না। নারীজাতি পুত্রের জননী না হইলে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কেহ তাহার হাতের অন্নজল গ্রহণ করে না—পুত্রকন্যাই সংসার-ধর্ম্মের আনন্দ, জীবনের প্রধান সুখ, বিশ্বসৃষ্টির মুখ্য কারণ; সুপুত্র—সুকন্যার জননী হওয়া যে ভগবানের প্রিয় আশীর্ব্বাদ, তাহা না হইলে কাহার হৃদয় দুঃখ দাবানলে দগ্ধ না হয়?

পূর্ণানন্দ যখন বলিয়াছেন—কন্যার জীবনে কোন আশঙ্কা নাই; কন্যা দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, তখন ইহা অকাট্য—বেদের বাক্য অপেক্ষাও আশাপ্রদ। মহামায়া ঠাকুরের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পূর্ণানন্দ সেদিন স্বহস্তে পাক করিয়া নিজে আহার করিলেন এবং শিষ্য বর্গকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। মহাপুরুষের মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া সকলেই জীবন ধন্য জ্ঞান করিল।

বহু দিবস গৃহে পদার্পণ হয় নাই বলিয়া মহামায়া চারি পাঁচদিন গুরুদেবকে গৃহে রাখিয়া দেবতার ন্যায় ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পূর্ণানন্দ জ্ঞানী পুরুষ, শিষ্যের

নিকট হইতে দোহন করিয়া প্রণামী আদায় করিতে তিনি জানিতেন না; অবস্থার অতিরিক্ত কেহ কিছু দিলে, তিনি তখন গ্রহণ না করিলে পাছে শিষ্যের কর্ম্ম পণ্ড হয় বলিয়া গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার জন্য শিষ্যকে বিষম ভৎসনা সহ্য করিতে হইত। গুরুদেবের বিদায়ের দিন মহামায়া গললগ্নীকৃতবাসে পদতলে একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রণামী দিয়া পদধূলী লইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"বাবা! প্রসন্ন হউন, আমার অবস্থা জানেনত, বাছা আমার উদরান্নের জন্য দেশান্তরে গিয়াছে, আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করুন, বাছা যেন আমার নিরোগী হয়।"

পূর্ণানন্দের সদাই আনন্দ ভাব—নিরানন্দ বা অসন্তোষ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না; অতিশয় প্রসন্ন মনে আনন্দের বিমল হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মা! যথেষ্ট হইয়াছে—এত দিয়াও তুমি কুণ্ঠিতা হইতেছ কেন? ইহাই আমার লক্ষ মুদ্রা, তুমি কিছু দিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইব আর না দিতে পারিলে হইব না, ইহা ব্রাহ্মণের স্বভাব নয়। আমি যেমন তোমাদের পোষ্য, তোমরাও আমার তেমনি, অভাব হইলে আমাকেও দিতে হয়—ইহা শাস্ত্রের নিয়ম। মা! কিছু মনে ক'রো না, তোমাদের আবশ্যক হইলে সংবাদ দিলেই আমি তৎক্ষণাৎ আসিব। তবে এখন আসি মা!" ব্রাহ্মণ যাইতে উদ্যত হইলে শ্যামা, রামনিধির পিসীমাতা প্রণাম করিলেন, তারপর মোক্ষদা কন্যাটিকে পুনরায় পায়ের তলায় ফেলিয়া দিয়া গুরুদেবের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করত পদধূলী লইলেন। দেবতা সুপ্রসন্নচিত্তে সকলকে আপনার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



বিয়োগে শোক।

টাকার সুদ যেমন কুসীদজীবীর লোভনীয়, জনক-জননীর অপত্যের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র-মুখ দর্শনও সেইরূপ লোভনীয় বস্তু। পৌত্র মুখ দেখিয়া মরিব, এ আশা সকলেই করিয়া থাকেন। মহামায়াও সেই আশায় এত দিন জীবিতা। নারী জীবনের একমাত্র উপাস্য তাঁহার স্বামী-দেবতা যখন পরলোক গমনের পথে পদার্পণ করেন, আজ একবৎসর হইল যখন তিনি ইহধাম হইতে অপসৃত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় মহামায়া স্বামীর পদে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভু! জীবনে আমরা কখন একদিনের জন্য পৃথক্ অবস্থান করি নাই, বিবাহের দিন হইতে আজ অবধি দাসীকে পদাশ্রয়ে রাখিতে একদিনের জন্যও কুণ্ঠিত হন নাই। আর আজ আপনি দাসীকে একাকিনী রাখিয়া কেমন করিয়া স্বর্গগত হইতেছেন? আমি যে চিরদিন ও পদের ভিখারিণী, সেবার অধিকারিণী,আমাকে ফেলিয়া যাওয়া কি আপনার উচিত?" তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"মায়া! সতীস্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া মৃত্যুও প্রার্থনা করে না। স্বামীর পূর্ব্বে স্বর্গগতা হইলে কে তাঁহার প্রাণের ধনের প্রাণ দিয়া সেবা করিবে, সেই ভাবিয়াই অস্থির হইতে থাকে—এই জন্য তাহারা বিধবা হইব কিন্তু বৈধব্য ভোগ করিব না বলিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর তদীয় চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া হাসিতে হাসিতে ইহধাম ত্যাগ করিতেন। তুমি তাহাও করিও না। আমার সময় হইয়াছে—তোমার এখনও কিছুদিন বাকী; রামনিধি সংসার বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, এ অবস্থায় দুইজনে মরিলে বংশের ঘোর অনিষ্ট হইবে, এই জন্য কিছুদিন থাকিয়া, সুখে আসলে ভোগ করিয়া পশ্চাৎ আগমন করিও, আমি অগ্রে গিয়া স্থান ঠিক

করিয়া রাখিব,তোমায় আমায় ইহ ও পরজীবনে কখন পৃথক থাকিব না। কলির মতই ধন্য—আমি যাইতেছি—যত শীঘ্র পার তুমিও আইস; তবে কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া যেন ধর্ম্মের পথে কাঁটা দিও না। যাবতীয় ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, সমস্তই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় করিয়াছি—সঞ্চয় কিছুই করি নাই বলিয়া তুমি ক্ষুণ্ণা হইও না—সঞ্চয় ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। তুমি যেরূপ সরলস্বভাব—তাহাতে অর্থাদি লইয়া কাল কাটান তোমার পক্ষে অসম্ভব, পদে পদে বিপদে পড়িতে হইত; চোরগণ লুণ্ঠন করিতেও পারিত, কিন্তু আমি যে ধন রাখিয়া গেলাম—তাহা অমূল্য—এক কাল চোর ভিন্ন ইহার অপচয় করা জগতে কাহারও সাধ্য নাই। রামনিধি তোমার অতি সৎপুত্র—উহার দ্বারা তুমি খুব সুখী হইবে—আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কিন্তু কাল-চোরের জন্য সতর্ক থাকিও, সদাসর্ব্বদা মধুসূদনের শরণাপন্ন হইও।" এই বলিয়া বৃদ্ধ স্বর্গগত হইয়াছেন—মহামায়ার সে স্মৃতি সদাসর্ব্বদা হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

সতীর সেই ভাব, স্বামীসকাশে গমন করিবার সেই প্রবল-ইচ্ছা এখন হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। দেবতার সে পবিত্র মূরতি অহরহঃ নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতী বুঝিলেন—সময় হইয়াছে, আর বেশীদিন কালবিলম্ব করা উচিত নহে। এখন রামনিধির ত আর অর্থের অসদ্ভাব নাই, পূর্ব্বে পুত্র দুইটী মারা গিয়াছে বটে কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন—এবার হইতে বধূমাতার মৃতবৎসা-দোষ দূরীভূত হইবে, মহাপুরুষ যাগ করিয়া সে বিষয়ে অভয় দিয়াছেন; বধূটীও কৃতকর্ম্মা এবং পতি-অনুরাগিনী হইয়াছেন। রূপে গুণে মা আমার অন্নপূর্ণা স্বরূপিনী; তবে আমি আর হেথায় বৃথা সময়ক্ষেপ করি কেন? মহামায়ার মনশ্চাঞ্চল্য আরম্ভ হইল। সতীর ইচ্ছাইত শক্তির ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা—ইহাতে হইতে পারে না—এমন কার্য্য কি আছে?

বিদ্যালয় বন্ধ হইলে রামনিধি স্বদেশে আগমন করিয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন। জননী নয়নানন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া প্রাণের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাইলেন। সংসারের সকল কথা, কন্যার কোষ্ঠীর ফলাফলের কথা, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের কথা, মাতুলের সম্পত্তি অধিকারের কথা জানাইয়া বলিলেন—"বাবা! তোমার মামা ত আর বিবাহ করিয়া সংসারী হইল না, কাযেই তোমাকে দানপত্র করিয়া সে কাশীবাসী হইবে—তবে তুমি তাহাকে মাসিক পাঁচটী করিয়া টাকা তাহার জীবদ্দশা অবধি কাশীতে পাঠাইয়া দিও; সেও বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া সমস্ত কথা বলিবে।" মাতা-পুত্রে কত নূতন, কত পুরাতন কথা যে হইল, তাহার আর স্থিরতা নাই। বৃদ্ধা এ কয়দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের সংসার গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। আর সুদের সুদ পৌত্রীটিকে অনবরত কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন। মেয়েটী বেশ ফুট্‌ফুটে ননীর পুতলীর মত হইয়াছে এবং গুরুদেব তাহার কোষ্ঠীর ফল দেখিয়া জীবনের আশা দিয়াছেন শুনিয়া, রামনিধি প্রবাসের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া জননীর অতুলনীয় আদর-আপ্যায়নে জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন।

অত্যধিক গরম পড়িয়া গ্রামে ওলাউঠার প্রকোপ দেখা দিল। প্রত্যহই লোক মরিতে লাগিল—আত্মীয় স্বজনের রোদন-রোলে নিভৃত নিস্তব্ধ পল্লীবাস কোলাহলময় হইয়া হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিল। ত্রাহি মধুসূদন—কখন কে যায়—তাহার স্থিরতা নাই, এক একবার হরিধ্বনি হইতেছে—আর গ্রামবাসীর প্রাণ ভয়ে-আতঙ্কে চমকিয়া উঠিতেছে। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মহামায়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন, —"হে অভীষ্টদেব! গ্রামের মঙ্গল কর, তৎসহ আমার বাছাদের নিষ্কণ্টক করিয়া আমাকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও, আমি হাসিতে

হাসিতে তোমার কোলে শয়ন করিয়া আমার প্রাণের দেবতার চরণ সমীপে উপস্থিত হই।"

সতীর অমোঘ-বাক্য যেন দেবতার হৃদয় বিদ্ধ করিল, তৎক্ষণাৎ যেন সেই অমোঘ-বাক্যের প্রতিক্রিয়া বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিয়া তাহার ফল প্রদান করিল। সেইদিন রজনীর শেষ মুহূর্ত্ত হইতেই মহামায়া পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। প্রথমে অল্প অল্প তাহার পর ভীষণরূপে ভেদ ও বমন আরম্ভ হইয়া মহামায়ার স্বর্ণবর্ণ দেহের উপর যেন নীলরঙ্গের প্রলেপ দিয়া গেল। মাতৃভক্ত রামনিধি ও মোক্ষদা অবস্থা দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কি করিবেন—কাহাকে ডাকিবেন—কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; এ বিপদে মতিভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, পাছে জননীর সুচিকিৎসা না হয় ভাবিয়া মাতুল মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া দিদির অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন, মহামায়ার ন্যায় পরোপকার-ব্রতধারিণী গৃহিণীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিবাসীরাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের এবং গ্রামান্তর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করান হইল, কিন্তু কিছুই হইল না; কাল যাহাকে কোলে টানিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে—ঔষধে তাহার কি করিবে? মৃত্যু-রোগের ঔষধ কোথায়? মহামায়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! অস্থির হইও না, আমার সময় হইয়াছে, আজ এক বৎসর হইল তাঁহার সেখানে বড় কষ্ট হইতেছে—তাই দাসীর ডাক পড়িয়াছে, আমার আর থাকিবার ক্ষমতা নাই। এক্ষণে তুমি তুলসীতলায় আমার দেহ রক্ষা করিয়া ইষ্ট নাম শ্রবণ করাও—পুত্রের কায কর, তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসিতে হাসিতে আমি দেবতার পদে মিশিয়া যাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তোমার তত্ত্বাবধানে আমি অসীম আনন্দে কাল কাটাইয়াছি, কোন প্রকার ত্রুটী হইয়াছে—মনে করিয়া ক্ষুন্ন হইও না; আমি বেশ সুখে মরিতেছি, কোন কষ্ট নাই, লোকের

পিতামাতা চিরকাল বাঁচে না, অধৈর্য্য হইয়া আমার এ শেষ মুহূর্ত্তে নানা প্রকার গোলযোগ আনিয়া ফেলিও না, স্থির হও, ধৈর্য্য ধর।"

দেবতার বাক্য মাথা পাতিয়া লইয়া রামনিধি তদনুযায়ি কার্য্য করিতে লাগিলেন। তুলসীতলায় জননীর পবিত্র দেহ রক্ষা করিয়া ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভেদ বমন বহুক্ষণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নাড়ীর গতিও ধীরে ধীরে লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। মাতৃভক্ত রামনিধি আরাধ্য-জননীর চরণ যুগল একবার বক্ষে, একবার মস্তকে রাখিতেছেন—একবার বা ভক্তির সহিত চুম্বন করিতেছেন, আর চিরদিনের আশা মিটাইয়া নয়ন জলে তাঁহার অভিষেক করিতেছেন। মোক্ষদা অতি বাল্যকালেই মাতৃহারা—এই জননীর আশ্রয়ে প্রতিপালিতা, শিক্ষিতা, যাবতীয় সৎকর্ম্মে অভ্যস্থা; শাশুড়ী ভিন্ন তিনি কিছুই জানেন না!—এ অবস্থায় তাঁহার হৃদয়-ভাব যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; অশ্রুজলের বিরাম নাই, নয়ন উচ্ছ্বসিত, বক্ষ-প্লাবিত; কেবল জননী সমা শাশুড়ীর বদনের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন। বধূর আহারে একটু বিলম্ব হইলে যিনি কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন, সেই মহামায়া আজ সমস্ত মায়া কাটাইয়া নিজের ইষ্টচিন্তায় মগ্না, জগতের কোন মায়াই আর তাঁহাকে কাতর করিতে পারিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদিত-নয়ন একটু উন্মীলিত হইল, অধরোষ্ঠ নড়িল, মহামায়া মমতার শেষ ডাক ডাকিলেন—"রাম আমার!" রামনিধি উঠি পড়ি করিয়া আলুথালু বেশে পদতল হইতে বদনের নিকট আসিয়া শশব্যস্তে করযোড়ে বলিলেন—"আরাধ্য-দেবী আমার, মা এই যে আমি!"

মহামায়া মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"কেঁদনা বাবা কেঁদনা; বাপ মা কাহারও চিরকাল থাকে না, আমিও আর থাকিতে পারিতেছি না। কর্ত্তার আকুল আহ্বান আমার কাণে বাজিতেছে। বৌমা কই?" মোক্ষদা আর কান্না চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া

বলিলেন—"মা! আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ, আমি যে তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানি না মা!"

মহামায়া তাঁহারও মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—"নারীজীবনের সার রত্ন তোমার রহিল। মা! ভয় কি? আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি জন্মায়তী হইয়া পতিপূজায় জীবন সার্থক কর।" তারপর কনিষ্ঠ-ভ্রাতাকে নিকটে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; ননদিনীকে ও শ্যামাকে ডাকিয়া প্রাণের আশীর্ব্বাদ দিলেন, প্রতিবাসী সকলকে করযোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁর প্রাণের ধন পৌত্রীটীকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। কি আদরের ধন যে তাহার চিরতরে চলিয়া যাইতেছে, শিশু তাহা ত বুঝিতে পারিল না, কেবল বুকের কাছে পড়িয়া অস্ফুট ভাষায় আঁঃ ওঁঃ করিতে লাগিল। মহামায়া অগণিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"দিদি! আশা ছিল, কিছুদিন সুদের আনন্দ ভোগ করিব, তোমাকে লালন পালন করিয়া বড় করিব, কিন্তু দেবতার ডাকে আর থাকা হইল না—চলিলাম, তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার কোলে মায়ের খোকা হইয়া কোল যোড়া করুক।" শিশু কিছু বুঝিল কিনা, প্রাণে লাগিল কি না জানি না, তবে সে যেন কষ্টের ব্যথা অনুভব করিয়া চক্ষু মুখ লাল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোক্ষদা খুকীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সতী প্রত্যেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করত কর ধারণ করিয়া জপ আরম্ভ করিলেন, সে জপ থামিল কিন্তু নয়ন আর খুলিল না, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় মহামায়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ক্রন্দনের রোলে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহ শোকের জলন্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিল। শোকে সকলে অধীর হইয়া বলিল—"যাহা গেল, কলিতে আর তেমনটী হইবে না, ইহা কি মৃত্যু, ইহা যে নবজীবন লাভ। সতী নারীর মৃত্যু ত এইরূপই প্রার্থনীয়। মা! তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন ধর্ম্মভাবে জীবন কাটাইয়া এইরূপ সজ্ঞানে দেহপাত করিতে পারি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আত্মকৃত্য।

মহামারী একবার উপস্থিত হইলে গ্রাম বা পল্লী শ্রীহীন না করিয়া ছাড়ে না। সামান্য দুই চারিটী জীবকে উদরসাৎ করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। তখন কুমারখালী গ্রামে জাপক-ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন, তাঁহারা কায়মনে দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন—কালীপূজা, নাম সংকীর্ত্তন প্রভৃতি দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। ওলাদেবী এইবার যেন একটু নরম হইয়া পালাই পালাই করিতে লাগিলেন এবং যাইবার সময় রামনিধির বৃদ্ধা পিসীমাতাকে লইয়া যাইতে ভুলিলেন না। বিপদের উপর বিপদ পাতে পণ্ডিত রামনিধির অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। সংসারের যে দুইটী প্রধান সহায় ছিল, যাঁহাদের গৃহিণীপণায় ব্রাহ্মণ একদিনের জন্যও সংসারজ্বালা অনুভব করেন নাই; আজ তাঁহাদের দুইটীকে হারাইয়া পতি-পত্নী একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ মাতুল শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগিনেয়ের অবস্থা দেখিয়া আপনার হৃদয়-ভাব গোপন করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। রামনিধি ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও শাস্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণ, সংসারের অনিত্যতা খুব বুঝেন; তিনি কয়েকদিনের মধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে দাবাগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ করা কি সহজ ব্যাপার! যাঁহার মায়া মমতায় এ দেহ গঠিত, লালন পালনে বর্দ্ধিত, যে দেব দেবীর স্নেহ ভালবাসায় মানুষের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য উদ্বুদ্ধ—ইহা যে সেই পিতৃমাতৃ-বিয়োগ।

আজ এক বৎসর হইল পিতৃদেব স্বর্গগত হইয়াছেন। রামনিধি

এখনও সে শোক, সে স্মৃতি তিলমাত্র ভুলিতে পারেন নাই। ইহারই মধ্যে আবার নূতন শোক, একটী নয় দুইটী! সংসার-মরুর দুটী আতপছায়া কালের একটী ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্র সংসারকে শ্রীভ্রষ্ট করিতেই কি এবার গ্রামে পাপ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল?

সর্ব্ববিধ সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। পিতৃবিয়োগের পর সংসারে অনাটন হইলে, রামনিধি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার মনের ভাব, দুশ্চিন্তার কারণ অপনোদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুদূর জৌনপুরের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করিয়া, তারপর কেবল পুত্রাদি হইয়া কাল কবলিত হওয়ায় একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যারত্ন দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলে, রামনিধি ভাবিয়াছিলেন—তাহার ভাগ্যাকাশের দুর্দ্দৈব বুঝি কাটিল; মহাগুরু নিপাতের বৎসরে বোধ হয় ভগবান্ আর বেশী কিছু দুঃখ ভোগ না করাইয়া কৃপাচক্ষে দেখিলেন। কিন্তু হায়!—কই তাহা ত হইল না—ইহা অপেক্ষা দৈহিক সকল প্রকার কষ্ট ভোগ করা যে বাঞ্ছনীয় ছিল—মানসিক এই দুশ্চিন্তা যে বড়ই অসহ্য, শোক-ভারে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয় যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে।

মাতুল বুঝিলেন—রামনিধিকে শোক গুরুতরভাবে আঘাত করিতেছে, তিনি অহরহঃ শাস্ত্রের নানাবিধ যুক্তি দেখাইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"বাবা! দিন ত কাটিয়া গেল, শ্রাদ্ধের আর চারিদিন বাকী। তুমি উপযুক্ত পুত্র, এ সময় প্রেতমুক্তি না করিলে তাঁহাদের প্রতি তোমার আন্তরিক ভক্তির হানি হইবে। তাঁহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে তোমার জীবনে নানাবিধ কায়িক ও মানসিক বিপদপাত হইবার সম্ভাবনা। প্রেতলোকে আত্মাকে কি কষ্টভোগ করিতে হয়—শাস্ত্রপাঠী

তুমি ত সমস্ত জান, তবে বাবা! এখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? ওঠ, ধর্ম্মকর্ম্মে অবহেলা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব হারাইও না। পিতামাতা মৃত্যু সময় যে সন্তানের উপর প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, সে ত সৌভাগ্যশালী পুত্র। আজীবন কত ত্রুটী-বিচ্যুতির মধ্যে এরূপ আশীর্ব্বাদ লাভ করা কি সামান্য অদৃষ্টের কথা, তোমার উপর তাঁহাদের সন্তোষের বিষয় স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান্ হও।"

মাতুলের বাক্যে পণ্ডিত রামনিধির চমক ভাঙ্গিল, বাস্তবিক ত আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যাঁহাদের প্রতি প্রাণের এত ভক্তি, যে পিতা মাতা আমার প্রতি এত স্নেহময় ছিলেন; তাঁহাদের প্রেতক্রিয়া সমাধানের যে আর বিলম্ব নাই! রামনিধি মাতুলকে বলিলেন—"মামা! এক্ষণে আপনিই আমার অভিভাবক—সংসারের কর্ত্তা; কিরূপ করিলে সকল দিক বজায় থাকে—তাহার পরামর্শ প্রদান করুন।"

মাতুল নীলানন্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বাবা! বৃষোৎসর্গ করাই বিধেয়। দিদি আমার জন্যও অনেক করিয়াছেন; আমার আর কে আছে, তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে আমিও তোমাকে বিশেষ সাহায্য করিব; বৃষোৎসর্গেরই ব্যবস্থা হউক। রামনিধি, মাতুলের উপর আর কোন কথা কহিলেন না, হাতে একটী পয়সা না থাকিলেও, তিনি জানিতেন এবং একথাও খুব সত্য, যে এসকল সৎকার্য্যে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা ঋণ করিয়া সমাধা করিলেও তাহার জন্য কষ্টভোগ করিতে হয় না। পিতৃপুরুষগণের এমনি কৃপা যে কোথা হইতে তাহার সংযোগ হইয়া যায়। অদৃষ্ট-চক্রের নেমী মন্দদিকে ঘূর্ণিত না হইলে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয় না—এ সময় ভাগ্য মন্দই হইয়া থাকে।

নীলানন্দ ভাগিনেয়ের অভিমত লইয়া গুরুদেবের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ণানন্দ দেবীস্বরূপা মহামায়ার হঠাৎ লোকান্তর গমনের বার্ত্তা শুনিয়া শিষ্যবাটী সমাগত হইলেন। গুরুদেবকে দেখিয়া

রামনিধির মাতৃশোক যেন নবীভূত হইয়া উঠিল, তিনি আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন। পূর্ণানন্দ মহামায়াকে বড়ই ভালবাসিতেন। আজ কিয়দ্দিন হইল, তাঁহাকে সুস্থ-শরীরে দেখিয়া গিয়াছেন—আর আজ সেই মহামায়ার অস্তিত্ব নাই, হায়! ভগবান্! জগতের নশ্বরত্ব কি এইরূপে, বুঝাইয়া দিতে হয়? বিবেকী পূর্ণানন্দের অন্তর একটু ব্যথিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংযমী সাধক সে শোক সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"বাবা! পুত্রের পক্ষে পিতৃমাতৃ-বিয়োগ বড়ই কষ্টকর, কিন্তু ভগবানের কার্য্যের উপর মানুষের ত হাত নাই। সময় হইলেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, এক্ষণে তোমাদের রাখিয়া যে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন—ইহা এক পক্ষে খুব সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কি করিবে বাবা! এখন শোক দুঃখ ভুলিয়া তাঁহাদের পারত্রিক কার্য্য সমাধা করত সুপুত্র নামের পরিচয় প্রদান কর।

রামনিধি শোকজড়িত কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! আপনি আছেন আর মামা আছেন—যাহা ভাল হয় করুন। এখন কর্ত্তাইত আপনারা।"

পূর্ণানন্দ বলিলেন—"বাবা! কোন চিন্তা নাই; মহামায়ার মত দেবীর শ্রাদ্ধ-কার্য্যে কোন প্রকার অঙ্গহানি হইবে না, বেশ সুশৃঙ্খলাতেই সমাধা হইবে।"

বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থাই হইল,—পূর্ণানন্দ গ্রামান্তর হইতে দুইজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে ব্রতী করিলেন। তিনি বিরাট ও গীতা পাঠে ব্রত রহিলেন। মাতুল নীলানন্দ অপর দুই জন ব্রাহ্মণের সহিত শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিলেন।

লোকে কথায় বলে—বৃষোৎসর্গের ব্যাপার; স্মৃতিশাস্ত্রে এই কার্য্যের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, ইহার আড়ম্বর যে কত, তাহার সংখ্যা নাই। ব্রাহ্মণ ভোজন, অধ্যাপক বিদায়, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সে সময় দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছিল,

চারিদিকেই দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হওয়ায় খাদ্যাভাবে অনেক লোক মারা যাইতেছিল। কতকগুলি লোক আসিয়া বলিল—"অধ্যাপক বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কেবল কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা হউক; তাহা হইলে দেশের অনেক দরিদ্র লোক বাঁচিয়া যায়। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া পুরাতন রীতি-নীতি গুলো একটু পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয় না?"

তখন সকল দেশেই একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কতকগুলি নূতন শিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়ের যুবক রামনিধির নিকট এই কথার উত্থাপন করিলে, তিনি বলিলেন—"মামা ও গুরুদেব রহিয়াছেন—উঁহাদের নিকট প্রস্তাব করুন, কিন্তু এ সকল একেবারে বন্ধ করিলে শাস্ত্র-সঙ্গত দোষ পড়ে, তবে দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা একটু ভাল করিয়া হওয়া ভাল।" ইত্যাদি কথা হইতেছে এমন সময় পূর্ণানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবকগণ তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়! আপনি পুরাতন রীতি-নীতি ছাড়ুন, অত ব্রাহ্মণ ভোজন, অধ্যাপক বিদায় না করিয়া দরিদ্রসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করুন। দেশ যায় যায় হইয়াছে, এখন আর পুরাতন ব্যবস্থামত কায করিলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা হইবে না।"

পূর্ণানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাবা! পুরাতন রীতিনীতির অমান্য করা কি চলে? ইহার অর্থ না থাকিলে কি আমাদের শাস্ত্রকারগণ বৃথাই এসকল বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া তাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনায় রত থাকিতেন; তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহজন্য রাজা দেখিতেন, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ পূরণ করিতেন। আর এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যে সেই সকল ঋষিকল্প ভূদেবের অগ্রভাগ প্রদানের ব্যবস্থা, এবং সকল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের তুষ্টি সম্পাদনের ব্যবস্থা

করিলেই দেবতাদের তুষ্টি সম্পাদন করা হইত। তাঁহাদের সংসার এই সকল কার্য্যেই একপ্রকার চলিয়া যাইত বলিয়া, তাঁহারা আর অন্য চিন্তা না করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাই তখন যাগ-যজ্ঞ-বলে দেশে কোন অমঙ্গল, কোনপ্রকার দৈব-দুর্বিপাক সংঘটিত হইত না। এই যে ভীষণ মহামারী তোমাদের গ্রাম উজাড় করিতেছিল, তাহা কাহাদের বলে প্রশমিত হইল জান? পণ্ডিত-পাড়ার ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মতেজে। অনেক ডাক্তার বৈদ্য এবং রাজার সাহায্যও লইয়াছিলে কিন্তু কিছু করিতে পারিয়াছিলে কি? যেদিন হইতে ব্রাহ্মণগণ দৈবকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, সেইদিন হইতেই কলেরার প্রকোপ কমে নাই কি?"

এ ত বেশীদিনের কথা নহে—পাঁচ সাতদিনের কথা, সকলেরই স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, যুবকগণ আর কথা কহিতে পারিল না। পূর্ণানন্দ বলিলেন—"বাবা! নিজের নিজের জাতির প্রতি নিজেই অত তুচ্ছভাব প্রদর্শন করাটা কি ভাল—এই জন্যই ত সব যাইতে বসিয়াছে। যাহা হউক, তোমরা সহায় হইও, আমি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিব।" সকল দিক বজায় রহিল, যুবকগণ সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর করিল—"আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, আমরা সেইরূপই করিব।" বাস্তবিক রামনিধির মাতৃশ্রাদ্ধে "দিয়তাং ভুজ্যতাংয়ের" কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। সর্ব্বশেষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এমন সুশৃঙ্খলায়, এমন পরিপাটীরূপে সমাহিত হইয়াছিল, যাহা কুমারখালী গ্রামে আর কখন হয় নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সুদক্ষ পূর্ণানন্দের ব্যবস্থা-গুণে সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়ার আদ্যকৃত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।



বিদায়ে দুঃখ।

হিন্দুর নিকট জন্মভূমির তুল্য প্রিয়তম দেশ আর নাই। কর্ম্মক্লান্ত হিন্দুজীবন চিরদিন কর্ম্মস্থানের মনোরম হর্ম্ম্যতল ছাড়িয়া পল্লী-জননীর মৃত-কুটীরে আসিয়া জুড়াইবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত, সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। একদিনের অবকাশ পাইলেও ইচ্ছা হয়, একবার বাড়ী যাই, দেশের সে চির-আরামপ্রদ আবাস-ভবনের ছায়া-শীতল তরুতলে বসিয়া একবার আনন্দানুভব করিয়া আসি। পৃথিবীর কোনও স্থানের উপর লোকের এত লোভ, এত প্রাণের টান, এত অনুরাগ নাই—যত আপনার জন্মভূমির উপর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পুত্র বিদেশে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে যায়, স্ত্রী পুত্র লইয়া বৃদ্ধ জনক জননী প্রায়ই দেশে থাকেন। বিদেশে যাইলে প্রায় আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম, কর্ম্মাকর্ম্মের ত্রুটী হইয়া থাকে বলিয়া পুত্রের সহ পিতামাতা প্রায়ই যাইতে চাহেন না, তাঁহারা গৃহে বসিয়া পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে দেবতার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করেন। এখন অর্থোপার্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়—কারণ হিন্দুর গৃহে অন্ন নাই, তাই বিদেশে না যাইলে চলে না, কিন্তু মন তাহাদের দেশের জন্য চিরচঞ্চল থাকে, তাহার প্রধান কারণ কেবল স্বদেশের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি মায়া মমতা নহে কি? ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণুর সহিত যে তাহার মাতৃস্নেহ, জনকের প্রিয় আশীর্ব্বাদ ও বাল্যসহচরগণের আদর অভ্যর্থনা চিরবিজড়িত রহিয়াছে; এখানে যে তার বাৎসল্য-প্রতিমা জননী, স্নেহময় জনক, তাহার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, পুত্র কখন আসিবে

বলিয়া তাঁহারা যে উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছেন, বিদেশে তাঁহারা যত অনাচারী-অধর্ম্মী হউক না কেন, তথাপি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে তাহার সেবা পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। জনক জননীর স্নেহ মমতায় প্রাণ জুড়াইয়া, গৃহ-দেবতা শালগ্রাম শীলার পূজা ভোগের ব্যবস্থা যে তাহাদের অগ্রে করণীয়, বিদেশে যতই অনাচারী হউন, দেশে আসিলে—জন্মভূমির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে তাহাদের আর সে প্রবৃত্তি থাকে না, থাকিলেও লোকনিন্দা ভয়ে তাহার স্ফুরণ হইতে পারে না, বিদেশে দায়ে পড়িয়া যাহা করিতে হয়, দেশে তাহা করিবার উপায় নাই, জনক জননীর ধর্ম্মময়ী প্রবৃত্তি, তাঁহাদের সেই আচারমণ্ডিত প্রকৃতি দেখিলে কোন্ হিন্দুসন্তান প্রকাশ্যে পাপাচরণ করিতে পারে?

অনাচার তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নহে, বিদেশে কেবল দায়ে পড়িয়া শিক্ষার দোষে করিয়া থাকে? কিন্তু পাপ ত চিরদিন মুখরোচক নহে, তাই একপ্রকার হাওয়া বদলাইতে, রুচির পরিবর্ত্তন করিতে, পূজনীয়গণের পূজা প্রদান করিতে সকলেরই প্রবাস ছাড়িয়া দেশে আসিতে অভিলাষ হয়, ইহার মধ্যে পিতামাতার আকর্ষণই প্রধান ও প্রবল। রামনিধি অর্থোপার্জ্জনের জন্য যাইলেও এই আকর্ষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কিছুতেই শান্তি-সুখানুভব করিতে পারিতেন না। সদাই বৃদ্ধা জননীর জন্য প্রাণ উৎকণ্ঠায় ভরিয়া থাকিত; চিরশান্তিময়ী মোক্ষদা নিকটে থাকিলেও মায়ের মায়া তাঁহাকে সদাসর্ব্বদাই কাতর করিত, অশান্তি আনিয়া দিত, মাতৃভক্ত পুত্র তাই সময়ে সময়ে বলিতেন, "মোক্ষদা! বাপ মা ছেড়ে বিদেশে থাকা কি কষ্টকর!" যাহারা কখন বিদেশে যায় নাই, প্রথম প্রথম তাহাদের এইরূপ অসহ্যই হইয়া থাকে। রামনিধি বিদেশে আসিয়া অন্য সকলের মত আচারভ্রষ্ট হন নাই, ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও আর্য্যশাস্ত্রে তাঁহার খুব দখল ছিল, সংস্কৃত শিক্ষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া

বিদ্যালয়ে প্রায়ই তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে হইত, তাঁহার সংস্কৃত পড়াইবার রীতিনীতি এবং বিদেশবাসী হইলেও তাঁহার আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত—হিন্দুস্থানীর দেশে পণ্ডিত আখ্যা খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেই অর্পিত হইয়া থাকে।

মাতৃশ্রাদ্ধের পর দেশে থাকিতে আর তাঁহার প্রাণ চাহে না—হৃদয়ে মাতৃস্মৃতি জাগিয়া সদাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে ছুটী ফুরাইলে হয়, আর এখানে থাকা যায় না। ইহার প্রত্যেক বস্তু যে জননীর সেই আদর-ভালবাসার কথা জাগাইয়া দিয়া তাঁহার অন্তর-বেদনা বাড়াইয়া তুলিতেছে। জন্মভূমির মায়া আর তাঁহার নাই, যাহার জননী নাই, জনক যাহার বহুদিন হইল স্বর্গগত, জড়পদার্থ জন্মভূমি তাঁহাকে কি আনন্দ প্রদান করিবে? জননীর জন্যইত জন্মভূমির এত আদর, জননীর জন্যই ত জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। হায়! সে জননী ত আর নাই, তবে আর তাঁহাকে কে টানিয়া রাখিবে, যাই যাই বলিলেও কাহার কাতর নিষেধ-আজ্ঞা তাঁহার সে গমনে বাধা প্রদান করিবে? এখন মন হইলেই যাইবার জন্য আর ভাবনা নাই, কেহ এক দিনের জন্যও থাকিতে বলিবে না, জগতে যাহার মা নাই, তাহার কিছুই নাই, তাহার সমস্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের মত চলিয়া গিয়াছে। এখন নিজের সুখ, নিজের শান্তি, নিজে যদি করিয়া লইতে পার, তবেই হইবে, নতুবা অরণ্যে রোদনই সার। "বাছার আমার" অসুখ হইবে বলিয়া হৃদয়ের স্নেহ-মমতা দেখাইয়া প্রাণের টানে আর কেহ তেমন করিয়া তোমার ভালমন্দের প্রতি নজর করিবে না।

মাতৃশোক স্বামীকে বিষম লাগিয়াছে, মোক্ষদাকে যে সে শোক লাগে নাই, তাহা নহে—খুবই লাগিয়াছে। শ্বাশুড়ীর শোক মর্ম্মস্থান ছিঁড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তিনি আর কাঁদিয়া কাটিয়া

হৃদয়ভার লাঘব করিতে পারিতেছেন না, সকলেই শোকে পাগল হইলে যে সংসার-বন্ধন শ্লথ হইয়া সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইবে, তাই মোক্ষদা বলিলেন—"দেখ, ছুটীর ত আর বেশী দিন নাই, তুমি মামার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এখানকার বন্দোবস্ত কর।" স্ত্রীর কথা শুনিয়া রামনিধির চমক ভাঙ্গিল, আর ত মোটে এক সপ্তাহ বাকী আছে, অবকাশ অন্তে ত কার্য্যস্থানে যাইতে হইবে। তিনি মাতুল মহাশয়ের নিকট সমস্ত বলিলেন।

মাতুল নীলানন্দ বলিলেন—"বাবা! তোমার মন যেমন উড়ু উড়ু করিতেছে, দেশের উপর যেমন তোমার আর আস্থা নাই। আমারও তদ্রূপ, দিদির পুত্রাধিক ভালবাসায় আমি এতদিন কিছুই জানিতে পারি নাই, এক্ষণে আমারও আর দেশে থাকিতে মন নাই। তবে তুমি কার্য্যস্থানে যাইলে আমাকে কিছুদিন থাকিয়া এখানকার ব্যবস্থা করিতে হইবে, একেবারে দুইজনে চলিয়া গেলে বিষয়-আশয় সমস্ত নষ্ট হইবে। আমার সামান্য যাহা আছে, তাহার মালেকানী-স্বত্ব বহুদিন তোমাকে দিয়াছি; বোধ হয়, দিদির নিকট সে দানপত্রের কথা শুনিয়াছ। এক্ষণে শ্যামা আমার নিকটে থাক, নতুবা এ বৃদ্ধ বয়সে আমার বড় কষ্ট হইবে। যে কয়দিন পারি, তোমার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করি, তার পর প্রাণ অত্যন্ত খারাপ হইলে কাশী চলিয়া যাইব। তুমি কেবল মাত্র মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া আমাকে দিও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। আর আমার দিনকাল প্রায় হইয়া আসিতেছে। যেখানে থাক সংবাদ পাইবামাত্রই কিন্তু আসিয়া উপস্থিত হইও, আমি যেন মৃত্যু সময়ে তোমার এক গণ্ডুষ জল পাই।"

রামনিধি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মামা! আমার আর কেহ নাই, এত শীঘ্র আপনারা একে একে আমাকে একাকী ফেলিয়া চির প্রস্থান করিবেন না। আপনাদের ত ইচ্ছামৃত্যু, একটু দিন বাড়াইয়া দিন। সাধকে কি না করিতে পারে?"

নীলানন্দ বলিলেন, "বাবা! শোক করিও না, বিদেশে যাইবার সময় এত অধীর অন্তঃকরণে যাত্রা করা ভাল নয়, শরীর খারাপ হইলে রাস্তায় অসুখ হইতে পারে। স্থির হও, শান্ত হও, ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার হৃদয়ে নববল সঞ্চার করিয়া সুস্থ করিবেন। খুব সাবধানে থাকিবে, ভগবান তোমার বাড়বাড়ন্ত করুন, অর্থ খরচে ক্রটী করিয়া নিজেরা কষ্ট ভোগ করিও না। উপার্জ্জনের অর্থ সমস্ত ব্যয় করিলেও ভগবান যদি কোন প্রকার দুর্ব্বিপাকে না ফেলেন—তাহা হইলে তোমার যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিবে ;—তাহার দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে তোমার কোন প্রকার অনাটন হইবে না—সঞ্চয়ের জন্য কার্পণ্য করিয়া নিজেকে কষ্ট দিও না। তুমি ছেলেমানুষ এখন হইতে কেবল ঘরে বসিয়া থাকিলে জীবনে সুখ পাইবে না। এখন অর্থের মান বেশী, আমাদের যদিও সম্পত্তি আছে কিন্তু নগদ অর্থের বড়ই অসদ্ভাব—এইজন্য যতদিন পার সরকারী চাকুরী কর, তারপর দেশে আসিয়া সুখে কাল কাটাইবে। পরের দাসত্ব করা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে, তবে যে চাকুরীতে তুমি ব্রতী হইয়াছ, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে ততদূর দোষনীয় নহে। অধ্যাপনা কার্য্য তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট, ইহাতে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। আর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবে। বংশের মান রক্ষা ক'রো—অনাচারী হইও না।"

রামনিধি বলিলেন—"মামা! আমি প্রায় এক বৎসর হইল—প্রবাসে গিয়াছি, ভিন্ন জাতির সহিত অবস্থান করিতেছি, বিদেশীর ভাষা শিক্ষা দিতেছি কিন্তু একদিনের জন্য আমি হিন্দুত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব হইতে পদস্খলিত হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। মামা! আপনার আশীর্ব্বাদে—পিতামাতার ধর্ম্ম উপদেশ-মাখা প্রাণ অন্যায় আচরণ করিতে সদাই কুণ্ঠিত হয়, এ অবস্থায় বোধ হয় আর পতনের সম্ভাবনা নাই।"

নীলানন্দ বলিলেন—"হাঁ বাবা! তা জানি—বাঁড়ুয্যে মহাশয় যাহাকে

হাতে করিয়া গঠন করিয়াছেন—সামান্য প্রলোভনে কি তাহার পতন হয়—আশীর্ব্বাদ করি তোমার চিত্ত, চিরদিন ঐরূপ সুদৃঢ় থাকুক।"

দেখিতে দেখিতে ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিল, আর মাত্র চারি দিন বাকী। অদ্য রাত্রে রওনা হইতে হইবে। শ্যামা দেশে থাকিয়া মামার সেবা করিবে—এইরূপ স্থির হইল। সে আজ সকাল সকাল নানাপ্রকার আহারীয় প্রস্তুত করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে উদর পূরিয়া আহার করাইল। ভ্রাতুষ্পুত্রী বিমলাকে প্রাণ ভরিয়া কত আদর করিল। তারপর সময় হইলে মোক্ষদা শ্বশুরের পদধূলি লইয়া শ্যামাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা জানাইলেন। রামনিধিও মাতুলের পদধূলি লইয়া দুর্গানাম স্মরণ করত শকটারোহণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমবেদনার অশ্রু।

অকপট বন্ধুত্ব জগতে দুর্লভ—নাই—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানাবিধ পৌরাণিক গল্পে ইহার মনোমুগ্ধকর উদাহরণ পাঠ করিয়া বিমোহিত হই বটে কিন্তু যথার্থ বন্ধুর সহবাস লাভ করিয়া জীবন ধন্য করা আমাদের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এমন একদিন ছিল, যেদিন বন্ধুর বিয়োগে বন্ধু জগৎ অন্ধকার দেখিত, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও বন্ধুর উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেরূপ দৃষ্টান্ত এখন অতীব বিরল, এমন কি চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত না হইলেও আমাদের রামনিধি ও কাশীনাথের বন্ধুত্ব একেবারে উপভোগের অনুপযুক্ত নহে।

রামনিধি ছুটীতে বাড়ী আসিয়া অবধি কাশীনাথকে একখানিও

পত্র লিখিতে সময় পান নাই; জননী ও পিসীমাতার শোকে তিনি এতদূর মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সংসারে তাঁহাকে আবার লোকের সহিত মিলিত হইতে হইবে বলিয়া আশা করেন নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন—এ অসহ্য শোকভার বুঝি তাঁহাকে বেশীদিন বহন করিতে হইবে না; বোধ হয় এ শোকের তীব্র যাতনার সহিত তাঁহার এ নশ্বর দেহ পুড়িয়া অল্প দিনের মধ্যেই পঞ্চভূতে লয় হইয়া যাইবে; তাই তিনি শোক-ব্যথিত হৃদয়ে অনবরত কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সময় কাটাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া যখন মাতুল ও গুরুদেব উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রাণের ঐকান্তিকতা, সাহস ও উৎসাহ যখন তাঁহার হৃদয়ে আবার নূতন বল সঞ্চয় করিতে লাগিল; গুরুদেব যখন তাঁহার ক্ষীণ প্রাণে ইষ্ট-মন্ত্রের সুতীক্ষ্ণ শক্তির প্রয়োগ করিয়া জগতের অসারত্ব সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। শোকে মুহ্যমান হইয়া সংসার-কার্য্যে অবহেলা করা হীনচেতা, অবীরের কার্য্য যেদিন বুঝিতে পারিলেন—সেইদিন হইতে রামনিধি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বভাব লাভের জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন, জননীর পারলৌকিক ক্রিয়া সকল সমাধা করিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন কিন্তু স্মৃতি যখন তাঁহাকে কোন প্রকারেই ছাড়িত না, চেষ্টা করিয়াও যখন জননীর আদর-ভালবাসার কথা তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে তাড়াইতে পারিতেন না, তখন নির্জ্জনে গোমতীতীরে বসিয়া জননীর উদ্দেশ্যে শোকের তপ্ত-নিশ্বাস ফেলিয়া আকুলি-বিকুলি করিয়া কত কাঁদিতেন।

জৌনপুরে আসিয়া মাতুলকে সুস্থশরীরে পৌছান সংবাদ পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। কাশীনাথ কয়েকদিন বাটীতে ছিলেন না; স্থানান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। রামনিধি আসিয়াছেন—শুনিয়া, তিনি সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বন্ধুর

স্বদেশ গমনের পর হইতে বাস্তবিক কাশীনাথ যূথভ্রষ্ট হইয়া প্রাণে বড়ই নিরানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকের কার্য্য বড়ই দায়ীত্বপূর্ণ; মনের চঞ্চলতাহেতু পাছে কোন কায খারাপ করিয়া ফেলেন, পাছে তাহাতে রোগীর কোন অনিষ্ট হয়, এইজন্য তিনি স্বইচ্ছায় অনেক রোগী পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—যে "আমার শরীর ভাল নয়—তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর।"

কাশীনাথ রামনিধিকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার ন্যায় নিরীহ সত্যবাদী ব্রাহ্মণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তিনি প্রবাসে যারপরনাই সুখে কালযাপন করিতেছেন। রামনিধির স্বভাবের সহিত তাঁহার কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও কি জানি কেমন একটা প্রাণের আকর্ষণ হইয়াছিল—যাহাতে উভয়ে একত্র থাকিলে, একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। বন্ধুহীন প্রবাসে নিঃস্বার্থ বন্ধু পাইলে মানুষের এমনি একটা আন্তরিকতা আসিয়া স্বভাবত সমস্ত অভাব নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ যতই পরবাসে পরশিক্ষার প্রভাবে পর সভ্যতায় অভ্যস্থ হইয়া আপনাকে পরভাবে বিজড়িত করিতে চেষ্টা করুক না কেন—প্রাণ যে সময়ে সময়ে তাহাকে আপনার ভাবে বিভোর হইবার জন্য তাড়না করে, কাযেই সম্পূর্ণ পর হইতে তাহার সাহস হয় না।

রামনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কাশীনাথ বলিলেন—"ভাই! একেবারেই যে ভুলিয়া গিয়াছিলে, একখানি পত্র কি দিতে নাই?"

"ভাই! মার্জ্জনা কর, এবার দেশে গিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, স্নেহময়ী মা আমার—" বলিয়া রামনিধি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শোক দ্বিগুণিত হইয়া নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল, বাক্যরোধ হইল। এত চেষ্টা করিয়াও বন্ধুর নিকট তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

কাশীনাথ বন্ধুর বিপদপাতের বিষয় হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিলেন—প্রকাশ করিয়া সমস্ত না বলিলেও তিনি সমবেদনার অশ্রু মোচন করিয়া

বলিলেন—"মাতৃবিয়োগ অতীব দুঃসহ কিন্তু কি করিবে ভাই! ঈশ্বরের কার্য্যের উপর ত আর কাহারও হাত নাই। তবে আমাকে সংবাদ দিলে না কেন। সে সময় আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেও পারিতাম, যাই হউক, শ্রাদ্ধাদির জন্য কিছু অনাটন হয় নাই ত?"

রামনিধি বলিলেন—"ভাই! সংবাদ দিবার সময় হইল না, একটী শোক সহ্য হইতে না হইতেই দ্বিতীয় শোক—বৃদ্ধা পিসীমাতাও জননীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। দুরন্ত মড়কে দেশের অবস্থা যে কি ভীষণ হইয়াছিল, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। এমন মৃত্যুর সংখ্যা আমি কখন দেখি নাই; দেশ একপ্রকার উজাড় হইয়া গিয়াছে; তবে এখন অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের সাহায্যে জননীর কার্য্যে কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই; আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে খুব ভালই হইয়াছিল। তারপর অবকাশ প্রায় শেষ হয় দেখিয়া, বৃদ্ধ মামার তত্ত্বাবধানে শ্যামাকে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু মনের গতি অত্যন্ত খারাপ।"

কাশীনাথ। তা ত হ'বেই; এ শোক কি আর সহজে দুই এক দিনে ভুলিতে পারিবে, এ যে অন্তর্ভেদী। যাহা হউক, তুমি পণ্ডিত— তোমাকে আর কি বুঝাইব, তবে মৃতের জন্য শোকে অধীর হ'য়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রো না।

রামনিধি। না ভাই! এই জন্যই ত সেখানে মন অস্থির হয় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তোমার ন্যায় বন্ধুর কাছে চলিয়া আসিলাম। আর দরখাস্ত করিয়া বেশীদিন ছুটী লইলাম না।

কাশীনাথ। খুব ভালই করিয়াছ! আরও একটা সুখবর শুনিয়াছ? এবার তোমার বেতন বৃদ্ধির সময় হইয়াছে; আমি সেদিন ডিরেক্টর মহাশয়ের বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। তোমার উপর তাঁহার মন্তব্য দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি, তিনি তোমার জন্য খুব ভাল

করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন; কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়াই জানেন কিন্তু তুমি যে ইংরাজী অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক, তাহা সেদিন ডিরেক্টর মহাশয় বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন—ইহাতে তোমার একটা মোটা রকম বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

এই সুসংবাদ শুনিয়া রামনিধির বদনে হর্ষ বা বিষাদের চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না, কেবল বলিলেন—"ভগবদ ইচ্ছায়, আর তোমার পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদে, অভাব হইলে তিনি নিশ্চয় পূরণ করিবেন। সেদিন স্কুলের ছুটী ছিল, উভয় বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সংসারের ভালমন্দ কথা হইল। বন্ধুর কন্যাটীকে কোলে করিয়া কাশীনাথ কত আদর করিলেন। রামনিধিও তারাদাস লীলাবতী এবং বন্ধু-পরিবারের কুশল সংবাদ লইতে ভুলিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাযের কথা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সাত আটবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রামনিধির মাতুল আর ইহলোকে নাই। মাতুলের মৃত্যুর পর হতাশ প্রাণে রামনিধি কার্য্য ছাড়িয়া দিবার মনস্থ করিয়া দেশে আসিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন কিন্তু সকলের অনুরোধে এবং সরকারী চাকুরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আরও কয়েক বৎসর কায করিয়া পেন্‌সন লইয়া দেশে যাইবেন—এই সিদ্ধান্তে সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রামনিধি এখনও শিক্ষকতা করিতেছেন,—কিন্তু কুমারখালীর আবাস-বাটীতে চাবি পড়িয়াছে, শ্যামা পুনরায় জৌনপুরে সমাগতা হইয়াছে। রামনিধি

সময়ে সময়ে চাষ-আবাদের ফসল বিক্রয়ের জন্য এক একবার দেশে আসেন, যাহার সহিত অংশে আবাদের কার্য্য হইত, তাহার সহিত হিসাব নিকাশ করিয়া আবার কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইতেন। গৃহ সেই কয়দিন মাত্র আনন্দ মুখরিত হইয়া আবার সম্বৎসর অন্ধকারের সুকঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অশেষ যাতনানুভব করিত।

এই কয় বৎসরের মধ্যে কাশীনাথের দেশে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মাতা অতি বাল্যকালেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। পিতার জন্য কাশীনাথ কখন কখন দেশের সংবাদাদি লইতেন—তাঁহার যে চাকুরী তাহাতে দেশে যাইয়া দুই দশদিন অপেক্ষা করা চলে না, তবে পিতার পীড়ার সময় টেলিগ্রাম পাইয়া কিছুদিনের জন্য বাধ্য হইয়া ছুটী লইয়া গিয়াছিলেন। পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া আজ এক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন, আর যাইবার নামটী পর্য্যন্ত করেন না। দেশের অপেক্ষা বিদেশে তিনি বেশ সুখে থাকেন—কারণ এখানে তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিবার নাই। বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার বাবু যাহা করেন, তাহার আবার বাদ প্রতিবাদ কি? বিদেশে অর্থের আদরই যে সকলের অপেক্ষা বেশী—সে বিষয়ে ত তাঁহার অভাব নাই। সরকারী এক শত টাকা বেতন ত আছেই, তাহার উপর চিকিৎসা-কার্য্যেও তিনি বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন, এমন অর্থবানের সুযশ-মহত্ব কত, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বড়লোক ডাক্তারবাবুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—ডাক্তার বাবু একটী শিক্ষিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। কাশীনাথ ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করিয়াছেন—এখন লীলাবতীর অদৃষ্ট।

দরিদ্র রামনিধির তত অর্থ নাই কিন্তু গুরুর আদেশ অনুসারে কন্যার তাদৃশ বয়স না হইলেও নবম বৎসরের মধ্যে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে

হইবে ভাবিয়া পতি পত্নীতে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। উপায়ান্তর না থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও কন্যাটীকে সৎপাত্রে প্রদান করিবেন—ইহাতে তাঁহাদের দেশের বিষয় আশয় যদি বিক্রয় করিতে হয় —তাহাও স্বীকার। তাঁহাদের আর কন্যা নাই, কিছুদিন হইল জননীর আশীর্ব্বাদে একটী মাত্র পুত্র হইয়াছে; পুত্রপ্রসবে এবার মোক্ষদার কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই।

কন্যার বিবাহ লইয়া রামনিধি এখন প্রায়ই চিন্তিত থাকেন, দেশে দুই একজনকে সৎপাত্র সন্ধানের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্রাদিও লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সৎপাত্র পাওয়া যায় ত অর্থে কুলায় না, অর্থে কুলায় ত পাত্র মনোমত হয় না। অথচ আর বিলম্ব করা চলে না—গুরুর আদেশে নবম বর্ষেই বিমলাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিতে হইবে। কোষ্ঠির ফলে কন্যাকে সত্বর গোত্রান্তর করিতে পারিলে, সে দীর্ঘজীবী হইবে। মোক্ষদা একদিন স্বামীকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, ডাক্তার বাবুত আমাদের এত যত্ন করেন—তোমরা উভয়ে একপ্রাণ এক আত্মা; এ অবস্থায় একবার তারাদাসের সঙ্গে বিমলার বিবাহের কথা পাড়িলে হয় না? বিমলাকেও তাঁহারা খুব ভালবাসেন—তাহার রূপ-গুণের খুব প্রশংসা করেন; আর আমাদের যাই হউক বিমলা ত নিতান্ত কুৎসিত নহে। সে ত বড়লোকের বউ হবার কোন ক্রমেই অনুপযুক্ত নয়?"

রামনিধি। দেখ সমস্ত কথাই ঠিক, আমি কিন্তু স্বার্থের জন্য কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই। বিশেষতঃ বন্ধুর নিকট ওকথা বলিলে যেন একটু স্বার্থপর হওয়া হয়, কাশীনাথ হয়ত পুত্রের বিবাহে অনেক টাকা পাইবার আশা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটী যেরূপ রূপবান ও গুণবান তাহাতে নিশ্চয়ই কোন বড়লোক উহাকে জামাতা করিয়া অজস্র টাকা যৌতুক দিবে। তাহার পিতার অবস্থা

এখন বেশ ভাল, ছেলেটীও খুব সৎপাত্র, লোকে প্রার্থনা করিয়া ওরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে লালায়িত হইবে। সে ক্ষেত্রে যদি আমার কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা উত্থাপন করি, তাহাতে নিশ্চয়ই উহার ক্ষতি হইবে—তাহার স্বার্থে আঘাত পড়িলে কি জানি বন্ধুত্বও বোধ হয় নষ্ট হইতে পারে। তারাদাসের পিতার অবস্থা বুঝিয়া তাহার ন্যায় পাত্রে কন্যাদান অতীব সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের কোথায়! বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। পাছে কোনরূপ অশুভ ফল হয় বলিয়া আমি কাশীনাথকে কোন কথা বলিতে সাহস করি না।

মোক্ষদা বুঝিয়া বলিলেন,—"হাঁ তাও ঠিক, যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সে অপমান রাখিতে স্থান নাই; অন্য স্থানে এক প্রকার অপমান সহ্য করিতে পারা যায়,—আর যখন মেয়ে হয়েছে, তখন করিতেই হইবে। কিন্তু বন্ধুর নিকট কথা পাড়িয়া ফল না হইলে সে মনোকষ্ট রাখিবার স্থান নাই। ছেলেটী কিন্তু ঘর আলো করা ছেলে,—যেমন রূপ, তেমনই গুণ; বাপের অত পয়সা, লেখা পড়াও খুব শিখেছে, কিন্তু তিলমাত্র অহঙ্কার নাই। যাহা হউক, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, এই ছুটীতে একবার দেশে ভাল করিয়া সন্ধান কর।"

রামনিধি। তাই করিব, আর ত ছুটীর বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু ওরূপ পাত্র পাওয়া মেয়ের অদৃষ্ট, আর আমাদের অদৃষ্টও কম নয়! তবে বলিলে, কাশীনাথ রাজী হতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী কি রাজী হইবেন? তাঁরা ত কথায় কথায় বলেন—"লীলার বিয়েতে যে টাকা খরচ হইতেছে, তারার বিয়েতে আমরা সেই টাকা তুলবো।" এ ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহের কথা তুলিয়া আমার ন্যায় দরিদ্রের হাস্যাস্পদ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

মোক্ষদা বলিলেন,—"তা ত সত্য! বিশেষতঃ তাঁহার কাছে কথা

তুলিয়া ফল না হইলে কষ্টটা মর্ম্মান্তিক হইবে—এই জন্য আমাদের সে আশা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। তবে তুমি আর নিশ্চেষ্ট থেকো না; চেষ্টা কর—নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থার মত পাত্র পাওয়া যাইবে; সকলের পাওয়া যায়—আর আমাদের কি ভগবান মনের মত পাত্র মিলাইয়া দিবেন না?

রামনিধি এখন আর বড় এথায় সেথায় যাইয়া সময় নষ্ট করেন না। ছুটীর পরই আসিয়া পতি-পত্নীতে কন্যার বিবাহের পরামর্শ করেন, দেশে বিদেশে যেখানে কোন আত্মীয় বা জানিত বন্ধু-বান্ধব আছেন—তাঁহাদিগকেই কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির করিতে, পত্রের দ্বারা অনুরোধ করিয়া থাকেন।"

কাশীনাথ দুই চারি দিন বন্ধুর দর্শন না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। একদিন তাঁহাকে ভৃত্যের দ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন—রামনিধি বিষণ্ণ-বদনে উপস্থিত হইলে কাশীনাথ বলিলেন—"রাম-দা! তিন চার দিন কোথায় ছিলে, আমারও কাযের ঝঞ্ঝাট—এত পড়িয়াছে, যে যাইবার অবকাশ পাই নাই; তোমাকে অত্যন্ত মলিন দেখ্‌ছি যে, কোন অসুখ বিসুখ করে নাই ত, বাড়ীর সকলে ভাল ত?"

রামনিধি অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিলেন,—"না ভাই! কোন অসুখ হয় নাই, তবে একটী ভয়ানক চিন্তায় পড়িয়াছি?"

কাশীনাথ সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"হঠাৎ আবার চিন্তা কিসের—তুমি ত দেশের ভাবনার হাত এক প্রকার এড়াইয়াছ?"

রামনিধি।—হাঁ ভাই! এ সে সকল ভাবনা নয়, এ বড় মর্ম্মান্তিক?

কাশীনাথ। কি বলই না শুনি—শুন্‌তে কি দোষ আছে?

রামনিধি। দেখ, আমার ছেলে পিলে হয়ে বাঁচে না, তাত তুমি জান? সেবার কন্যাটীকে লইয়া আমার স্ত্রী যখন দেশে যায়—সেই

সময় গুরুদেব আসিয়া তাহার ললাট-ফল গণনা করিয়া কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—এ মেয়ে আর মরিবে না—ইহার পর হইতে যে সকল পুত্রাদি হইবে—তাহাদের জন্যও কোন চিন্তা নাই—তবে মেয়েটী যাহাতে নয় বৎসরে পাত্রস্থ হয়, গোত্রান্তরে গিয়া পড়ে, তাহা করিবে; মেয়ের আয়ুরেখা খুব বেশী হইলেও, উহার জীবনে অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখা দিবে। আমরা এই জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি; বিদেশে পরের চাকুরী করিয়া এখন কেমন করিয়া পাত্রের অনুসন্ধান করিব?

কাশীনাথ। বিমলার বয়স কি নয় বৎসর হইয়াছে নাকি?

রামনিধি। হাঁ প্রায় হইল বই কি, পাত্র ঠিক করিতে করিতে ঠিক সময়ই হইবে—এখন প্রায় আট উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কাশীনাথ। দেখ ভাই! তোমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রেই মরিলে; অমন ছোট মেয়েটীকে বিবাহ দিলে সে কেমন করে, শ্বশুর ঘরে একাকী থাকিবে। তোমার মেয়ে একটু মোটাসোটা, একটু বাড়বাড়ন্ত তাই, অন্য লোকের আট বৎসরের মেয়ে ত কাপড় পর্‌তে জানে না?

রামনিধি। ভাই গুরুদেবের কথা ত অমান্য করা চলে না; আর বিয়ে হইলেই শ্বশুরের বাটী যেতে হবে, তার মানে কি? মেয়েও যেমন ছোট ছেলেটীও ত তেমনি হইবে, তাহার এখন পঠদ্দশা, তাহার মা বাপ বউকে এখন লইয়া যাইবেই বা কেন? বিবাহ হলেই যে স্বামীর ঘর করিতে হইবে—তার ত কিছু মানে নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে আট বৎসরে গৌরীদানের ফল, নবম বৎসরে রোহিণীদানের ফল ছিল; খুব ছোট মেয়েরও বিবাহ প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাস্ত্রবিধি মানিয়া বিবাহ দিত কিন্তু কন্যা যতদিন উপযুক্ত না হয়, ততদিন তাহারা উভয়ে কেবল কুটুম্বিতা করিয়া ক্ষান্ত হইত, পুত্র কন্যা একত্র করিত না।

কাশীনাথ বন্ধুর কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কোথাও কোন পাত্রের সন্ধান করিয়াছ কি?"

রামনিধি। দুই একস্থানে করিয়াছি, কিন্তু পাত্র পছন্দ হইলে, দেনা-পাওনায় মিলে না, আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে পড়ে; আর যেখানে দেনা-পাওনায় মিলে, সেখানে পাত্র পছন্দ হয় না—মেয়েটীকে ত আ হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি না ?

কাশীনাথ। তাও কি হয়—আর কোন্ বাপ-মাই বা তা পারে ?

রামনিধি। এখন কি করি ভাই! তাই বড়ই চিন্তিত, বড়ই হইয়া পড়িয়াছি, কিছুই ভাল লাগে না।

কাশীনাথ চিরকাল বড় আমোদ-প্রিয়, সংসারের চিন্তা তিনি ধরিয়া করিতে পারিতেন না, যাহা কিছু ষোড়শীই সমস্ত কাশীনাথ নিজের কায, রোগীগণের ভাবনা লইয়াই থাকিতেন। বৈকালবেলা হাতে কায কম, রোগী-পত্রও বেশী নাই। তাই হাসিতে বলিলেন,—"রাম-দা! ভাবনা ত রোজই আছে, আজ বেশী ভেবে কায নাই, চল একস্থানে বেড়াইতে যাই।"

কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে কাশীনাথ রামনিধিকে না যাইতেন না। রামনিধি দরিদ্র হইলেও কাশীনাথ অপেক্ষা লেখা-পড়ায়, জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ, আর কাশীনাথ নিজের কাযে অর্থাৎ চিকিৎসা বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ, অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা খুব কম, এই জন্য কোথাও যাইতে হইলে রামনিধিই তাঁহার সহযাত্রী হইতেন। কথা-বার্ত্তায় তর্ক-বিতর্কে তাঁহাকে সহজে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, যেমন কোন তর্ক হউক না কেন কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গলা—রামনিধি সকল বিষয়ে বেশ সুদক্ষ ছিলেন।

কাশীনাথ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে রামনিধি বলিলেন—"ভাই! আমার একটী বন্ধু আজিকার গাড়ীতে স্বদেশে যাইতেছেন—কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে—আজ তুমি একাই যাও, আমার যাওয়া হইবে না।"

কাশীনাথের প্রাণটা খুব সরল ছিল—ধর্ম্মকর্ম্ম এবং আচার-বিচারে যত না হউক, প্রাণের মধ্যে তাঁহার কোন গোলমাল ছিল না—তিনি সরল প্রাণের হাসি হাসিতে হাসিতে বন্ধুর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার বিয়ের ভাবনা; কোথাও পাত্র না পাওয়া —আর তোমার যদি একান্ত ধনুকভাঙ্গা পণই হয়ে থাকে, যে নয় র রোহিণীদানের ফলভোগ ক'র্ব্বো; তা না হয় তারার সঙ্গেই দেওয়া যাবে এখন, আমারও ত ছেলে রয়েছে—তারাকে কি র পছন্দ হয় না?"

নিধি বন্ধুর কথাটা লইবার জন্যই নানা প্রকার ভান করিতে- —এক্ষণে তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতে। বলিলেন—"ভাই! পছন্দ কি ব'ল্‌ছো; তারার মত পাত্র পেলে ত পরম সৌভাগ্য মনে করি—তা আমার মত গরীবের মেয়ে— পছন্দ 'হ'তে পারে এবং তুমি বড় লোক—আমার মত দরিদ্র নিকট কিছু নাও নিতে পার, কিন্তু তোমার গিন্নী ঠাকুরাণীর কে মন উঠিবে?"

কাশীনাথ। আরে রেখে দাও—তোমার গিন্নীর মন উঠার কথা; বিমলার মত বউ পেলে, সে আনন্দে গ'লে যাবে—এমন পদ্মফুলের মত বউ আগে, না টাকা আগে?

কাশীনাথ স্ত্রীর একটু বেশী অনুরক্ত হইলেও, তাঁহার কথা কাহারও কাটিবার ক্ষমতা ছিল না—তিনি একবার যাহা বলিবেন—তাহা না করিলে —কাহারও রক্ষা নাই, তা সে স্ত্রীই হউক, আর গুরুই হউন না কেন? রামনিধি আর কোন কথা না কহিয়া ভগবানের নিতান্ত আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া বন্ধুর সহিত হাসিতে হাসিতে বেড়াইতে গেলেন। অনেক রাত্রি অবধি কাশীনাথের সহিত নানা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মজলিসে ঘুরিয়া বাড়ী আসিলেন। কাশীনাথ এই সকল স্থানে গৃহ-চিকিৎসকরূপে ব্রতী

,বাৎসরিক অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, তাই সময় সময় অবসর ı, তাহাদের বাটী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হয়, পাছে কোন -তর্কের অবতারণা হয়, এই জন্য রামনিধির মত একজন বিচক্ষণ :ক সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যে সকল লোকের ছায়া স্পর্শ করিবার ়যোগ রামনিধির হইত না, কাশীনাথের সহিত যাতায়াত করিয়া রামনিধিও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া ধনী-সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাকাপাকি।

কাশীনাথ একজন ইংরাজী পাশ করা ডাক্তার। শরীর খারাপ হইলে সময়ে সময়ে তিনি ঔষধের অনুপানে সুরাপান করিতেন াটে—কিন্তু তাহা কেহ জানিত না এবং তিনি যে কায করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন—কোনক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না। চিকিৎসার সময় আচার-ব্যবহারের কতকটা অন্যথা করিলেও অপর সময়ে ক্ষমতানুসারে তিনি ব্রাহ্মণের মত সদাচারীই থাকিতেন।

বন্ধুর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিব—যখন কাশীনাথ নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন আর তাহার অন্যথা হইবার নহে। রামনিধি বন্ধুকে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ বুঝিয়া, তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া মোক্ষদাকে বলিলেন—"মোক্ষদা! আজ আশার অতিরিক্ত ল হইয়াছে, ভগবান এতদিনে আমাদিগকে কন্যার বিবাহ-চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত করিলেন—যাহা কখন মনের কোণেও স্থান দিই নাই—আজ তাহাই হইয়াছে।"

মোক্ষদা বহুদিনের পর স্বামীর প্রসন্ন হাসিমাখা-মুখ দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাগা! হঠাৎ কি হ'ল, তোমার মুখে যে আর হাসি ধরে না, বলি বন্ধুর নিকট কি কোন আশা পেয়েছ নাকি?"

রামনিধি। দেখ, ভগবানকে কায়মনচিত্তে ডাকিলে কখন নিস্ফল হয় না। বহুদিন কাশীনাথের সহিত দেখা করি নাই বলিয়া, অদ্য বৈকালে তিনি আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার পর এতদিন না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমার বিমর্ষ বদন দেখিয়া বলিলেন—"ভাই রামনিধি! এ কয়দিন একেবারে দেখা পাই নাই কেন? তোমার চেহারাও এত খারাপ দেখ্‌ছি কেন, কোন অসুখ করে নাই ত?"

"আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বলিলাম এবং আর যে আসিতে পারিব, তাহার পক্ষেও সন্দেহ, কারণ আমাকে এখন কন্যার বিবাহের জন্য নানাস্থানে যাইতে হইবে। কাশীনাথ শুনিয়া বলিলেন,—"আর না আইস, এখন ত চল—একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসি।" আমি পত্র লিখিবার অছিলায় চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি বলিলেন, "এতই ব্যস্ত কেন, একান্ত কোথাও পাত্র না পাও, আমার তারার সহিত বিমলার বিবাহ দিব, তার জন্য আর ভাবনা কি?" কাশীনাথের প্রতিজ্ঞা কখন ব্যর্থ হয় না, ভ্রমণ করিয়া বাটী আসিবার সময়ও সেই কথা কয়েকবার স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম,—"তবে আমি আর অন্যত্র চেষ্টা দেখিব না?" কাশীনাথ অভয় দিয়া বাটী চলিয়া গেলেন। দেখ মোক্ষদা, তারাদাসের সহিত বিমলার যে বিবাহ সংঘটন হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর; একে সে ধনীর পুত্র, তায় আবার রূপবান ও গুণবান। ওরূপ পাত্রে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের কন্যা সমর্পণ কখনই সম্ভবপর নহে, তবে দেখিতেছি—ভগবান একান্তই প্রসন্ন হইয়াছেন—বিমলার ললাট-লিপি খুব ভালই লিখিয়াছেন।"

মোক্ষদা। দেখ, এখন এত নির্ভর ক'রো না, ভগবানের কৃপায় দুই হস্ত এক না হ'লে, কিছুই বলা যায় না—বিবাহ কি এত সহজে হয়—তবে ভবিতব্যের কৃপা হ'লে সব হ'তে পারে। যেখানে বিধি মিলাইয়া রাখিয়াছেন—ঠিক তাহার সহিত ঘটনাঘটন হ'লে আর বেশী কথা কইতে হয় না।

রামনিধি। মোক্ষদা! এ বোধ হয় তাই; এখানে বিমলার বিবাহ হওয়া, বোধ হয়, ভগবানের অভিপ্রেত, নতুবা কাশীনাথ একেবারে এমন করিয়া আমাকে আশা দিবেন কেন?

স্বামীর মুখে কাশীনাথের উদারতার কথা শুনিয়া মোক্ষদা আনন্দে অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার কন্যা বিমলা যে এমন সুপাত্রে পড়িবে, পতি-পত্নী তাহা কখন চিন্তাও করেন নাই, কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে মধ্যাহ্নকালে সেই কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু রামনিধি সে কথায় তত আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই; এক্ষণে মোক্ষদার কথাই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সতীবাক্য কি অন্যথা হয়; যাহা হউক, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে, এখন সব দিক্ রক্ষা হয়—মেয়েটাকে একটা যথার্থ সৎপাত্রে দিয়ে ত উপস্থিত ভাবনার হাত এড়াই—তার পর ভগবান যা করেন?"

নিজের সুখ্যাতি শুনিয়া সতীর বদন একটু বিকৃত হইল, কারণ হিন্দুস্ত্রীর পক্ষে সতী আখ্যা কিছু আশ্চর্য্য নহে—এবং তাহার জন্য বড়াই করা চলে না; সে জন্য যে বিশেষ একটা সম্ভ্রম লাভ—তাহাই বা চায় কে? ইহাত হিন্দুস্ত্রীর জন্মগত গুণ।

"আমার বাক্যের ক্ষমতা যদি এতই হইয়া থাকে—তা সে কাহার বলে—এই ধূলার জোরেইত?" বলিয়া মোক্ষদা স্বামীর পদধূলি লইয়া জিহ্বায় স্পর্শ করত মস্তকে ধারণ করিলেন। তার পর আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

আনন্দে সে রাত্রি তাঁহাদের নিদ্রা হইল না, স্বামী স্ত্রীতে কতই সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। শ্যামা বলিল—"দাদা! তবে বিমলার বিয়ে কত দিনে হইবে?" রামনিধি বলিলেন—"কা'ল সে কথা পাকাপাকি করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিব; তবে জোড়াগাঁথা হ'তে সেই বৈশাখ মাসের শেষ। কারণ আমাকে গ্রীষ্মের ছুটীতে বাটী যাইয়া টাকার যোগাড় করিতে হইবে ত!" মোক্ষদা বলিলেন—"দেখ! কাশী বাবু খুব ভদ্রতা করিতেছেন, তিনি বোধ হয় যখন আপনি প্রস্তাব ক'রেছেন, তখন আমাদের মত গরীবের নিকট হ'তে এক পয়সাও চাহিবেন না, কিন্তু জামাইটী খুব ছেলেমানুষ এবং বড় আবদেরে, যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে, যেন কোন পৃথক ভাব নাই—মনের সঙ্কোচ কিছুই রাখে না,—বিমলা যেন তার কতই আত্মীয়, এসেই বলে—'বিমলা! পড়্‌বে না?' আমরা ব'ল্‌লে—সে বই হাতে ক'র্‌বার নাম করে না, মুখ ভার করে থাকে, আর তারাদাস আসিয়া পড়্‌বার কথা ব'ল্‌লেই অমনি তাড়াতাড়ি বই লইয়া পড়িতে বসে। তারাদাস কেমন আমার কাছ থেকে জোর ক'রে খাবার খেয়ে বাড়ী চলে যায়, তা বাছার কোন বড়মানুষী নাই—যা দাও, এমন ছেলে কি আর হয়! দুইটীতে এখনই এই মিল—বিবাহ হ'লে না জানি কত সুখী হবে।" শ্যামাও তারাদাসের প্রতি বিমলার কত প্রকার অনুরাগের কথা বলিয়া সে রজনীর মত সকলে নিদ্রার জন্য শয্যার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রাতঃকালে কাশীনাথ প্রায় হাঁসপাতালে থাকেন, কাযেই ষোড়শীর সহিত কাশীনাথের কি কথাবার্ত্তা হইল এবং তাঁহার মত কি শুনিয়া একেবারে পাকা করিয়া দিন স্থির করিয়া আসিবেন বলিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে হাঁসপাতালে গমন করিলেন। কাশীনাথ বাটীতে আসিয়াই পত্নী ষোড়শীর নিকট বন্ধুর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া-

ছিলেন। তাহাতে তাঁহার শ্বাশুড়ী ও পত্নী ষোড়শী একেবারে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তাহা কি কখন হয়? রামনিধির টাকা কোথায় যে আমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হবে? আমরা লীলার বিবাহে যে টাকা খরচ ক'রেছি, তারার বিবাহে তাহা তুলিয়া লইব,—তুমি বন্ধুর মিষ্ট কথায় যেন ভুলে যেও না।"

কাশীনাথ বলিলেন—"আর ভুলে যেও না, আমি তাহাকে এক প্রকার আশা দিয়া আসিয়াছি। নবম বৎসরে রোহিণী দান করিয়া সে মেয়েটীকে গোত্রান্তর করিবে। তাহার গুরুদেব নাকি, এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন, তাহা হইলে আর তার জীবনে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না। নিধির ছেলেপিলে হয়ে বাঁচেনা ব'লেই, গুরুর এইরূপ আদেশ। রামনিধি যেরূপ ভদ্রলোক এবং পণ্ডিত, তারাকে এবং লীলাকে সে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছে—তাহাতে এই দায়ে তাহার উদ্ধার সাধন করা উচিত; তারার সহিত বিবাহ হইলে রামনিধির সহিত শুধু বন্ধুত্ব কেন, একটা আত্মীয়তা বেশ পাকাপাকি হইবে।"

ষোড়শী স্বামীর কথায় প্রথমে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—শ্বাশুড়ীও অস্বীকৃত হইতে ছাড়েন নাই, কিন্তু কাশীনাথ যে কায করিবেন, যাহা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। অর্থের ত অভাব নাই, আর যখন স্বামীর একান্ত ইচ্ছা, তখন মত না দিয়া উপায় কি? ষোড়শী ত এখনকার মত উগ্রচণ্ডা মেয়ে নয়—তিনিও যে হিন্দুস্ত্রীর মত সতীত্বের দাবী করিয়া থাকেন। যখন স্বামীর একান্ত ইচ্ছা—তখন বিমলার প্রতিমার মত রূপ, তাহার সেই অতুলনীয় গুণগরিমার বিষয় ভাবিয়া মত দিলেন বটে, কিন্তু যেন তেমন মনঃপুত হইল না, ইহার উপর কিছু টাকা পাইলেই যেন সোণায় সোহাগা হইত কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত কোন কথা বলিতে সাহস

হয় না। অতএব বিমলার সহিত তারাদাসের বিবাহ হইবে, একরূপ স্থির হইয়া গেল।

প্রাতঃকালে উভয় বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে রামনিধি যখন পুনরায় কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। তখন কাশীনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ভাই! কাল্‌কের কথাটা কি বিশ্বাস হয় নাই? তুমি নিশ্চিন্ত থাক—বৈশাখ মাসেই বিবাহ হইবে।" রামনিধি কাশীনাথের উদারতার বিষয় ভাবিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"কাশী ভাই! তুমিই প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুত্ব যে কি জিনিস—তাহা তুমিই বুঝিয়াছ। আজ আমাকে তুমি যে কিরূপ আপ্যায়িত করিলে—তাহা বাক্যের দ্বারা বলিয়া বুঝান যায় না—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমাদের বিদ্যালয় শীঘ্রই বন্ধ হইবে—ছুটীর মধ্যে আমি একবার দেশে যাইব, কিন্তু বৈশাখ মাসের মধ্যে শুভ বিবাহ দিতে হইবে। আমি তাহার জন্য প্রস্তুত হইব।" এই বলিয়া রামনিধি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বাটী প্রবেশ করিলেন। স্বামীর ভাব দেখিয়া মোক্ষদা কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, বিবাহে আর কোন সন্দেহ নাই বুঝিয়া বলিলেন,—"দিন কি একেবারে স্থির করিয়া আসিলে?"

রামনিধি। হাঁ এক প্রকার বটে, তবে বৈশাখ মাসেই বিবাহ হইবে, আমি ছুটীর মধ্যে একবার দেশে যাইয়া কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করিয়া আসি। বিয়ে দিতে ত কড়ি চাই।

মোক্ষদা। হাঁ তা ত চাই—তবে কবে যাইবে?

রামনিধি। আগামী শনিবার ছুটী হইবে, আমি হয় রবিবার না হয় সোমবার যাইব।

মোক্ষদা। সেই ভাল, শুভ কায যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।

রামনিধি ছুটী হইবামাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া দেশে আসিয়া কিছু টাকা ঋণ করিয়া লইলেন। ইহার জন্য তাঁহার বিষয় আশয়

সমস্তই বাঁধা পড়িল। বড় লোকের পুত্রের সহিত বিবাহ একেবারে রিক্তহস্তে হইবে না।

কাশীনাথ কিছু চাহিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিতেও রামনিধিকে ঋণদায়ে জড়িত হইতে হইল। সম অবস্থাপন্ন পাত্রের সহিত বিবাহ না দিয়া আশা উচ্চ করিলে পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। তবে বিধাতার নির্ব্বন্ধ অবহেলা করে জগতে এমন সাধ্য কার! তারাদাস ও বিমলার মিলন, যে ললাট-লিখন—অন্যথা হইবার নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।



উদ্যোগ-পর্ব্ব।

যাহা পাইবার আশা অল্প, অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হইলে আনন্দের
সীমা থাকে না। রামনিধির আজ তাহাই হইয়াছে। কাশীনাথের
পুত্রের সহিত নিজ কন্যা বিমলার পরিণয় এক প্রকার অসম্ভব, তিনি
অতুল ধনের অধীশ্বর, ধনে মানে অদ্বিতীয়, আ...ত পড়িলে শিক্ষা...ন
ধার্ম্মিক হইলেও সাতিশয় দরিদ্র, আজ কাল সমা...ই অসহ্য অত্যাচার সহ্য
কোথায়, আর এই সম্ভ্রমহীন ব্যক্তির কন্যার স...নের বন্ধু দীনবন্ধুর নিকট,
বিবাহ নিতান্তই অসম্ভব লিখন বলিতে হইবে। বুক ভাসাইতে ভাসাইতে
না হইলে এরূপ অঘটন সংঘটন হইতে পারে;

ভবিতব্যের একান্তই অনুগ্রহ, বিমলার ইহা ভাল কায হইল না, সে
সঙ্গে তাঁহাদেরও মুখোজ্জ্বল হইল, এক ঘর সম্পত্তি কি আর ঐ পাষণ্ড
ভাবিয়া, রামনিধি ছুটীর পরদিন স্বদেশাভি রবে? সুদে-আসলে লোকের
বয়স হইয়াছে, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণে সে মিষ্টমুখে আগ্রহের সহিত

এই সময় টাকা ঋণ করিবার সুযোগ ও সুবিধা, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, আর কেহ তাঁহাকে ঋণদানে সম্মত হইবে না; এখন মোটা মাহিনার খাতির যাহা হউক আছে, এর পর তাহা থাকিবে না, কাযেই পল্লীগ্রামের বিষয়-সম্পত্তির বিনিময়ে এত টাকা সহজে কেহ দিতে স্বীকৃত হইবে না।

রামনিধি ভগবানকে স্মরণ করিয়া দেশে আসিলেন। সরকারী চাকুরে রামনিধির খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশে বড় কম ছিল না। কাযেই ঋণ পাইবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইল না। গ্রামের মুসলমান জমীদার রমজান সেখ রামনিধিকে পিতার বন্ধু জানিয়া এক সহস্র মুদ্রা ঋণদান করিলেন। রামনিধির বাস্তু এবং মাতুলের প্রদত্ত সম্পত্তি একত্র সমস্তই বাঁধা পড়িল। যুবক রমজানের প্রাণে যাহাই থাকুক, মুখে বলিলেন,—"বাড়ুয্যে মহাশয়! আপনার সম্পত্তি বন্ধক রাখিলাম বটে কিন্তু তাহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। টাকা পরিশোধের সময় আমি বিশেষ বিবেচনা করিব—আপনি আমার পিতার বন্ধু—সেই জন্য আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। এক্ষণে খোদার ইচ্ছায় আপনার কন্যার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হউক।"

রামনিধি। হাঁ এ জানাইলেন।
হইবে, আমি ছুটীর মধ্যে রে কৃতসঙ্কল্প, টাকা তাঁহাকে লইতেই হইবে,
করিয়া আসি। বিয়ে দি কর বিচার না করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার
মোক্ষদা। হাঁ তা ত গুরুগৃহে রওনা হইলেন। বিবাহে ত তাঁহার
রামনিধি। আগামী শ; গুরু যে এ বংশের সর্ব্বেসর্ব্বা, গুরু না
সোমবার যাইব। শুভকার্য্যই করেন না। পূর্ণানন্দ না হইলে
মোক্ষদা। সেই ভাল, শুহইবে? নবম বর্ষে রোহিণী দানে বিমলাকে
রামনিধি ছুটী হইবামাত্র আভিপ্রেত; কোষ্ঠীর ফলাফল গণনা করিয়া
কিছু টাকা ঋণ করিয়া লইবেয়াছেন। শুভ বিবাহের কথা, বিমলার

সৌভাগ্যের কথা জানাইয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবেন; এই অভিপ্রায়ে কাটোয়ায় গমন করিলেন।

রামনিধির পুত্র কন্যা হইয়া বাঁচে না—এক্ষণে বিমলা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে শুনিয়া পাড়ার সকলে বিশেষ সুখী হইল বটে কিন্তু রমজানের নিকট টাকা লওয়ায় প্রতিবাসী সকলের মনে সন্দেহ হইল। যুবক রমজান লোক ভাল নহে; অল্প বয়সে সে জমিদারী হাতে পাইয়া যেন ধরাকে সরার মত ভাবিতেছে। কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; তাহার উপর চরিত্র-দোষও তাহার অত্যধিক, পাড়ার মেয়ে ছেলের উপর তাহার কুটিল দৃষ্টিরও অভাব নাই, তবে গ্রামখানি হিন্দু-প্রধান বলিয়া সে সহজে কিছু করিতে পারে না। সময়ে সময়ে দুইএকবার যাহা করিয়াছে, প্রহারের দ্বারা তাহার প্রতিফলও পাইয়াছে। এই জন্য সে হিন্দু প্রজাবর্গের প্রতি অহরহঃ মন্দ ব্যবহার করে, জমীর খাজনা প্রদান করিতে কিছু বিলম্ব হইলে, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটী করে না। তাহার যে সকল হিন্দু-নায়ের গোমস্তা আছে; তাহারাও প্রভুর অনুরূপ পাষাণ-হৃদয়; কাহাকেও ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা বাঁধিয়া আনে—সামান্য বিষয় লইয়া মানীর মান হানী করে, তেমন প্রবল বলশালী লোকের হাতে পড়িলে শিক্ষা পায় কিন্তু দরিদ্রগণ ত আর তাহা পারে না, কাযেই অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহারা জানান দেয় তাহাদের ন্যায় দীনের বন্ধু দীনবন্ধুর নিকট, ভগবানের নিকট তাহারা নীরবে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে।

সকলেই একবাক্যে বলিল—রামনিধির ইহা ভাল কায হইল না, সে ত রমজান মিঞাকে জানে না; এ বিষয় সম্পত্তি কি আর ঐ পাষণ্ড যক্ষের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে? সুদে-আসলে লোকের সম্পত্তি নিজের করিয়া লইবার জন্যই যে সে মিষ্টমুখে আগ্রহের সহিত

টাকা ধার দেয়—তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা দিতে না পারিলেই নালিশ করিয়া সম্পত্তি নিলাম করিয়া লয়। রামনিধি বুঝিতে পারিল না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না! হায় হায়! পাষণ্ডের খর্পরে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইল। একটা ভাল ব্রাহ্মণের বাস গ্রাম হইতে উঠিয়া গেল?

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ মহা ক্রিয়াবানের বংশ; অবস্থা মন্দ হইলেও নজর এখন ঠিক সেইরূপই আছে। গ্রামে কন্যার বিবাহ দিলে বহু অর্থ ব্যয় হইবে, পাত্রকে সেই দূরদেশ হইতে আনিতে হইবে, সে ব্যয়ভার বহন করা এবং পাড়ায় কাহাকে রাখিয়া কাহাকে বলিবেন, প্রায় হাজার ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়ের বাস। রামনিধি যে সকলের প্রিয়—সকলের নিকট যে তাহার মানসম্ভ্রম ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। এই প্রথম কাযে তিনি কি কাহাকেও বাদ দিয়া কায করিতে পারেন। বিদেশে কার্য্য সমাধা করিলে আর কেহ বলিবার নাই; বলিলেও ঘটনাচক্রে হইয়া গিয়াছে, বলিয়া কাটাইয়া দিবেন। এই জন্য তিনি পাড়ার কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া চুপে চুপে কার্য্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আর জমী বন্দক দেওয়া ত খুব মান্যের কথা নহে, কাযেই যত লোক জানাজানি না হয় ততই ভাল—এই বিবেচনা করিয়া নূতন জমীদার রমজানের নিকট কথা প্রকাশ করিবামাত্রই কৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। অর্থহীনের কন্যাদায় যে কি বিষম ব্যাপার, তাহা যিনি না ভুগিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারিবেন না। কুমারখালীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী খুব উচ্চাশয় সম্পন্ন ছিলেন। কন্যার বিবাহে রামনিধির মতির স্থিরতা নাই ভাবিয়া সকলে তাহাকে ক্ষমা করত বলিলেন—যাহা করিয়া হউক ব্রাহ্মণ এ দায় হইতে উদ্ধার লাভ করুক, অবস্থা বৈগুণ্য হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। এরপর সকলে মিলিয়া তাহাকে রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করা যাইবে, সত্য কি আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ গ্রামে থাকিতে

একঘর সৎব্রাহ্মণ দেনার দায়ে বাসচ্যুত হইবে, বলিয়া সকলে আপনার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

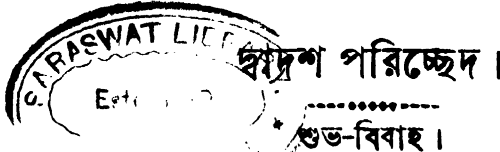
রামনিধির সম্পত্তির প্রতি রমজানের বহুদিন হইতেই লোভ ছিল। তাঁহার বিষয়-আশয় নিস্কর ব্রহ্মোত্তর, রমজানের জমীদারী ভুক্ত নহে; অথচ ইহা তাহার বাটীর নিকটবর্ত্তী, গ্রহণ করিতে পারিলে—তাহার অট্টালিকার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়—সম্মুখে বাগান-বাগিচা করিয়া দিলে জমীদার বাটী খুব শোভা সম্পন্ন হয়—এই জন্য ইহার প্রতি বহুদিন হইতে তাহার লোভ ছিল; এখন ব্রাহ্মণকে টাকা ধার দিয়া তাহার লোভের পথ পরিষ্কার হইল ভাবিয়া আনন্দে একদিন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে খোসখানার বন্দোবস্ত করিল। শত চেষ্টা করিয়া যাহা হয় নাই, আজ বিনায়াসে তাহা হইল—ইহার তুল্য আনন্দ আর কি আছে?

অন্যচিন্তা এখন আর রামনিধির মনে স্থান পাইতেছে না। সুপাত্র তারাদাসের সহিত তিনি যে প্রাণের কন্যা বিমলার বিবাহ দিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে: ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, তাহার চিন্তা এ সুখস্রোতে বাধা দিতে পারিতেছে না।

পূর্ণানন্দ আজ কয়েকদিবস হইল পশুপতিনাথে কোন মহাপুরুষের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। শীঘ্র বাটী আসিবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া রামনিধি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু কি করিবেন উপায় ত নাই, এ দিকে সময়ও সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কাযেই তদীয় উপযুক্ত পুত্র নির্ম্মলানন্দকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। পুত্রও পিতার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। কায়ার ছায়া, এক আত্মার অর্দ্ধেক অংশ, তবে তাহাতে দোষ কি; পুত্র আর পিতা কি ভিন্ন, এক দেবতাই যে ভিন্নাকারে প্রতিভাত, তিনি সমস্ত কথা গুরুপুত্র ও গুরুমাতাকে নিবেদন করিলেন। মা বলিলেন,—"বাবা! তাহাতে আর দোষ কি, তিনি যখন এখানে নাই,

আর পূর্ব্ব হইতে যখন সংবাদ পান নাই, তখন নির্ম্মলকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।" জননীর অনুমতি অনুসারেই কার্য্য হইল। নির্ম্মলই শিষ্য-কন্যার বিবাহ দিতে রামনিধির সহিত সুদূর যৌনপুরে আগমন করিলেন। মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন,—"বাবা! দেশে আনিয়া বিবাহ দিলেই ভাল হইত, দৈবকার্য্যে বাস্তুভিটার মঙ্গল সাধিত হইত।" রামনিধি বলিলেন,—"মা! সমস্তই জানি কিন্তু পাত্রের পিতা বড়লোক, তিনি এক প্রকার দয়া করিয়াই কন্যাটীকে গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার মতে ত কার্য্য করিতে হইবে? যখন তিনি কিছু লইতেছেন না, তখন এখানে আনিয়া বিবাহ দিতে হইলে আমাকেই সকল ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আপনি আমার অবস্থা ত জানেন? মাতাঠাকুরাণীও সে বিষয় বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"আহা বাবা! তা বেশ হয়েছে, ভগবান এখন এ শুভ সম্মিলনে শুভদৃষ্টি করুন, বিমলা আমার সুখী হউক!"

কাশীনাথও যথাসময়ে দেশের আত্মীয় স্বজন ও পুরোহিত মহাশয়কে উপস্থিত হইবার জন্য বিনয়পত্র প্রদান করিয়া, তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভ-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহ হিন্দুরই চিরপ্রচলিত প্রথা, তাই অষ্টম বর্ষে গৌরী দানের আর নবমে রোহিণী দানের ফল, দশম বর্ষে কন্যাদানের ফল লাভের পর বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। দ্বাদশে রজঃস্বলা অবস্থায় আর বিবাহ দেওয়া চলে না—ইহা হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, করিলে পতিত হইতে হয়—তাই শৈশব-বিবাহে ধর্ম্মরক্ষার নিয়ম।

এখন নূতন সভ্যতার দিনে কেহ এ কথার পক্ষপাতী নহেন—শুনিলে

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পুণ্যলাভের বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চয়ই বোধগম্য হইবে যে দাম্পত্য প্রণয়ের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে হইলে, পতি-পত্নীর ভালবাসা বদ্ধমূল করিয়া চিরজীবন সুখে কাটাইতে হইলে, ইহাই শাশ্বত সনাতন প্রথা। বয়স্থা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয়ে প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ হইয়া একজন আর একজনের জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছুতেই সাহস করিবে না। কিন্তু এই বাল্যবিবাহের প্রণয়-সাগরে আত্মহারা হইয়া স্ত্রী, পতির জ্বলন্ত-চিতায় অনায়াসে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করত সহগামিনী হইয়া স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে;—এ অমানুষিক আত্মত্যাগ কেবল হিন্দু-বিবাহ বন্ধনেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য জাতির মধ্যে এমন আত্ম-ত্যাগ কেহ কি কখন দেখাইতে পারিয়াছে? এই বাল্যে যাহার প্রতি প্রাণের ভালবাসা দৃঢ় হয়; প্রণয়ের ছায়া-শীতল তরুতলে যে প্রাণ একবার বাল্য হইতে সুখসম্ভোগ করিতে পারিয়াছে, এ জীবনে সে কি—সে সুখ, সে স্বাচ্ছন্দ্য, সে মোহমদিরার আস্বাদ ভুলিতে পারে? তাই একের জন্য অন্যের প্রাণ তুচ্ছ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। বাল্যে অতি বড় হিংস্রক জন্তুকেও পোষ মানাইলে সে যখন তাহা ভুলিতে না পারিয়া প্রভুর চিরপদানত থাকে, তখন কমনীয় মনুষ্য-জীবন কি তাহার অন্যথা করিতে পারে?

তারাদাস ও বিমলা অতি বাল্যকাল হইতেই একত্রে লালিত পালিত হইয়াছে। তারাদাস কতদিন বিমলার শিক্ষকতা করিয়া তাহাকে কত নূতন নূতন শিক্ষাদানে বিদুষী করিয়াছে; মুখের খাবার আধখানি খাইয়া, আধখানি বিমলার জন্য রাখিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, এক-জন শারীরিক অসুস্থ হইলে আর একজন যখন আহারে বিহারে সুখা-নুভব করিতে পারিত না, আরোগ্য না হওয়া অবধি সর্ব্বদা মনমরা হইয়া থাকিত, তাহারা একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, প্রাণে প্রাণে

প্রাণ বিনিময় করিলে যে সে মিলন রাজযোটক হইবে, স্বর্গীয় প্রণয়ের রসাস্বাদনে আজীবন হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে—তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দুর বিবাহ—বালক বালিকার বিবাহ, ভালবাসার সুদৃঢ়-শৃঙ্খলে সুকোমল ফুলহারের বন্ধন এত দৃঢ় যে লোহার শিকলও ইহার নিকট হার মানিয়া যায়—প্রাণদানে ইহার পণ, কখন ছিঁড়িতে দেয় না। রূপজ মোহের বশে, অস্থিমাংসের লালসাবৃত্তি নিবৃত্তির উপরও ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে, যে একটু টান পড়িলে, মোহ আবরণ একটু ঘুচিলেই, ইহা ছিঁড়িয়া যাইবে? ইহাত লোক দেখান—সাক্ষী করা ভালবাসা নয়। ইহা যে দেবতার পদে ধর্ম্মের উপর প্রাণ বিনিময় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ছিঁড়িবার ভয় ইহাতে নাই—করাল কৃতান্ত একজনকে টানিয়া লইলেও এ বাঁধন ছিঁড়িয়া দিতে পারে না। ইহা এমনি কঠিন—এমনি প্রাণপ্রিয়, এমনি ধর্ম্মময়।

তারাদাস ও বিমলা বালক, বিমলার বয়স আট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে আর তারাদাস মাত্র দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া এই ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে। বিবাহের মর্য্যাদা, প্রণয়ের মধুরতা ইহারা কিছুই বুঝে না। বাটীশুদ্ধ লোক আমোদ করিতেছে, কত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তারার মা, দিদিমা, তাহার বড়দিদি তাহাকে হলুদ মাখাইয়া হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করিতেছে, নিজেরাও পরস্পরে হরিদ্রা মাখামাখি করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয়ের বাটী হইতে তারাকে দেখিবার জন্য কত লোক আসিতেছে। তাহার পিতা-মাতা বিমলাকে পরাইবার জন্য কত ভাল ভাল অলঙ্কার গড়াইতেছেন, কত বহুমূল্য বসন আনিয়া, ভারে ভারে মিষ্টান্ন লইয়া বিমলার বাটীতে লোক পাঠাইতেছেন; বিমলা ভাল খাইবে, ভাল পরিবে শুনিয়া বালক তারাদাসের আর আনন্দ ধরে না।

বিমলার বাটীতে জননী, পিসীমা তাহাকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেছেন, শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করিতেছেন। কত খাবার, কাপড়, গহনা তারাদাসের বাপ তাহার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন; সকলেই বালক তারাদাসের গুণের কত সুখ্যাতি করিয়া ভগবানের নিকট তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছে। তারাদাসের এবম্বিধ সুখ্যাতি শুনিয়া বিমলার মনপ্রাণ উথলিয়া উঠিতেছে; সে প্রাণের সহিত যাহাকে ভালবাসে তাহার সুখ্যাতি যে তাহার প্রাণে সুধাবর্ষণ করে। বালিকার ক্ষুদ্র-হৃদয় বলিয়া কি, তাহা উৎফুল্ল হইবে না? হিন্দু বিবাহে আনন্দের একটা বিশেষত্ব, ধর্ম্মের একটা অভিনবত্ব আছে, তাই ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও বিমলা যেন একটা অজানা, অচেনা, অভোগ্য, অযোগ্য আনন্দে দিশাহারা হইয়া মাকে বলিতেছে,—"মা! তারাদাস কি কর্ত্তা মশায় আজ আমাদের বাটীতে খেতে আস্‌বেন, এত খাবার-দাবার তৈয়ারী হ'চ্ছে কেন মা?"

বিমলার মা সময়ে সময়ে তারাদাস এবং তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ খাওয়াইতেন, এইজন্য তাহার ধারণা আজ তাঁহাদেরই জন্য ভাল করিয়া জিনিসপত্র তৈয়ারি করা হইতেছে, এত বেশী হ'চ্ছে বোধ হয়, বাবার আরও দুই চারিজন বন্ধুও তাঁদের সঙ্গে ভোজন করিবেন। মোক্ষদা কন্যার আনন্দ দেখিয়া প্রাণের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন—"মা! আর তুমি তারাদাসকে নাম ধরিয়া ডাকিও না—তাঁহাকে তিনি-উনি বলিয়া ডাকিবে, না হ'লে পাপ হবে।" কন্যা জননীর কথার প্রতিবাদ করিল না, বুঝিল—আমি ছোট, তিনি বড়, তাই বুঝি নাম ধরিয়া ডাকিতে নাই, কই বাবাকেত মা নাম ধরিয়া ডাকেন না।

আজ বিবাহের দিন, দুইটী অপক্ক আধফোটা ফুলে আজ বিধাতা মালা গাঁথিয়া দিবেন; ভবিতব্যের অমোঘ বিধানে আজ দুইটী সরল

সোহাগ-ভরা প্রাণ এক হইয়া অস্তিত্ব হারাইবে বলিয়াই আজ রামনিধির কুলপুরোহিত,—তাঁহার অভীষ্টদেবের সুযোগ্য পুত্র—নির্ম্মলানন্দ শান্তি-স্বস্ত্যয়নে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

রামনিধির অনুচরগণ বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতেছে, বরের আসর নির্ম্মাণ করিবার জন্য ধ্বজা, পতাকা, পুষ্পমাল্যে তোরণ-দ্বার সুসজ্জিত করিতেছে। যৌনপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দুস্থানী, তাহাদের বিবাহ-প্রথা ঠিক বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথার মত না হইলেও "পণ্ডিতজীকা লেড়কীকো সাথ ডাগ্‌দার সাহাব্‌কা লেড়কাকো সাদী হোগা" ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে; তাই তাহারা প্রাণপণে তাহার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। রামনিধি যখন যাহা হুকুম করিতেছেন, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইতেছে না।

সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল; গোধূলি-লগ্নেই বিবাহ, বর আসিয়া সভাস্থ হইল, বরানুচরগণ সকলে যে যার স্থানে আসন গ্রহণ করিল। রামনিধি চিরদিনই নম্র প্রকৃতি, তাহার উপর আজ তাঁহার প্রকৃতি একেবারে নমিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই—আজ তাহাই হইল। তাঁহার চিরদরিদ্রা-কন্যা আজ একজন বিখ্যাত ধনীর পুত্রবধূ হইতে চলিল—দেখিয়া বিধাতার প্রতি সভক্তি-চিত্ত অর্পণ করিয়া একেবারে নম্রতার আধার হইয়া পড়িয়াছেন। হাত দুইটী আর আলাহিদা হইতেছে না, সদাই একত্র,—আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট যোড়হস্ত।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। চিরকাল যাহারা একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন করিতে আনন্দানুভব করিত, আজ আনন্দময় অভীষ্ট দেব, তাহাদের চিরতরে এক করিয়া দিলেন। বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ শেষ হইলে যুগলমূর্ত্তি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইলেন; এ বাল্য-বিবাহে কোনরূপ বাধা, কোনপ্রকার আবরণ বা ঘোমটা

টানার ব্যবস্থা নাই। উভয়েই উভয়ের চন্দন-চর্চ্চিত বদনের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল, রত্নালঙ্কার পরিয়া কত আমোদ করিল। নির্ম্মলানন্দ এই অপরূপ মিলন-প্রভা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। এই বিবাহে দুইটী প্রাণ এক হইলে পর যে দেখিল—সেই বলিল—যদিও এ পুতুলের বিবাহ হইল বটে—কিন্তু এমন মিলন-সৌন্দর্য্য আমরা আর কোন বিবাহে দেখি নাই, স্বর্ণ-প্রতিমায় যেন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। নির্ম্মলানন্দ বাল্যের এ শুভ-মিলনে আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু জ্যোতিষ গণনা করিয়া জীবন-মধ্যাহ্নে ইহাদের মনোকষ্টের কারণ বুঝিয়া সামান্য দুঃখিত হইলেন—হরিষে বিষাদ হইবার ভয়ে কিন্তু কাহারও নিকট, তাহা প্রকাশ করিলেন না।

পরদিবস বর বধূ লইয়া কাশীনাথ নিজালয়ে আগমন করিলেন। ষোড়শী পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। বড় সাধের তারাদাস আজ পরিণীত হইয়া চাঁদের মত বধূ লইয়া আসিয়াছে—ইহাতে মায়ের প্রাণ উথলিয়া উঠিল বটে কিন্তু সোণার চাঁদ ছেলে বিয়ের সময় কিছু মোটামুটী টাকা আনিতে পারিল না, কিছু বেশী রকমের যৌতুক পাইল না, ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রাণের কষ্ট কিছুতেই তিরোহিত হইল না। সমস্ত অলঙ্কার পত্র, এমন কি বিবাহের কিছু কিছু খরচ দিয়া বিবাহ করিয়া আসিতে হইল, ইহা কি কম ক্ষোভের ও দুঃখের বিষয়, কত গরীবের মূর্খপুত্র বিবাহের সময় বেশ দুই পয়সা লইয়া বিবাহ করিতেছে, আর তাঁহার পুত্র তারাদাসের ভাগ্য এত মন্দ! কর্ত্তার কার্য্যের উপর কোন কথা চলে না তাই, নতুবা তিনি হইলে টাকার হুণ্ডি না লইয়া ছাড়িতেন না, হ'লই বা মেয়ে পরমা সুন্দরী, ছেলেই কি কোন অংশে কম? যাহা হউক, গত বিষয়ের অনুশোচনা করিলে কি হইবে, কর্ত্তা শুনিলে গালাগালি করিবেন, কাযেই তত আনন্দ না হইলেও ষোড়শী স্বামীর জন্য হৃদয়ের

ভার চাপিয়া মুখের হাসি হাসিলেন। কর্ত্তা যখন বলিলেন,—"আমার বামে বিমলা, কেমন শোভা হ'য়েছে দেখ দেখি, যেন শিবের বামে সতী।" ষোড়শী বলিলেন,—"তোমার পছন্দ কি আর মন্দ হ'তে পারে? এ দিকে যাহাই হউক, বালিকা বিমলা বধূ করিবার উপযুক্ত বটে, মা আমার নিখুঁত-সুন্দরী।" কাশীনাথের শাশুড়ী ত বিমলাকে বহুদিন দেখিয়া আসিতেছেন কিন্তু সেদিনকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া রহিলেন; কিছু নগদ টাকা না পাওয়ায় যে দুঃখ হইয়াছিল, বিমলার সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা পরাস্ত হইল। তিনি ষোড়শীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"মা! আর মনে দুঃখ ক'রো না—বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ কর, কোলে লও।" মার কথা শুনিয়া ষোড়শী বিমলাকে কোলে করিলেন, মুখচুম্বন করিয়া যারপর নাই আনন্দানুভব করিলেন।

শ্বশুর গৃহে আসিয়া বিমলার কোন বিষাদভাব উপস্থিত হইল না। কারণ এ ঘর ত তাহার নূতন নহে, সে যে অনেকবার এই ঘরে ষোড়শীর আশ্রয়ে নানা সুখভোগ করিয়াছে; তবে আজ সে দরিদ্রভাবে না আসিয়া রাজরাণীর মত আসিয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা কাশীনাথ ও ষোড়শীর আদর পাইতেছে। তাহার প্রাণের ধন তারাদাসকে রাজার মত সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বিমলার যে কত আনন্দ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাহাকে তিলমাত্র চক্ষের অন্তরাল করিতে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, আজ তাহাকে সুন্দর বরবেশে অনবরত চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া কেবল অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, সে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে আজ এঘর সেঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। লোক-জনের আহারে জননী সমা ষোড়শীর সহিত পরিবেশন করিতে লাগিল। কাশীনাথ বলিলেন,—"বেটী! আর মায়ের কাছে যাইতে পাবে না, এইখানে থাকিতে হবে; আমাকে রান্না করিয়া খাওয়াতে হবে।"

মোক্ষদা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—“ষোড়শীকে আমার মত মা বলিবে, কর্ত্তাকে তোমার ওঁর মত বলিয়া ডাকিবে, আর গিন্নীকে দিদিমা বলিয়া ডাকিবে।” বিমলা তাহাই করিল, সে বলিল,—“বাবা! আমি একটু একটু রান্না করিতে পারি, তুমি কবে খাবে বাবা!” কথা শুনিয়া কাশীনাথ গলিয়া গেলেন; সেই অতুলনীয় সুন্দর মুখে স্নেহ মাখা “বাবা” বুলি শুনিয়া কাশীনাথ বলিলেন—“দূর বেটী! এখন কি তুই তা পারিস্, তুই যে কচি মেয়ে।” ষোড়শী বলিলেন—“মা আমার খুব চতুরা—ও শীঘ্র সমস্ত কায কর্ম্ম ক’র্‌তে পার্‌বে।”

এইরূপ অতুল আনন্দে আট দশ দিন কাটিয়া গেল। বিমলা পুনরায় পিতৃগৃহে আসিল; এখন আর সে বালিকার ন্যায় প্রগল্‌ভা নহে, সে হিন্দু-স্ত্রীর অনেকটা ধরণ-ধারণ অভ্যস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর তত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায় না; ঘরের ভিতর বসিয়া আন্‌মনে কত কি নূতন নূতন খেলা করে, নূতন নূতন কায-কর্ম্ম করা, পান সাজা, বিছানা করা, এখন বিমলার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিপৎপাতে।

তখন বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অল্প বয়সের স্ত্রীকে স্বামীর সহবাসে আনিবার নিয়ম ছিল না। বিবাহ হইলেও যত দিন বরকন্যা উপযুক্ত না হইত, যত দিন লেখাপড়া শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিত—তত দিন স্বামী স্ত্রীর একত্র সম্মিলন হইত না, ইচ্ছা হইলে শ্বশুর-শাশুড়ী জামাতা বা বধূকে গৃহে লইয়া আসিলেও তাহারা স্বতন্ত্র গৃহে জনক জননীর আদরে কালাতিপাত করিত, এই

জন্য বাল্য-বিবাহ তখন এখনকার মত বিষময় ফল প্রসব করিত না; অল্প বয়সে অজস্র পুত্র কন্যার মাতা হইয়া বালিকা বধূ কুড়ি বয়সেই বুড়ী হইয়া যাইত না।

তারাদাস বিমলাদের বাটী এখন আর তত যাতায়াত করে না, বিমলাও এখন আর পিতার সহিত কাশীনাথের বাটী পূর্ব্বের ন্যায় যায় না। ইচ্ছা হইলে রামনিধি জামাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন, সমস্ত দিন আদর যত্ন করিতেন, সন্ধ্যাকালে আবার ঘরের ছেলেকে ঘরে রাখিয়া আসিতেন। ষোড়শীও যখন ইচ্ছা করিতেন, বধূমাতাকে লইয়া আসিতেন, প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া কত যত্ন-সোহাগ করিতেন, ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য পেট পুরিয়া খাওয়াইতেন; তার পর পেটের মেয়ের মত কাছে করিয়া ঘুম পাড়াইতেন; ইহাতে বিমলা বেশ আনন্দে থাকিত; তিন চারিদিন এরূপ করিয়া আবার মায়ের বাছা মায়ের নিকট চলিয়া আসিত।

রামনিধি জামাতাকে লইয়া রাখিতে পারিতেন না কারণ কাশীনাথের মত ত তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা নাই, দুইখানি ঘর; একটীতে নিজে থাকেন, একটী শ্যামার জন্য নির্দ্দিষ্ট, আর একটী রন্ধনশালা, কাযেই বালক-জামাতাকে কাছে রাখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না, তবে দরিদ্রেরও ত আমোদ আহ্লাদ আছে; তাহাদের হৃদয়-সরোবরও ত নানাপ্রকার আনন্দহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়, তাই প্রাণ আনন্দ-আবেগে উদ্বেলিত হইলে, তিনি তারাদাসকে গৃহে আনিতেন, সমস্ত দিবস স্বামী স্ত্রীতে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন, তার পর সন্ধ্যা হইলে আবার বাটী পৌছাইয়া দিতেন।

এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। কাশীনাথ ও রামনিধির মধ্যে বন্ধুত্ব ত ছিলই, এখন আবার আত্মীয়ভাব বাড়াবাড়ি হইয়া সে প্রণয় অতি দৃঢ় হইয়াছে। প্রবাসে থাকিয়া উভয়ে যেন খুব প্রবল বাহুবল

লাভ করিয়াছেন। কোন কার্যকর্ম্মে ডাকিতে হাঁকিতে, কোন বিষয়ের জন্য একটা সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতে এখন আর তাঁহাদের অভাব হয় না; তাই এখন তাঁহারা প্রবাসের কষ্ট ভুলিয়া ঠিক নিজের আবাস গৃহের মত বাস করিতেছেন।

কাশীনাথের এখন সময় ভাল, তাই সকলদিকই বেশ জ্যোতির্ম্ময়, যে দেখে সেই বলে কাশীনাথ এখন সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান। তাঁহার মান-সম্ভ্রমও এইজন্য যৌনপুরময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ডাক্তারীতে হাতযশও ততোধিক। বহুদূর হইতে তাঁহার ডাক আসে; কখন পাল্কী, কখন ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি চিকিৎসা করিতে গমন করেন—প্রচুর টাকাও আনেন। একবার দূরদেশ হইতে একজন ধনবান ব্যক্তি নিজের পুত্রের কলেরা-চিকিৎসা জন্য হাতি লইয়া ডাকিতে আসিলেন। তথায় দুই একদিন থাকিয়া এই রোগ আরোগ্য করিতে হইবে, লোক খুব ধনী, পাওনাও খুব মোটা, কাযেই কাশীনাথ লুব্ধ অন্তঃকরণে, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন; দুই, তিন দিন তথায় আদরের সহিত অবস্থান করিয়া রোগীকে আরোগ্যের পথে আনিলেন বটে, কিন্তু সেই বিষাক্ত মলমূত্রের সংস্পর্শে থাকিয়া বাটী আসিবামাত্রই, নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একদিনের মধ্যেই পীড়া খুব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। সেখানে যেরূপ চিকিৎসা হইতে পারে—যতদূর বড় ডাক্তার পাওয়া সম্ভব—সমস্ত দেখান হইল। কাশীনাথের ন্যায় সুচিকিৎসকের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের অভাব হইল না, কিন্তু রোগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না, সেইদিন রাত্রেই কাশীনাথ সকলকে কাঁদাইয়া অকালে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। হঠাৎ এই বিপদপাতে কাশীনাথের পুত্র-কলত্র, আত্মীয় পরিজনের মাথায় যে কি বজ্রাঘাত হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যৌনপুরের অধিবাসিবৃন্দও এই অমায়িক-প্রকৃতি সুচিকিৎসককে হারাইয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল।

ষোড়শী ত একেবারে অতলজলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। একে দুর্ব্বিসহ স্বামীশোক—তাঁহার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ-বিবশল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, তাহার উপর এই প্রবাসে, আত্মীয় স্বজনহীন স্থানে আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকিবেন! যাহার জন্য সকলের কাছে মান্য এখন ত আর তিনি নাই, উপায় উপার্জ্জন বন্ধ হইল, আর কে তাঁহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিবে? লোকে যাহা গুজব করে—কাশীনাথের এত তত সম্পত্তি আছে, কিন্তু কই তাহার ত কিছুই নাই; ষোড়শীর গহনা বাবদ চারি পাঁচ হাজার, আর বধূর গাত্রেও না হয় দুই হাজার টাকার গহনা, কিন্তু দেশে যে ঋণও অনেক আছে, তাহা অপরে জানুক আর না জানুক, ষোড়শী ত সব জানেন, এখন উপায়! দেশের খরচ আর এখানকার খরচ কেমন করিয়া চলিবে? এখানে বৈবাহিক একমাত্র আত্মীয় আছেন, কিন্তু তিনি নিজেই চালাইতে পারেন না, সময়ে সময়ে তাঁহাকেই সাহায্য করিতে হয়, এ ক্ষেত্রে তাঁহার ভরসা ত নাই বলিলেই হয়—হয় ত তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া তিনি এইবার বধূমাতার গহনাগুলি আত্মসাৎ করিবেন—এখন ত আর বলিবার বা ভয় দেখাইবার কেহ নাই।

এইবার যত দোষ পড়িল—বালিকা বিমলার উপর। অলক্ষণীয়া মেয়েটাই ত যত বিপদের গোড়া, না জানিয়া না বুঝিয়া সদ্ভাবক্রমে এমন একটা গুরুতর কায করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইল, পোড়া-কপালীর আর মুখ দর্শন করিব না, তবে একবার আনিয়া গহনাগুলা কাড়িয়া লইতে হইবে, এক পয়সা পাওয়া গেল না, অথচ এই পোড়া-কপালীকে ঘরে আনিবার জন্য আমার অজস্র টাকা ব্যয় হইল; পোড়ার মুখো মেয়ে পিতলের কাটারী, দেখিতেই চিকণ চাকণ, ভিতর বিষে ভরা, লক্ষণ মোটে ভাল নয়।

বৈবাহিকের মৃত্যুর পর রামনিধি একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন,

বালক জামাতা ত অভিভাবক-হীন হইল। কিন্তু তাঁহার যে বক্ষের একখানা হাড় খসিয়া গিয়াছে; কাশীনাথ যে তাঁহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, বৈবাহিক সম্বন্ধও তাহার এক মাস হইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বন্ধুত্ব যে তাহার বহুদিনের, আজ বার চৌদ্দ বৎসরের প্রাণের মিলন—এক প্রাণ, এক আত্মা, আজ হঠাৎ এ বিচ্ছেদ-বাণ বিদ্ধ হইয়া রামনিধি জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন। একে ত তাঁহার হৃদয় অতি কোমল অপরের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হন, এক্ষণে বিমলিনমুখে তাঁহার প্রাণের পুত্রসম জামাতাকে দেখিলে, সেই অল্প বয়সে পিতৃহীন অনাথ বালকের দুঃখ দেখিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি বৈবাহিক বাটীতে যাইতে ভয় পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ভয় আর ভরসাই বা কি, যাইতে ত হইবে; এরূপ আত্মীয়-স্থলে এই বিপদের সময় দেখা না দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রামনিধি সাহসে ভর করিয়া ঘোর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাটীর দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত। কাশীনাথের শাশুড়ী রামনিধিকে এতদিন পরে দেখিয়া জামাতার নাম ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, রামনিধিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন কালসাপিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম, বাবা যে একমাস হইল না, হতভাগী তোমায় পেটে পুরিয়া ফেলিল।" ষোড়শীও সময় বুঝিয়া সেই ক্রন্দনে যোগদান করিয়া একই সুরে স্বর মিলাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তারাদাস সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার সেই শোক ভারাক্রান্ত বিশুষ্ক বদনের প্রতি চাহিয়া রামনিধি ঠিক বালকের মত জামাতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে বুকের ধনকে বক্ষস্থলে চাপিয়া রাখিয়া শোক সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন—"বাবা! ভয় কি? মা রহিয়াছেন, দিদিমা রহিয়াছেন, দাদা মহাশয়

এখনও জীবিত আছেন, আমিও রহিয়াছি—দরিদ্র হইলেও প্রাণ দিয়া তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব, চিন্তা কি বাপ, এ জগতে চিরকাল কেহ বাঁচে না, বাপ মা চিরদিনের নয়।" তার পর ষোড়শীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ জগতে কাহারও জন্য কাহার মৃত্যু হয় না, সময় হইলে এক তিল থাকিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, ইহাতে কন্যার আমার লক্ষণ অলক্ষণ কি? আমরা ত নানাস্থানে ঠিকুজী কোষ্ঠী দেখাইয়া কায করিয়াছি?" তথাপি তাঁহারা সান্ত্বনা মানিলেন না, বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ইহাতে রামনিধি দুঃখের উপর ঘোরতর যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার সরলা সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যার প্রতি একটা বৃথা দোষ চাপান হইতেছে, দরিদ্রের কন্যা বলিয়া বুঝি তাঁহাদের এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হইল, কারণ ষোড়শীত এ বিবাহে আদৌ স্বীকৃত ছিলেন না, এখন একটা বৃথা কারণ দেখাইয়া তাঁহার কন্যার প্রতি বিরূপ হইতেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া কোন প্রকার মনোমালিন্য হইবার ভয়ে হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া নানা প্রকার উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন; মনে মনে করিলেন—একান্ত বিরূপ হইলে আর উপায় কি, বিমলার অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হইবে, ইহাতেত আর মানুষের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই!

বাটী আসিয়া স্ত্রী ও ভগ্নীকে বৈবাহিক বাটীর দুর্ব্যবহারের কথা সমস্ত প্রকাশ করিলেন, শুনিয়া তাঁহারাও যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"বিনাদোষে যদি অপরাধী হইতে হয়, তাহার আর উপায় কি, ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে, কপাল ছাড়াত পথ নাই?"

এইরূপে দশ দিন কাটিয়া গেল। রামনিধি গালাগালি খাইলেও প্রত্যহ তাঁহাদের তত্ত্বাবধারণ করিতে ছাড়িলেন না; যখন পায়ে ধরিয়া কন্যাদান করিয়াছেন—তখন ত নীচু হইয়া থাকিতেই হইবে, আর হঠাৎ

এরূপ ভয়ানক বিপদপাত হইয়া গেল—ইহাতে তাঁহাদের মন নানা-প্রকার সন্দেহ-দোলায় তুলিতেও পারে—কিছুদিন পরে আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে—আপনার জিনিস কি পর হইবে, ভগবান কি এমনই দুর্ভাগ্য ঘটাইবেন?

শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল, শ্রাদ্ধকার্য্য একরূপ চুপে চুপেই শেষ হইল, কারণ বালক তারাদাসের দ্বারা বেশী আড়ম্বরযুক্ত কার্য্য ত সমাধা হইতে পারে না, আর তত টাকাই বা কোথায়—যাহা আছে ষোড়শী তাহা ছাড়িতে চাহেন না, এখন যতদিন বাঁচিবেন—ইহাতেই ত চালাইতে হইবে—পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে—দেশের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কাযেই শ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চন বই আর কিছুই হইল না, রামনিধিও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন।

বন্ধুর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য শেষ হইলে ষোড়শী যেন একটু ভিন্ন ভাব দেখাইতে লাগিলেন—তাঁহার মনের ইচ্ছা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বৈবাহিকের সহিত আর যেন কোন সম্বন্ধ তিনি রাখিতে চান না, এমন অলক্ষণীয়া বধূকে আর গৃহেও স্থান দিতে চাহেন না, কি জানি আবার কখন কি অলক্ষণ সংঘটন হইবে; তাই সঙ্কল্প করিলেন সত্বরই দেশে যাইয়া আবার পুত্রের বিবাহ দিবেন। লোক পরম্পরায় রামনিধি ও মোক্ষদা ইহা শুনিয়া বেহানের হাতে পায়ে ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু উগ্রচণ্ডা ষোড়শীর মতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন,—"আর উপায় কি, এখন বিমলার ললাট-লিপি যেরূপ চালাইবেন—সেইরূপই হইবে—আমাদের আর হাত কি! তবে যখন গর্ভে ধরিয়াছি, তখন ভাত কাপড় আমাদেরও যেমন চলিবে—উহারও তাহার অভাব হইবে না, তারপর ভগবান আছেন—অবোধ বালিকা ত কিছুই জানে না, তাহার দোষ দেওয়া বৃথা।" ষোড়শীর এখন আর বিদেশে থাকিতে তিলমাত্র ইচ্ছা নাই, পুত্রকে লইয়া দেশে

যাওয়াই স্থির করিয়াছেন।বৈবাহিকের সহিত আর তিনি কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না, বহুদিবস হইল—কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইয়াছে! বালক তারাদাস দেখা হইলে শ্বশুরের সহিত কথা কহেন বটে, যদিও তাঁহার মনোমালিন্য কিছুমাত্র নাই; একে শিক্ষাগুরু তায় শ্বশুর, সুশীল তারাদাস কি তাহাতে অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন? তবে দেবী-স্বরূপা জননীর অমতে ত কোন কায করিতে পারেন না; জননী যে স্বামী-বিয়োগ-কাতরা, এখন যে তারাদাসই তাঁহার সান্ত্বনার স্থল—তিনি কি কখন মাতার প্রাণে সন্তাপ প্রদান করিতে পারেন—তিনিও বুঝিলেন, গভীর শোকে এমন হইয়াছে, কাল হয়ত একদিন এ সমস্ত কালিমা মুছিয়া দিবে।

প্রায় একমাস পরে তারার মাতা, পুত্র ও মাতাসহ হুগলী জেলায় চুঁচুড়ার বাটীতে চলিয়া আসিলেন। বধূমাতার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না। যৌনপুর নিবাসী রামদীন নামে একজন পুরাতন ভৃত্য, তাহার একজন স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ ছিল না, তাহারাও তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চুঁচুড়ায় বাটীতে আগমন করিল। রামদীন তারাদাসকে অতি শৈশব হইতে প্রতিপালন করিয়াছিল—সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া কেবল মাত্র পেট-ভাতার চাকুরী করিতে আসিল। আপন ভুলিয়া পরের ছেলেকে প্রতিপালন করিবার এমন মোহিনী শক্তি, স্বার্থের প্রবল বাঁধনও সেখানে টিকিল না। সকলের সব হইল, কপাল ভাঙ্গিল কিন্তু দুঃখিনী বিমলার। হায়! অভাগিনী অতি সরলা, বিধাতা কেন তাহাকে এ মনস্তাপে ফেলিলেন—তাহা কে বলিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কার্য্যাবসানে।

যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়; তাহাকে অহরহঃ দেখিতে পাইলে প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, না দেখিলে প্রাণ আর সান্ত্বনা মানে না, মন আর সে স্থানে থাকিয়া তিলমাত্র সুখবোধ করিতে পারে না।

রামনিধি বাল্যকাল হইতেই বন্ধুর পুত্র বলিয়া—তারাদাসের শিক্ষকতা করিয়া, তাহার অদ্ভুত ধীশক্তি দেখিয়া অতিরিক্ত ভালবাসিতেন, তাহাকে জামাতা রূপে পাইয়া সেই ভালবাসা দৃঢ় হইয়া অস্থিমজ্জায় মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই প্রাণের ধন তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বদেশে গমন করায়, আর তাঁহার যৌনপুরে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। যদিও তাহার মাতা বিনাদোষে তাঁহাকে সাতিশয় অপমান করিয়াছেন; দুরন্ত কৃতান্ত সাধে বাদ সাধিলেও, সে দোষ তাঁহার সরলা বালিকার প্রতি আরোপ করিয়া পরে যদিও তাঁহারই স্কন্ধে বিসম ভর দিয়া পড়িল, তথাপি প্রত্যহ স্কুলে তারাদাসকে দেখিয়া বৃদ্ধ রামনিধি প্রাণে যারপরনাই সন্তোষলাভ করিতেন। তাহার সেই ঢলঢলে ভালবাসা মাখান রূপবান দেহখানি দেখিয়া সকল কষ্ট, সকল অপমান ভুলিয়া যাইতেন। আজ প্রায় একমাস হইল ভগবান তাঁহাকে সে সুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন; তারার মাতা তাহাকে তাঁহার চক্ষের অন্তরাল করিয়া প্রাণে বিষম দাগা দিয়াছেন—বিনাদোষে বৈরনির্য্যাতনের ইহাই পরাকাষ্ঠা নয় ত কি?

তাঁহার বয়স হইয়াছে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অবসর লইবার জন্য অনেক দিন হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু তিনি বন্ধুর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন সময় বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—তাঁহার এখনও সামর্থ আছে, কিছুদিন সময় বাড়াইয়া দেওয়া হউক। এক্ষণে কাশীনাথের অবর্ত্তমানে এবং তারাদাসের অনুপস্থিতিতে

এ স্থানের প্রতি যে একটা প্রবল বন্ধন ছিল—তাহাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবে আর কাহার জন্য বিদেশে পড়িয়া থাকা, দুইতিন মাস পরে যখন যাইতেই হইবে, তখন এই দারুণ মানসিক কষ্টের সময়ই এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। রামনিধি পেন্‌সনের জন্য আবেদন করিলেন।

বিদ্যালয়ের বালকগণ তাঁহার বড়ই অনুরক্ত ছিল। এমন শিক্ষক তাহারা কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, পুত্রনির্ব্বিশেষে এমন করিয়া শিক্ষা দান আর কোন শিক্ষকে করে না। বালকগণ তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। এতাবৎকাল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কার্য্যে কখন অসন্তুষ্ট হন নাই। পঁচিশ বৎসর যাবত তিনি এই যৌনপুর জেলাতেই এই দায়ীত্বপূর্ণ কায বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজের কাযেও তাঁহার খুব সুখ্যাতি লাভ হইয়াছিল; এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বেতনের অর্দ্ধেক পেন্‌সন্ ও সুন্দর নিদর্শন-পত্র প্রদান করিলেন। জীবনের এতদিন পরে প্রায় সন্ধ্যাকালে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দাসত্ব মুক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে ব্রাহ্মণের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেও যৌনপুর নিবাসী সকলে তাঁহাকে কিছুদিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বালকগণ ও বিদ্যালয়ের অপরাপর শিক্ষকগণ তাঁহাকে প্রকাশ্য-সভায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায়-ভোজ প্রদান করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সুপণ্ডিত, চরিত্রবান, উন্নত-চেতা শিক্ষক বহুভাগ্যে পাওয়া যায়, বোধ হয় এমন উপযুক্ত লোক এ বিদ্যালয়ের ভাগ্যে ঘটিবে না। যৌনপুরবাসী হিন্দুস্থানী মহলেও রামনিধির বিদায়ে একদিন নিরানন্দ ও ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনার জন্য একটী বিপুল সভার অধিবেশন হইল। তাঁহার প্রতি লোকের মতিগতি দেখিয়া রামনিধি তাঁহার কর্ত্তব্য যে

শেষ অবধি অক্ষুণ্ণভাবে সমাধা করিতে পারিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রামনিধির প্রাণ শোক ভরা হইয়া থাকিলেও, বেহানের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে শোকের ঝড় বহিয়া তোলপাড় করিয়া দিলেও এ আনন্দ সম্মিলনে—এ সুখের দিনে তাঁহার ও মোক্ষদার প্রাণে আনন্দ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। দশে যাহাকে ভালবাসে—যাহার খোসনাম ঘোষণা করে, সে নিশ্চয়ই মহৎ লোক। রামনিধির মহত্ত্ব যে খুব ছিল—তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে—কাশীনাথ বহু পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সহিত বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, শেষে তাঁহার কন্যাকে পুত্র-বধূরূপে গ্রহণ করিয়া সে ভালবাসার দৃঢ়ত্ব সাধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শী ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না—তাই নীচতার পরিচয় দিয়া এমন একজন মহৎ চরিত্রের লোককেও অযথা অপমানিত করিতে ক্রটী করেন নাই। তাঁহার ন্যায় মহতের কন্যাকে বধূ করিয়া শেষ তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ করিয়া চলিয়া যাইতেও তাঁহার প্রাণে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। রতন না হইলে কে কবে রতন চিনিতে পারিয়াছে, মহৎ না হইলে কি মহতের আদর কেউ করিতে পারে? ষোড়শী যে অতি হীন-দরিদ্র-ঘরের কন্যা, পূর্ব্ব জন্মের সামান্য সুকৃতি বলে কাশীনাথের ন্যায় দেবতুল্য স্বামী লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যগুণে জীবনের মধ্যাহ্ন-কালেই সে দেবসেবা হইতে সে সৌভাগ্য ভোগে, বঞ্চিতা হইলেন। পূর্ব্ব হইতে মহতের হতাদর করিয়া তাঁহার এই দুর্ভাগ্য সংঘটন হইল বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গালীর আদর সম্মান চিরকালই সকল দেশে সমান—এ জাতিকে অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া সকল দেশের সকল লোকেই সমাদর করিয়া থাকে—বাঙ্গালীর কিছু থাক আর নাই থাক—এইরূপ সম্মান তাহারা চিরদিন পাইয়া আসিতেছে।

যৌনপুরে বাঙ্গালীর বাস নাই বলিলেই হয়—তবে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা তথায় গমন করেন, সে দেশের অধিবাসীবৃন্দ সকলেই তাঁহাদের গুণের জন্য, তাঁহাদের শিক্ষা ও বাকপটুতার জন্য তাঁহাদিগকে মান্য করিয়া থাকেন। কাশীনাথ হাঁসপাতালে ডাক্তার হইয়া আসিয়া এই কয় বৎসর যেরূপ সুখ্যাতি সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন—এতাবৎকাল আর কোন বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা ঘটে নাই। রামনিধি কাশীনাথের বহুপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন কিন্তু তিনি তাদৃশ সামাজিক লোক ছিলেন না বলিয়া, এতদিন তাঁহাকে কেহ চিনিতে বা জানিতে পারে নাই, আর তিনি স্বেচ্ছায় কাহাকেও আপনার কৃতিত্ব, আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন নাই; ঠিক সাধকের মত প্রচ্ছন্নভাবে, ভগবতীর বরপুত্র রামনিধি অতি গোপনে কালাতিপাত করিতেন; সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তিনি একদিনও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কাশীনাথ আসিয়া প্রথমে এই রত্নতুল্য মহাপুরুষের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহাকে একজন সুপণ্ডিত বলিয়া চিনিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিতে লাগিলেন—যতদিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার পসার প্রতিপত্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রামনিধিকেও সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন; যতই লোকে তাঁহার সংসর্গে আসিতে লাগিল, যতই তাঁহার গুণগরিমার বিষয় উপলব্ধি করিতে লাগিল, ততই সকলে তাঁহার বশংবদ, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ধন্য হইতে প্রয়াস পাইল। রামনিধি আত্ম-প্রশংসা শুনিতে পারিতেন না, কেহ তাঁহার কাছে তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে, তিনি তাহার প্রতি বড়ই রাগিয়া যাইতেন—তাহার সহিত সংস্রব রাখিতে আর কদাচ চেষ্টা করিতেন না। এই জন্য তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন প্রশংসা না করিলেও—যখন কোথাও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত, তখন গ্রামবাসী সকলে একবাক্যে বলিত—"পণ্ডিতজী ত শিব হ্যায়, উস্কা

বাত,"ছোড়্ দেও, ও কভি ঝুটাবাত নেহি বোলেঙ্গে।" এই ত তাঁহার অসাক্ষাতে যৌনপুরবাসীর মনের ভাব—এহেন ভালবাসার লোক যদি চিরকালের জন্য দেশ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করে—তাহা হইলে দেশীয় লোকের যে কিরূপ মনোকষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্য রামনিধিকে সহজে না ছাড়িয়া দিয়া যৌনপুরবাসী নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া তাঁহার ন্যায় একজন আদর্শ-ব্রাহ্মণের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবসর গ্রহণের প্রায় মাসাধিক পরে যখন পণ্ডিত রামনিধি সকলের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন জেলার অনেক ভাল ভাল মাতব্বর ব্যক্তি, তাঁহার অনুগমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন এবং অভিবাদন করিয়া বিষন্ন মনে গৃহে ফিরিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।



পুনর্ব্বিবাহ।

বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বিসহ শোকাক্রান্ত হইলে শরীর রক্ষা করা দায়—অনেকেই এ বিষম ধাক্কা সহ্য করিতে পারে না; কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়। যার খুব সৌভাগ্য, সে চিরতরে এ জ্বালার অবসান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তর লাভ করে। কাশীনাথের পিতা ও পিতৃস্বসা উপযুক্ত পুত্রের বিয়োগে বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। দেশে শ্বশুরের আসন্নকাল উপস্থিত শুনিয়া এবং পিসীমাতার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে দেখিয়া, ষোড়শীকে বাধ্য হইয়া দেশে আসিতে হইল। বিদেশ পরিত্যাগের ইহাই হইল প্রধান কারণ, দ্বিতীয় কারণ আর যাহাতে অলক্ষণা

রাক্ষসী বধূর মুখ-দর্শন করিতে না হয়, তাহাদের সহিত কোন সংস্রব না থাকে, থাকিলে পাছে সেই রাক্ষসীর জ্বালায় আর কোন নূতন বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু সময় মন্দ হইলে বিপদ যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা ত বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক বুঝে না। সে বুঝিল অলক্ষণা বধূই বুঝি তাঁহার এই সকল দুর্ঘটনার মূল, অখণ্ডনীয় ললাট-লিখনের বিষয় তিনি একবারও মনোমধ্যে স্থান দিলেন না; স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণের কুটিলতা এতই বিপথগামী।

বিপদের উপর বিপদ, দেশে আসিয়া ষোড়শী আবার শ্বশুর ও পিসী-মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যে ঘোর-দংষ্ট্র-শোককীট বৃদ্ধের হৃদয়-কুসুম আশ্রয় করিয়াছিল, দিনে দিনে তাহা অন্তসার-শূন্য করিয়া একদিন বৃদ্ধকে সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিল, শোকের উপর শোক পাইয়া তদীয় ভগ্নীও ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ সময় বুঝিয়া তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতার হস্তে প্রাণের পৌত্র ও পুত্রবধূর ভারার্পণ করিয়া দিয়া স্বর্গগত হইলেন। আবার শ্রাদ্ধ হইল, আবার ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হইল কিন্তু এবার কাশীনাথের খুল্লতাত সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। ষোড়শীর আর কোন কর্তৃত্ব রহিল না; শ্রাদ্ধে ঘটা মন্দ হইল না, এতটা করিবার ইচ্ছা ষোড়শীর ছিল না, তবে শুনে কে—এত আর রামনিধি নহেন, যে টানিয়া ব্যবস্থা করিবেন?

তারাদাস পিতামহ সারদাচরণের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সারদাচরণ বেশ সরল লোক নহেন—জানিয়াও যে বৃদ্ধ তাঁহার হাতে ইহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ সরল বিশ্বাস। সে বহুদিন হইতে বৃদ্ধকে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল; কাশীনাথ বিদেশে থাকিবার সময় বৃদ্ধের সমস্ত অভাব অভিযোগে সে আপনার মত প্রাণ দিয়া তাহাকে

রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল, এইজন্য তাহার উপর সরল প্রাণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়ায়, বৃদ্ধ তাহাকেই ইহাদের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের লোভে, বিষয় সম্পত্তির প্রলোভন কি সহজে হীনপ্রাণ মানব সম্বরণ করিতে পারে? তাই সারদাচরণ লোভবশে গোপনে গোপনে নানারূপ পাপাচরণ করিতে লাগিল। তারাদাস এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সহজে এ দুরভিসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই—করিবার চেষ্টাও করে নাই, কারণ মানুষ কি কখন তাহাদের ন্যায় আশ্রয়হীন বিপদাক্রান্ত জীব দুইটীকে কোন নূতন বিপদে ফেলিতে পারে? তারাদাস জগতের গতিবিধি বুঝে না, অনভিজ্ঞ যুবক জানে না যে নরাকারে অনেক পশু-প্রকৃতির লোকও এ সংসারে বাগুরা বিস্তৃত করিয়া ধর্ম্মভীরু নিরীহ জীবের প্রাণ বধ করিতেছে।

সে যৌনপুর বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। পিতার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে এমন ধী-শক্তি সম্পন্ন পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া এফ্, এ পড়াইবেন কিন্তু তাহা হইল না, মনের আশা মনে রাখিয়াই তিনি স্বর্গগত হইলেন। যুবক মনে করিয়াছিল—দেশে গিয়া পিতামহের কর্ত্তৃত্বাধীন লেখাপড়া শিখিবে, সে আশায়ও ছাই পড়িল, কিন্তু এ জগতে মাতা যাহার বর্ত্তমান তাহার অভাব কিসের? বিশেষতঃ ষোড়শীর হাতে স্ত্রীধন যৎসামান্য ছিল, তিনি পুত্রকে নিরাশ করিলেন না, কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তারাদাস মনের উল্লাসে বিদ্যার্জ্জনে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে লাগিল।

বাটীতে লোকজনের বড়ই অভাব, এমন অবস্থায় একটী ছোট বধূ এই বার তাহার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই ইচ্ছা যেন ষোড়শীর প্রাণে সদা-সর্ব্বদা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু বিমলাকে—সে রাক্ষসী অলক্ষ্মীয়া বধূকে—গৃহে আনিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইল না—কি জানি পাছে আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তিনি কালের কোলশায়ী হইলে তত ভাবনা

নাই বরং সৌভাগ্যই বিবেচনা করেন কিন্তু কি জানি যদি তাঁহার প্রাণের ধনের কোন ভালমন্দ হয়—তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই হইবে? ষোড়শীর প্রাণে যে সন্দেহ দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহা আর কোনক্রমেই তিরোহিত হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সরলা কন্যার ইহপরকাল নষ্ট করিবার জন্য, তাহা সমভাবেই বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল। তিনি ভিতরে ভিতরে পুত্রের পুনর্ব্বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে কুলীন, তায় শীলসম্পন্ন, তাহার উপর অপূর্ব্ব মেধাবলে যুবক এবার সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছে—এ পাত্রের বিবাহের ভাবনা কি, একবার মুখের কথা খুলিলেই ত হয়। তারাদাস কিন্তু বিবাহে স্বীকৃত নহে, সে জানে বিমলার অপরাধ কি? সে সরলা বালিকা, তাহার উপর জননীর এত আক্রোশ কেন? মরা বাঁচা ত ভগবানের হাত, ইহার জন্য সে দোষী কিসে? আমি যদি পুনরায় বিবাহ করি এবং সেই সরলা বালিকার প্রাণে আঘাত করিয়া আবার বিবাহ দেওয়াই যদি মায়ের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে একটা ভয়ানক অধর্ম্ম করা হইবে। সেই দেবতুল্য-ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া চক্ষের জল ফেলিলে আমাদের কি ভয়ানক সর্ব্বনাশই হইবে! এ বিবাহ যাহাতে না হয়—তাহার চেষ্টা করা উচিত, বিবেচনা করিয়া তিনি রামদীন কাকা ও পিতামহ-সম সারদাচরণকে আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। মায়ের নিকট একথা ব্যক্ত করিতে তাঁহার লজ্জা হইল, আর পাছে শোক-কীট-জর্জ্জরিত জননী একথা শুনিলে দুঃখ করেন; পুত্র হইয়া জননীর দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিত করা যে নরাধমের কার্য্য। পরের দ্বারা না হয় জননীর পায়ে ধরিয়া এ বিষয় ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন।

কিছুদিন হইল ষোড়শী অভিভাবকস্বরূপ সারদাচরণকে তারাদাসের বিবাহের কথা বলিয়া একটী পাত্রী দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সারদাচরণ অনুসন্ধান করিয়া একজন ধনবান ডেপুটীর কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ডেপুটীর ধনের ইয়ত্তা নাই—তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যা আর একটী পুত্র ব্যতীত আর পুত্রাদি হয় নাই—কন্যাটী দেখিতে সুশ্রী নহে বলিয়া কোথাও বিবাহের পাকাপাকি করিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তান্বিত ছিলেন। এক্ষণে সারদাচরণের মুখে পাত্রের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া লুব্ধান্তঃকরণে বলিলেন,—"মহাশয়! যদি এই বিবাহ যোড়াগাঁথা করিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে আমি পাঁচ ছয় হাজার টাকা খরচ ত করিবই—অধিকন্তু আপনাকেও সন্তুষ্ট করিব।"

টাকার লোভ বড় লোভ, সারদাচরণ ত তাই চান—তাহার উপর শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন ডেপুটীর সহিত সখ্যতা হইলে, তাঁহার দ্বারা অনেক সময় অনেক কায হইবে। শ্যামাচরণ নিশ্চয়ই তারাদাসকে কিছুদিন পরে গৃহ-জামাতা করিয়া বসিবেন, কারণ তাঁহার একটী মাত্র কন্যা, আর অর্থের অভাব নাই। আর এদিকে তিনি দেনার দরুণ যে কাগজ পত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে কিছুদিন পরে কাশীনাথের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিবেন, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি ষোড়শীকে সমস্ত কথা বলিলেন—অনেক টাকা পাওয়া যাইবে—হইলই বা মেয়ে একটু কাল, বড়লোকের একমাত্র কন্যা, একটা ভাল অভিভাবকও ত হইবে—তারার আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি হইবার আর কোন ভাবনা থাকিবে না কিন্তু তারাত বিবাহ করিতে চায় না। রামদীন ও সারদাচরণের মুখে এই কথা শুনিয়া ষোড়শী বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন, একে টাকার লোভ—যাহা তিনি আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন—সেই আশার সফলতা, তাহার উপর ডেপুটী বৈবাহিক—ইহা কি কম সুযোগ! ষোড়শী একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! যদি তুমি এ বিবাহে রাজী না হও, তাহা হইলে আর আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব—আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

তারাদাস দেখিলেন—বিষম বিপদ, একদিকে জননীর মনস্তুষ্টি করিতে না পারিলে অধর্ম্ম সঞ্চয় করা হইবে, তিনি যেরূপ অভিমানিনী—কথা না শুনিলে হয়ত আত্মহত্যাও করিতে পারেন, অন্য দিকে বিবাহ করিলে একটী অস্ফুটন্ত-কোরক সমান, সরলপ্রাণা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করা হয়। "হায়! ভগবান! আমি কোন্ দিকে যাই—আমি যে বিষম বিপদে, দারুণ সমস্যাকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি,—জগদীশ! পথ দেখাইয়া দাও—কোন্ পথে যাইলে ধর্ম্ম ও প্রিয় সাধন করা হয়?" তারাদাস কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—"না সর্ব্বস্ব যাক্, সকল পাপ আমাকে আশ্রয় করুক, কিন্তু জননীর অবাধ্য হইতে পারিব না—মাতৃঘাতী হইয়া চিরকাল নরকার্ণবে ডুবিতে পারিব না। বিমলা! তোমার প্রাণের বাল্যসখা, তোমার হৃদয়াগারের আরাধ্য-দেবতা, আজ পর হইতে চলিল। না না—পর, প্রাণের বিমলা পর হইবে কেন? জননীর স্ত্রীবুদ্ধি নূতন শোকে অধীর হইয়াছে—নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আবার স্থির হইবে। কুলীনের ত দুই তিনবার বিবাহ হয়—আমিও না হয় জননীর প্রীত্যর্থে বিবাহ করিতেছি কিন্তু ধনী ডেপুটী-কন্যার সহিত কি দরিদ্রের মিলন সম্ভব—চির-অহঙ্কারী ধনীর পুত্রী কি আমার ন্যায় দরিদ্রের সহিত মিলিতে পারিবে? কখনই না—ইহার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই—তখন বিমলাই আমার হৃদয়েশ্বরী—তখন বিমলাই আমার আঁধার-ঘরের মাণিক, অন্ধকার-হৃদয়-কুটীরের উজ্জ্বল দীপশিখা হইবে? প্রাণ যদি ঠিক থাকে—মন যদি ভালবাসার বস্তুতে ঠিক দৃঢ়নিবদ্ধ হইতে পারে—তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা—কোথায়? আর যদি নূতনের নূতনত্ব থাকে, তাহা হইলে না হয় দুইজনেরই প্রিয়-সাধন করা যাইবে—বিমলাত আমার প্রথম ও প্রধান স্ত্রী, তার জন্য আর ভাবনা কি? তবে দেবীস্বরূপিণী

মায়ের মনক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। শ্রীভগবান্ যখন এই জননীর মনস্তুষ্টির জন্য কত অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন—তখন আমি কোন্ ছার—ভবিষ্যতে যত দুর্দ্দৈবই সংঘটন হউক না কেন, উপস্থিত আমাকে জননীর সন্তোষ-সাধন করিতেই হইবে।"

আর কোন কথাই কহিলেন না—একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে ডেপুটী-পুত্রী অপরাজিতার সহিত পরিণয়-বন্ধনে-আবদ্ধ হইয়া, তারাদাস মায়ের মলিন-মুখে হাসির রেখা ফুটাইলেন। সকলেরই সকল অভীষ্ট পূরণ হইল—সকলেই লাভের খাতায় জমার অংশ বর্দ্ধিত করিয়া পুলকে হৃদয় পূর্ণ করিতে লাগিল, কিন্তু তারাদাস লাভের খাতার হৃদয় পত্রে অঙ্কপাত করিয়া দেখিলেন—তাঁহার লোকসানই হইয়াছে—লাভ বড় হয় নাই; তবে সে লোকসানেও প্রাণের মাঝে সন্তোষ আনিয়া দিল, তাঁহার জননীর আনন্দাশ্রুজল।

মা, শোকসন্তোষে কাঁদিয়া বলিলেন—"হায়! আজ যদি তিনি থাকিতেন—অপরাজিতার কত আদর হইত। একে ধনীর পুত্রী, তাহার উপর ধনবানের পুত্রবধূ হইয়া তাহার প্রাণের আশা মিটিত—হায়! এখন যে আমরা নিতান্ত দরিদ্র—পরমুখাপেক্ষী।

বিবাহের কয়েকমাস পরে অপরাজিতা শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে আসিল। চাঁদের মত সুন্দর তারাদাসকে তাহার পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অবস্থাকে সে তত ভালরূপে আলিঙ্গন করিতে পারিল না; চিরদিন যে সুরম্য-হর্ম্ম্যে রাজভোগে পালিত—সে এই ভগ্নগৃহে কেমন করিয়া কালযাপন করিবে, পতির চাঁদের মত মুখ দেখিয়া তৃপ্তি হইল বটে। কিন্তু এরূপ ঘৃণা-স্থানে কি তাহার মত ধনীর দুহিতা থাকিতে পারে? এইখানেই একটা ভয়ানক পার্থক্য, তাহাদের মধ্যে দারুণ ব্যবধান আনিয়া মনোমালিন্য ঘটাইতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।



প্রাণ-সংশয়।

দ্বিতীয় বিবাহের কিছুদিন পরে তারাদাস যখন বি, এ ক্লাসের ছাত্র; ষোড়শী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভরসা করিয়া সমভাবে পুত্রের খরচপত্র যোগাইতেছেন। অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই—আশা পুত্রটী মানুষ হইলে, তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিবে—তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে। শ্যামাচরণবাবু মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করা তারাদাসের ন্যায় দরিদ্রের সৌভাগ্য। ভাবিয়াছিলেন সে তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবে, অনবরত যাতায়াত করিয়া কত তোষামোদ করিবে, তখন তিনি তাহাকে গৃহজামাতা রূপে রাখিয়া তাহার একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

বিবাহে তিনি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন বটে কিন্তু অধিকাংশই অলঙ্কারে, নগদ টাকা যাহা দিয়াছিলেন—এই দুই বৎসরে সে সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গহনা ও জননীর গহনাও সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বের দেনা ত সারদাচরণ অনেক দেখাইয়া রাখিয়াছেন—এ ক্ষেত্রে তারাদাসকে শ্বশুরের অনুগত হইয়া নবপরিণীতা ভার্য্যার মনস্তুষ্টি করা ভিন্ন আর উপায় কি? শ্যামাচরণ আশান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন—তারাদাস তাঁহার অন্নদাস হইবে কিন্তু কাশীনাথের পুত্র তারাদাস কি সেই ছেলে, সে বিবাহের সময় হইতে অদ্যাবধি একদিনও শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করে নাই। জননীর অনুরোধে যদিও দুই একবার অপরাজিতাকে আনিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে শ্বশুর মহাশয় যেরূপ প্রস্তাব করেন—যেরূপভাবে পত্নীকে লইয়া থাকিতে বলেন—তাহা তারাদাসের ক্ষমতার অতীত।

কাজেই তারাদাস আর বড় একটা শ্বশুর বাটী যান না—ষোড়শীর যে কষ্ট সেই কষ্ট, ললাটে সুখ না থাকিলে কে কবে সুখভোগ করিতে পারে? সুখের আশায় ধড়ফড় করিয়া পাপের বোঝা ঘাড়ে চাপাইলেই সুখী হইতে পারা যায় না বরং তাহাতে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বিষাদ বহ্নি আরও ধু ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ষোড়শী যে সুখের আশা কল্পনা করিয়া পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহার সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে দেখিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহার প্রথম বধূ বিমলার কথা মনে পড়িতে লাগিল। এটা ধেড়ে মেয়ে একঘটী জল গড়াইয়া দিতে কত কষ্টবোধ করে—বলে, আমরা জীবনে কখন স্বহস্তে জল গড়াইয়া খাই নাই; আর বিমলা ননীর পুতলী, তাহার পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রূপ ইহার সর্ব্বাঙ্গে নাই, সে কাপড়ের ভরে পড়িয়া যাইত, তথাপি আমার মুখে সমস্ত তুলিয়া ধরিত; তাহার তখন তত জ্ঞান হয় নাই,—আট নয় বৎসরের বালিকা, এখন না জানি তাহার কত জ্ঞান হইয়াছে, সে কত সেবা শুশ্রূষা করিতে শিখিয়াছে—হায়! কেন আমি তাহাকে অশ্রদ্ধা করিলাম, কেন আমি তাহার সন্ধান না লইয়া অবহেলায় তাহাদের বিদায় করিলাম! এখন তাহারা কোথায় কি অবস্থায় আছে—তাহাও ত জানিনা, বেহাইয়ের সামান্য বিশ পঁচিশ টাকা পেন্‌সনে—আহা! তাহারা না জানি কত কষ্টই পাইতেছে। ছেলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়া, ষোড়শী মনে মনে এখন এই সকল অনুতাপ অনুশোচনা করেন, কিন্তু তাহাতে ফল কি? প্রাণের কথা প্রাণে উঠে প্রাণেই লয় হয়, প্রকাশ করিয়া পুত্রের নিকট কিছু বলিতেও সাহস করেন না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; নানাপ্রকার কষ্টে পড়িলেও দুঃসময়ের কি যায় আসে, সে ত জগতে কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। মহাকালের দূত সে, অনন্ত প্রবাহে সে হাসি খেলায় একটানা চলিয়াছে—কাহারও প্রতি দৃকপাত করিবার সময় তাহার কোথায়?

জামাতা কোন প্রকারে বশ্যতা স্বীকার করিল না দেখিয়া শ্যামাচরণ বন্ধু সারদাচরণকে ডাকিয়া বলিল,—"ভাই! জামাইটে বড়ই বেয়াড়া, সে ত কিছুতেই কথা শুনিল না, বোধ হয় একবেলা একমুঠা খাইতে পায় এবং মাথা গুঁজিয়া একস্থানে থাকিতে পারে বলিয়া, তাহার এত অহঙ্কার। আমি মনে করিয়াছিলাম—সে বশ্যতা স্বীকার করিলে তোমার দেনা পরিশোধ করিয়া তাহার বাস্তু তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিব কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা করিলে আমার কন্যার অনিষ্ট করা হয়; এখন সে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত বসবাস না করিলেও তাহারই বড় অনুরক্ত, আর শুনিয়াছি সে স্ত্রী বড় সুন্দরী, তাহার ভালবাসা সে কখনই ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে আর আমি বৃথা ঘুষ দিয়া মরি কেন? অপরাজিতার একটা ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিয়া দিই; আমার মেয়ে খুব শিক্ষিতা, জামাতা একান্ত ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবে, তথাপি চরিত্রহীনা হইবে না, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তবে অর্থের অসচ্ছলতা যাহাতে না হয়—তাহা আমায় করিতে হইবে, অতএব তোমার টাকা তুমি তাহাদের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা কর।"

এতদিন সারদাচরণ শ্যামাচরণের জামাতা বলিয়া তারাদাসের নিকট টাকা আদায়ের চিন্তা করেন নাই—তাহাদের দেনার জন্য একদিনের জন্যও কোন চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই—এখন ডেপুটী বাবুর নিকট সরল উত্তর পাইয়া, তিনি তারাদাসকে বলিলেন,—"দেখ বাপু তারাদাস! তোমাদের যে সকল ঋণ আমার হাত দিয়া হইয়াছে, এতদিন মনে করিয়াছিলাম—শ্যামাচরণ বাবু তাহা পরিশোধ করিবেন, কিন্তু তিনি এখন আর তত গ্রাহ্য করেন না, অতএব সুদে আসলে অনেক হইয়া যাইতেছে, এ দেনা আর বেশীদিন থাকিবে না, তুমি তোমার জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা উপায় কর,

এখনও বাস্তু বিক্রয় করিলে দেনা দিয়া কিছু পাইতে পার—এরপর কেবল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

তারাদাস এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র, উপার্জ্জনের ধার তিনি ধারেন না; কাযেই প্রমাদ গণিলেন—জননীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। ষোড়শী চিরকাল বড়ই অভিমানিনী, কাহার নিকট হেঁট হইয়া জলপান করেন না, তা তিনি ডেপুটীই হউন, আর মহারাজা জমীদারই হউন। তিনি বলিলেন,—"বাবা! তাহাতে আর ভয় কি, আমার বাপের বাটীতেও আমার জন্য একখানি ঘর আর কিছু ধানজমি আছে—চল এসকল বিক্রয় করিয়া আমরা যাহা কিছু পাই, তাহা লইয়া তথায় বাস করিগে কিন্তু যাইবার আগে হতভাগিনীকে যে বড়াও চূড়ী আমি আদর করিয়া পরিতে দিয়াছিলাম, একবার যাইয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ ছেদ পূর্ব্বক তাহা লইয়া আইস, তাহা ত আর তাহার বাবার নয়! আসিবার সময় একবার তাহাকে বলিবে—সে আর আমাদের দেখা পাইবে না, যদি আসিতে চায়, লইয়া আসিবে।"

তারাদাস প্রথমে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, তার পর মনে করিলেন, রামদীন কাকাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইলে, সাধ্য কি তাহারা আমার অনিষ্ট করে! চলিয়া যাইবার সময় আমার জিনিস তাহাদের কাছে রাখিয়া যাইব কেন, তাহারা আমার কে? রামদীন সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল—প্রভু-পত্নীর দুরবস্থা দেখিয়া সে যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিল, এ সময় অমন একখানি দামী গহনা পাইলে তারার লেখাপড়া শিখিবার কোন ব্যাঘাত হয় না—নতুবা এখান হইতেই তাহাকে পাঠ সাঙ্গ করিতে হইবে। বি, এ পাসটা করিলেই তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে, তারাদাস উকীল হইয়া খুব উপায়-উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় শ্যামাচরণ যখন আদালত হইতে বাটী আসিয়াছেন, ঠিক সেই সময় তারাদাস গিয়া প্রণাম করিল। ডেপুটী শ্যামাচরণের

অন্তর বিষের ছুরী হইলেও মুখ অমৃতময়। জামাতাকে অত্যধিক সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"এস বাবা! এস, তুমি ছেলের মত, যখন ইচ্ছা আসিবে—আবদার করিবে; তুমি যে আমার বড় ছেলে। ছি বাবা! রাগ ক'র্ত্তে আছে কি? আমি ত এই বুড়ো হয়েছি; আর কিছুদিন পরে অবসর গ্রহণ করিলেই—তোমাকে একটা ঐরূপ কিছু করিয়া দিতে পারিলে—আমার সমস্ত ভাবনা চুকে যায়। কেন বাবা! তুমি রাগ করিয়া থাক; যাও বাটীর ভিতর যাও; ও অপি! ও অমূল্য! তারাদাস আসিয়াছে, বাটীর ভিতর লইয়া যা।" তারাদাসের কনিষ্ঠ শ্যালক অমূল্যচরণ আসিয়া ভগ্নীপতিকে অন্দরে লইয়া গেল। রামদীন বাহির বাটীতে আশ্রয় পাইল।

ডেপুটীর বাটীতে আজ মহাধুম—নূতন জামাতা আসিয়াছে—কত প্রকার নূতন নূতন খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে; শয্যাগৃহে নানাপ্রকার সাজ সজ্জার আয়োজন হইতেছে। অপরাজিতা নূতন স্বামী সমাগম করিবে বলিয়া সেই নবঘনশ্যাম দেহে দাসীর দ্বারা কত প্রকার নূতন নূতন সাবান ঘষাইয়া লইতেছে; আয়নায় কতবার মুখ দেখিতেছে—মুখের চাকচিক্য বর্দ্ধিত হইল কি না দেখিতেছে। কিন্তু অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে,—কাল কি কখন সুন্দর হয়, কৃষ্ণ কি কখন গৌর হইতে পারে? বৃথা চেষ্টা, খোদার উপর খোদকারী কি মানুষে করিতে পারে? সাবানে কিছু হইল না দেখিয়া নানাপ্রকার পাউডার লাগাইতে লাগিলেন; নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিলেন; মনোহর গন্ধ-দ্রব্যেরও ছড়াছড়ি হইল? বিদুষী ভামিনী মনে করিলেন—সরল-প্রাণ দরিদ্র তারাদাসকে এইরূপে ধনের চটক দেখাইলে বুঝি ভুলাইতে পারিবেন, তাই গুণের প্রতি—স্ত্রীলোকের ঈশ্বর-প্রদত্ত অমূল্য অলঙ্কারের প্রতি—তাঁহার প্রাণ নত না হইয়া কেবল হাব ভাবে মজিয়া অলঙ্কারেই মত্ত হইলেন। স্বামী মাথার মাণিক, হৃদয়ের দেবতা,

প্রথম দর্শনে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব—একথা তাঁহার মনে একবারও উদয় হইল না। দরিদ্র স্বামী, বড় মানুষী দেখিলেই মোহিত হইবে মনে করিয়া, তিনি অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ডেপুটী-পত্নী কমলকুমারী জামাতার রূপে ও গুণে মোহিত, তিনি তাহাকে পুত্রের মত যত্ন করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহার জননী, অপরাজিতার দিদি-মা—বৃদ্ধা মনমোহিনী পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোক, স্বামী বশ না হইলে নানাপ্রকার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্ববশে আনিবার উপায় জানে, কাযেই যখন সে শুনিয়াছে, ইহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী খুব রূপসী, আর তাঁহার দৌহিত্রী কুরূপা, কিছুতেই এ স্ত্রীকে তাহার পছন্দ হইবে না, অতএব ঔষধের দ্বারা বশ করিতে হইবে। পাপিনী মনে মনে এই দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিল না—চুপে চুপে জামাই বশ করিবার দুই তিন প্রকার শিকড় মাকড় সংগ্রহ করিয়া রাখিল—আহারের সঙ্গে তাহাই মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে—এই ইচ্ছা, কিন্তু দুর্বৃত্তা রমণী জানে না যে অবস্থা ভেদে ইহা বিষতুল্য গুণ ধারণ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক নিজের স্বার্থ বজায় করিবার জন্য যে কত সোণারচাঁদ জামাতার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে এখন সভ্যজগতে এ প্রথা আর নাই। এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

কমলকুমারী ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিলেন না। বৃদ্ধা নাতিনী-জামাইকে পরিবেশনের সময় দুগ্ধের সহিত সযত্ন-সঞ্চিত সেই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিল। তারাদাস কিছু বুঝিতে না পারিয়া বা কোন সন্দেহ না করিয়া আহারাদি করিলেন, তার পর সকলের আহারাদি হইল। অপরাজিতা আনন্দে বিহ্বল হইয়া যেন নর্ত্তকীর ন্যায় ঠমকে ঠমকে পা ফেলিয়া অহঙ্কারে হেলিতে দুলিতে স্বামীর সহবাস আশায় গৃহে

প্রবেশ করিলেন। ভাব দেখিয়া নিরীহ তারাদাস মনে মনে ভয়ানক চটিয়া গেলেন। অপরাজিতা বিদুষী, বিমলার মত সে নয় বৎসরের বালিকা নহে—এখন সে পূর্ণযৌবনা, বিদ্বান স্বামীকে সম্ভাষণ করিবার ছলে বলিলেন,—"মহাশয়, রূপবান ও গুণবান আর আমি রূপহীনা ব'লে কি মনে ধরে নাই—তাই আমাকে ছুঁইলে পাছে রূপ ময়লা হইয়া যায় ব'লে এতদিন আস্‌তে ভয় হয়েছিল, আজ ভুলে কি মনে ক'রে পদার্পণ হইয়াছে, এখন আর আমি তত কুরূপা নহি, যৌবনে রূপের বাহার সকলেরই হয়—আমিও কি আর চিরদিন তেমনি থাকিব ?"

কথাগুলির প্রত্যেক অক্ষর যেন গরিমা মাখান, তারাদাস কি উত্তর দিবেন, খুজিয়া পাইলেন না, তিনি অপরাজিতাকে কাল বলিয়া একদিনও নিন্দা করেন নাই—তবে একথা হঠাৎ তাহার মনে উদয় হইল কেন ? তবে কি সে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

যাহার যে বিষয়ে ত্রুটী সে স্বতঃই তাহা প্রকাশ করিয়া লোকের কাছে—ঢাকিতে চেষ্টা করে: অপরাজিতা ইহা মনে করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপনার গুণের পরিচয় প্রদান করিলেন।

নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিলে অহঙ্কার প্রকাশ করা হইবে—এই জন্য তারাদাস বলিলেন,—"দেখ! ভদ্রগৃহস্থের বধূর রূপে যায় আসে কি; তাহার গুণ থাকিলেই যথেষ্ট হইল; রূপ লইয়া ত আমরা ধুইয়া খাইব না। আমাদের ঘরের কায করিতে হইবে—গৃহসংস্কার, শয্যাদি প্রস্তুত —আমাদের নিত্য কর্ম্ম। রূপ লইয়া আমরা কি করিব, আমরা রূপ অপেক্ষা গুণেরই বেশী পক্ষপাতী।"

অপরাজিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখ, ঐত বিষম গোলের কথা, ঘরের কায-কর্ম্ম আমি কেমন ক'রে ক'র্ব্বো, আমি কিছু শিখি নাই, করি নাই—এতদিন ধ'রে কেবল বই প'ড়েছি, আর উল বুনেছি, এই জন্যই ত বাবা তোমাকে এখানে থাক্‌তে বলেন— তাহা হইলে আর

আমাকে ওসব ক'ত্তে হয় না, আর তোমাকেও কষ্ট ক'রে টাকার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি ক'ত্তে হয় না, চাকর বাকরেই সমস্ত করে; আমরা কেবল দুইটী এক ঘরে থেকে, কত প্রাণের কথা, মনের কথা ক'য়ে সুখে কাল কাটাইতে পারি। দেখ না! বাবা কেমন সাহেবী ধরণে থাকেন, ঐ রকম না হইলে কি লোকে বড়লোক ব'লে মানে?"

তারাদাস। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ধরণ-ধারণ চিরকালই পাড়াগাঁয়ের মত, আমরা কলিকাতায় পড়ি বটে কিন্তু চাল-চলন আমরা পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে পারি নাই; বাপ দাদা, যা শিখিয়ে গিয়েছেন—তাহা কি কখন ভুলা যায়—আমাদের ঐরূপ ধারণা মরণকাল অবধি থাক্‌বে—উলটপালট হবে না।

অপরাজিতা। ও রকম কি আর এখন ভাল দেখায়; তোমার মত মাথায় টিকি রাখা, তিন বেলা সন্ধ্যে করা, ও সকল সেকেলে ধরণ, যদি ঐরূপই ক'র্বে তবে, এত ইংরাজী পড়া কেন, প্রতি বৎসর পাশ ক'রে—প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাওয়া কেন?

তারাদাস। দেখ, ভাষা শিক্ষায় দোষ নাই—যে কোন ভাষা শিখ্‌তে পারা যায়; কিন্তু জাতীয়তা নষ্ট করা কি সহজে যায়—না তাহা করা উচিত? দেখ, যাহারা জগতে উন্নত হয়েছে, তাহারাই জাতীয়তার পক্ষপাতী, নতুবা উন্নতি হ'তে পারে না?

অপরাজিতা। হিন্দুর কি আর জাত আছে, না থাক্‌বে, বিজিত জাতির আবার এত জাতের বাঁধাবাঁধি কেন?

তারাদাস। ভগবান কি ক'র্বেন জানি না—এই জাতের বাঁধাবাধি যদি স্থায়ী হয় ত আবার এদেশের উন্নতি হবে,—ইহাই ত বল, ইহাই ত মনুষ্যত্ব।

অপরাজিতা দেখিলেন, স্বামী কিছুতেই নত হইতে চাহেন না—আর তর্কে তাঁহার নিকট পারিয়া উঠাও দায়। বাবা যে বলিতেন—

সে নত হইবার লোক নহে, আজ আমিও তাহা বেশ উপলব্ধি করিলাম। কাযেই একদিনে আর তত বাড়াবাড়ি না করিয়া, তিনি নিরস্ত হইলেন, রাত্রিও হইয়াছে—বৃথা জাগরণ ভাল নহে, বুঝিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

মায়ের কথা তারাদাস ভুলেন নাই—অহরহঃ তাঁহার মনে সে কথা উদয় হইতেছিল, সময় পাইলেই বলিবেন—এইবার পত্নীকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ, মা যে গহনাখানি তোমাকে দিয়াছিলেন—তাহা আমাকে দিতে হইবে—আমাদের অনেক দেনা হইয়াছে—না পরিশোধ করিলে পাওনাদারগণ নালিশ করিবে—এইজন্য তাঁর আদেশে আমি আজ এখানে আসিয়াছি।"

অপরাজিতা কোনরূপ বিচলিতা না হইয়া বলিলেন,—"সে গহনা কি আর আছে? সে সেকালের ধরণের গহনা, সোণাও কম দামের। বাবা তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের খুব মোটা করিয়া গড়াইয়া দিয়াছেন, তোমরা যে আবার চাহিবে—তাহা ত তিনি জানেন না।"

স্বামীর বিপদ শুনিলে স্ত্রীলোক কখন নীরব থাকিতে পারে না, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হয়; অপরাজিতা সহানুভূতি প্রকাশ করা ত পরের কথা, তাহার জন্য মনে সামান্য দুঃখ মাত্রও অনুভব করিলেন না দেখিয়া, তারাদাস আর কিছু বলিলেন না। সমস্ত রাত্রি নীরবে জাগিয়া প্রাতঃকালেই সকলের নিকট বিদায় হইলেন। বাহিরে আসিয়া রামদীনকে বলিলেন,—"কাকা! আমার দেহ যেন কেমন কেমন করিতেছে, মাথা যেন ঘুরিতেছে, শরীর যেন অত্যন্ত ভারবোধ হইতেছে। যদিও রাত্রিতে ঘুম হয় নাই কিন্তু এমন ত হইবার কথা নহে? আমি ত পড়ার জন্য কত রাত্রি এমন করিয়া জাগিয়াছি।"

রামদীন কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল—"বাবা! সে জাগা আর

এ জায়গা অনেক তফাৎ, তুমি ত আর শ্বশুরবাটী বাস করিতে আইস নাই, নিজের কার্য্য উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিলে, সে কায উদ্ধার হয় নাই ত?"

তারাদাস। না কাকা, সে গহনা, আর নাই,—তাহার গঠন ভাল নয় ব'লে আবার নূতন করিয়া গড়াইয়াছে, এই জন্য আমি লইতে পারিলাম না।

রামদীন বলিল,—"এই ভাবনাতেই অসুখ হইয়াছে, ও কিছু নয়! তুমি চল, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হইবে—আর ও ছোটলোকদের বাটীতে যাইয়া কায নাই; বাটিতে গিয় ঘুম হইলে সারিয়া যাইবে।" পূর্ব্বদিনের বিষ-ক্রিয়া যে আরম্ভ হইয়াছে, তারাদাস ও রামদীন তাহা বুঝিতে পারিল না।

তারাদাস বাটীতে গিয়া জননীকে সমস্ত বলিলেন। পুত্রের বিষাদ-ভারাক্রান্ত বদন দেখিয়া জননী সাহস দিয়া বলিলেন,—"বাবা! ভয় কি, নেইবা গহনা পাইলে, চল—আমরা বাটী বিক্রয় করিয়া যাহা পাই—তাহা লইয়া এথান হইতে চলিয়া যাই, তুমিত আমার কুপুত্র নও, কিছু উপায় করিতে পারিলেই সুখে চলিয়া যাইবে।"

পরদিন ষোড়শী সারদাচরণকে সমস্ত কথা বলিলেন, উপায় নাই দেখিয়া সারদাচরণ তাহাদের অনুমতি লইয়া বাটী বিক্রয় করত দেনা পরিশোধ করিলেন। উদ্বৃত্ত পাঁচশত টাকা ষোড়শীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"এক মাসের মধ্যে বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

রামদীন বলিল,—"মা! এইবার উপায় কি হইবে, আমিত দেশে চলিয়া যাইব, তারাদাসকে লইয়া তুমি কোথায় যাইবে?"

ষোড়শী বলিলেন,—"বাবা! ভুরস্থট পরগণার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে আমার পিতার যৎসামান্য সম্পত্তি আছে, তাঁহার কেহ না থাকায় বিষয়-সম্পত্তি আমারই অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এখন তথায়ই যাইব। কিন্তু তারাদাস যে কিরূপ হইয়া গিয়াছে, সে যে মাথার যন্ত্রণায়

৯৭]

অস্থির।” রামদীন বলিল,—“সে শ্বশুর বাটী হইতে আসিবার সময় আমাকে পুনঃপুনঃ ঐ কথা বলিয়াছিল—তুমি একবার কারণ জিজ্ঞাসা কর দেখি।”

জননী জিজ্ঞাসা করিলে, তারাদাস বলিলেন,—“সেখানে দুগ্ধ পান করিবার পর হইতে আমার শরীর এইরূপ হইয়াছে।” ষোড়শীর বুঝিতে বাকী রহিল না, যে তাহারা সর্ব্বনাশ করিয়াছে—জামাতাকে বশীভূত করিবার জন্য ঔষধ করিয়াছে—তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। দুই তিন দিন পরেই তারাদাস বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়া ভুল বকিতে লাগিল; বাটীতে রাখা দায় হইল, ষোড়শী প্রমাদ গণিলেন। হটকারিতার বশবর্ত্তিনী হইয়া দ্বিতীয়বার পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থের লোভে তিনি নিজের পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন, বিনাদোষে একজনের সর্ব্বনাশ করিতে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন—কিন্তু কৃতপাপের ফলভোগ করিতেই হইবে, এখন ত আর উপায় নাই।

ষোড়শী সাধ্যমত পুত্রের চিকিৎসাদি করাইলেন কিন্তু কিছুই হইল না, একদিন একটু অসাবধান হওয়ায় তারাদাস আপন মনে কোথায় চলিয়া গেলেন। কত সন্ধান করা হইল—কোথাও পাওয়া গেল না, হতভাগিনী মাতা পুত্রের বিরহে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। এদিকে একমাস উত্তীর্ণ হইল, বাটীর মালিক তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

রামদীন বলিল,—“মা! তুমি স্বস্থানে চলিয়া যাও, আমি চারিদিক অনুসন্ধান করি। তাহার পুরাতন ও নূতন শ্বশুর বাটীতে সংবাদ দিই, কিছুদিন দেখি, তারপর তোমার ঠিকানায় সংবাদ দিব, এখানে ত আর থাকিবার উপায় নাই।”

ষোড়শী দুর্ব্বিসহ শোকে নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে দেশত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ শ্বশুর আপনার বলিয়া যে সারদা-

্চরণের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; যাহাকে তিনি আপনার আত্মীয় ভ্রাতা জ্ঞানে বিপদাপদে কত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন—ডেপুটী শ্যামাচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই পাষণ্ড উপকারকের বিধবা বধূর সর্ব্বনাশ সাধন করিল। অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। আমরা বলি—এ দোষ আর কাহারও নয়, পরম ধার্ম্মিক রামনিধিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, তাহার সরলা কন্যা বিমলার সর্ব্বনাশ সাধন জন্য এইবার ষোড়শীর প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। উপরে যে ভগবান আছেন—ধার্ম্মিকের উপর অত্যাচার করিয়া কে কবে পরিত্রাণ পাইয়াছে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মান্তিক সংবাদ।

ধার্ম্মিকের আদর সকলেই করিল, যৌনপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধার্ম্মিক রামনিধির সম্মান করিল, আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। সকলে তাঁহাকে চিনিল—চিনিল না কেবল ষোড়শী; তিনি তাঁহাদের সহিত একপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশ গমন করিলেন। রামনিধি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া অবশেষে ষোড়শীর দারুণ বাক্যবাণ-বিদ্ধ হইয়া নিরাশ-হৃদয়ে দেশে ফিরিলেন। আজ দুই বৎসর তিনি কুমারথালীতে সপরিবারে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তারাদাস এক্ষণে সুখ্যাতির সহিত এফ, এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া বি, এ পড়িতেছেন, এ সংবাদ শুনিয়া তিনি প্রাণে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু জামাতার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ত হইবার উপায় নাই; তাঁহাকে আনিবার বা তাঁহার নিকট

যাইবার ত কোন উপায় নাই, রায়বাঘিনী যোড়শী যে তাঁহার পরম শত্রু। রামনিধি কিন্তু প্রতিদিন তাহাদের মঙ্গলোদ্দেশে ভগবচ্চরণে ভক্তিভরে সচন্দন তুলসী দিতে ছাড়েন না। এ কি জলের রেখা যে সামান্য তাপে শুষ্ক হইয়া যাইবে—ইহা যে হৃদয়-ফলকে খোদিত সম্বন্ধ-রেখা; প্রাণান্ত না হইলে কি মুছিয়া যাইতে পারে? পুত্রের মায়া আর জামাতার মায়া রামনিধির নিকট পৃথক নহে। পুত্র অনাথনাথ অপেক্ষাও রামনিধি তারাদাসকে বেশী স্নেহ করেন। সে যে তাঁর প্রাণের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলার স্বামী—হাতে করিয়া মানুষ করা—কত আদরের ধন, তাহা তিনিই জানেন—অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই।

রামনিধি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, কোথাও যাইবার ক্ষমতা নাই—মাসিক পঁচিশটী টাকা পেন্‌সন্ পান, মোক্ষদা তাহাতেই অতি কষ্টে সংসার পরিচালন করেন, আর প্রাণপণে পূজনীয় পতিদেবতার সেবা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে সুখে লালিত পালিত করিয়া হিন্দু-সংসারের অসীম কল্যাণ বিধান করেন। এত টানাটানির সংসারে, শৃঙ্খলা এত অধিক যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, সহজে কেহ তাহাদের দারিদ্র্য অনুভবই করিতে পারিবে না, যেন কত বড় আয়ের সংসার। পুত্র অনাথনাথ গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, পিতার সম্মান হেতু পুত্র বিনা বেতনেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আজীবন শিক্ষকতা করিয়া শরীর ভগ্ন হওয়ায়, রামনিধি আর পুত্রের জন্য তত পরিশ্রম করিতে পারেন না; কাযেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দয়া করিয়া তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দেন, বালক সেইরূপই অভ্যাস করিতেছে।

সংসার যেমন করিয়া হউক চলিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের উপায় ত কিছুই হইতেছে না। মুসলমান জমীদার রমজান সেখ টাকার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছে। কন্যার সুখের জন্য তিনি লুব্ধ হইয়া, এই বিপদ ডাকিয়া আনিলেন বটে

কিন্তু তাহাতে সুখের লেশমাত্র হইল না, কেবল করভারে দিন দিন নিপীড়িত হইতে লাগিলেন।

বিমলা এখন আর বলিকা নহেন, যৌবনের পূর্ণ প্রতাপ এখন তাঁহার দেহ-রাজ্যে বিস্মৃতি-লাভ করিয়াছে। অতুলনীয়া সুন্দরী বিমলার রূপ এখন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে রূপে চাঞ্চল্য নাই, লজ্জা ও ধর্ম্ম বিজড়িত হইয়া তাহা এমন মাধুর্য্যময়, এমনি জ্যোতিঃমণ্ডিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্রই মাতৃভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। হিন্দু ইহাকে মাতৃভাবে পূজা করিলেও ভিন্ন জাতির নয়নে ইহা কুহক লাগাইয়া দিত, তাই পাপিষ্ঠ জমীদার রমজান এক একদিন রামনিধির নিকট টাকা আদায়ের অছিলায় আসিয়া একেবারে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিত, আশা সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য একবার দেখিবে, প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সুধা পান করিবে। ক্রমশঃ তাহার লালসা বাড়িতে লাগিল, এরূপ সুন্দরী ত সে কখনও দেখে নাই!

দুর্বৃত্ত মুসলমানের আচার ব্যবহারে সন্দেহ করিয়া রামনিধি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে লাগিলেন। অধমর্ণ হইয়া উত্তমর্ণকে ত কিছু বলিতে পারেন না, আর উপস্থিত তাঁহার টাকার যোগাড়ও নাই। কাযেই বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাটী বিক্রয় করিয়া রমজানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় করিলেন। টাকা ফেলিয়া দিলে ত পাপিষ্ঠ আর আসিতে পারিবে না, তারপর উদ্বৃত্ত টাকায় তিনি স্থানান্তরে বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিবেন, তথাপি মুসলমানের কৃপাপাত্র হইয়া ভবিষ্যৎ ধর্ম্মহানীর পথ সুগম করিবেন না,—রমজানের ভাবগতিক ভাল নয়, বেটা বিপত্নীক অত্যন্ত পাষণ্ড স্বভাব।

রমজান তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইলেও হিন্দু-প্রধান সমাজে, তাহার আশা পূর্ণ হওয়া সহজ নহে। পাষণ্ডের নজর ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিলেও রামনিধি মানসিক চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি

লাভ করিতে পারেন। মোক্ষদা এই সকল শুনিয়া বলিলেন—"আর দেশের মায়া করিয়া কায নাই; আমরা এখন অর্থ ও সামর্থ্য-হীন, আমাদের বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ, এখনি ইহার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।"

প্রতিবাসী হিন্দুগণ সকলেই রমজানের উপর খড়্গ-হস্ত ছিল, রামনিধির বিষয় যাহাতে তাহার হস্তগত না হইয়া আর একজন প্রতাপ-শালী লোকের হাতে পড়ে—সকলে তাহার চেষ্টা করিয়া নাটুদহের জমীদারদিগকে ইহা বিক্রয় করিয়া দিলেন। রমজানের আশায় ছাই পড়িল, সে কেবল সুদে আসলে আপনার টাকা গ্রহণ করিল।

বাস্তু বিক্রয় করিয়া রামনিধি দেনা পরিশোধের পর কিছু টাকা হাতে পাইলেও এখন কোথায় যাইবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, বেটা যেরূপ দুর্বৃত্ত এবং বিষয় তাহাকে না দিয়া অন্যকে বিক্রয় করায় যেরূপ অপমানিত হইয়াছে, না জানি সে কিরূপ ভীষণ ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া রামনিধি বহির্ব্বাটীর দাওয়ায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রামদীন আসিয়া "পাওলাগি" পণ্ডিতজী মহারাজ, বলিয়া নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিল। রামদীন হিন্দুস্থানী হইলেও বাঙ্গালীর সংসারে বহুদিন দাসত্ব করিয়া, সে বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা কহিতে পারিত।

সহসা রামদীনকে নিকটে দেখিয়া বৃদ্ধ রামনিধি মনে করিলেন—বুঝি তাঁহার বেহান ঠাকুরাণী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার কন্যাকে লইতে পাঠাইয়াছেন। রামদীন যে কাশীনাথের অতিশয় বিশ্বাসী নিমকের চাকর—ষোড়শী ও তারাদাস যৌনপুর পরিত্যাগের সময় যে সে তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন। তাই মনে করিলেন, বুঝি এইবার বেহানের রাগ পড়িয়াছে, তাঁহার কন্যাকে লইয়া

যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সে যে বিষম সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, রামনিধি ত তাহা জানেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন— "রামদীন! বাবুর বাটীর সমস্ত ভাল, তারা আমার ভাল আছে, মাজী ভাল আছেন?"

রামদীন্ পণ্ডিতের অবস্থা দেখিয়া কি বলিবে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না, সে নীরবে দাঁড়াইয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রভুভক্ত ভৃত্যকে তদবস্থ দেখিয়া রামনিধির চিন্তা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন,—"রামদীন! আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, আমার ভিটামাটী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, আজকালের মধ্যে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব, ও বাটীর সংবাদ কি বল।"

যখন আসিয়াছি তখন না বলিলে ত নয়,—ভাবিয়া রামদীন অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! আপনার ভিটামাটী বিক্রয় হইয়াছে, আর তাহাদের যে সব ঠিক আছে—তাহা নহে। দেনার দায়ে বহু পূর্ব্বে তাহাদের সমস্তও সারদাচরণ নামে একজন দুর্ব্বৃত্ত ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, শুধু তাহা নহে, আর বাবা তারাদাসও যে"—বলিয়া আর বলিতে পারিল না, জিহ্বা সে মর্ম্মঘাতীবাণী উচ্চারণে অশক্ত হইয়া পড়িল, রামদীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মার্জ্জনা করিল। রামনিধি তখন কাঁপিতে ছিলেন, জামাতার কি অশুভ সংবাদ শুনিবেন ভাবিয়া একেবারে কাতর-কণ্ঠে বিষম আগ্রহ সহকারে রামদীনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"রামদীন! আর কিছু শুনিতে চাই না—তারাদাস আমার বাঁচিয়া আছে ত?"

রামদীন বলিল,—"হাঁ বাঁচিয়া আছে বটে কিন্তু না থাকার মধ্যে, বোধ হয় বেশীদিন বাঁচিবে না।"

রামনিধি। তবে কি ভারি অসুখ করিয়াছে, খুলিয়া বল্না বাবা! আর কেন দুঃখ দিস্?

রামদীন এই বার সানুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতে লাগিল। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার মাতা দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। নূতন বন্ধুর আত্মীয়েরা, তাঁহাকে স্ববশে রাখিবার জন্য, ঔষধ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে. হিতে বিপরীত হইয়াছে, তারাদাস স্ববশে না আসিয়া পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার শরীরগতিক এত খারাপ হইয়াছে যে, তাহাকে কাছে রাখিয়া সুচিকিৎসা না করাইলে শীঘ্রই জীবন-নাশের সম্ভাবনা।"।

রামনিধি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না,—প্রাণের তারাদাসের অবস্থা শুনিয়া হাউ-হাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্দরে মোক্ষদা গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন হঠাৎ কর্ত্তার রোদনধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রামদীনকে সম্মুখে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন,—"দীন্! কখন এলি বাবা, সংবাদ সব ভাল ত?"

রামদীন বলিবার পূর্ব্বে রামনিধি কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত সর্ব্বনাশের সংবাদ স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিলেন। মোক্ষদাও বক্ষ বিতাড়িত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামদীনকে তাঁহারা চিরকালই পুত্রের মত মানুষ করিয়াছেন, সেও তাঁহাদের পিতামাতার মত মান্য করে। যৌনপুরে সে প্রথমে ইহাঁদের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়াছিল, তারপর কাশীনাথ একটী ভাল চাকর চাহিলে, রামনিধি এই বিশ্বাসী ভৃত্যকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন। এইরূপ শোকের অভিনয় কিছুক্ষণ অভিনীত হইবার পর রামদীন বলিল,—"আমি তাঁহাদের খুব উন্নতির অবস্থা দেখিয়াছি, এক্ষণে দুরবস্থার চরম দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না; গিন্নীমা তাঁহার বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, আমি তারাদাসের অনুসন্ধানের নাম করিয়া দেশে যাইবার পথে, আপনার বাটী একবার দেখা করিয়া গেলাম, যদি কোন সন্ধান করিতে পারেন ত করিবেন। আমিও যতদূর পারি করিব।"

মোক্ষদা। আচ্ছা বাবা! নূতন শ্বশুর বাটীর কাহাকেও সংবাদ দিয়াছ কি?

রামদীন্। হাঁ৷ দিয়াছি কিন্তু তাহারা বড়লোক, জামাইয়ের চিন্তা নাই বলিলেই হয়, দরিদ্র বলিয়া একপ্রকার গ্রাহ্যই করেন না, আর তাহাদের দ্বারাই ত এই ভয়ানক কায হইয়াছে, এখন গোড়া কাটিয়া ডগায় জল ঢালিলে ফল কি?

রামনিধি। বেহান ঠাকুরাণী এখন কোথায়! তাঁহার চলিতেছে কেমন করিয়া?

রামদীন্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি স্বকর্ম্মের প্রতিফল বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাটী গিয়াছেন। ভুরস্থট পরগণার কোথায় ভবানীপুরে তাঁহার বাপের বাটী।

মোক্ষদা। হাঁ৷ বাবা দীন্! (মোক্ষদা তাহাকে স্বামীর নামের আদ্যাক্ষর ছাড়িয়া দীন্ বলিয়া ডাকিতেন,) সেখানে কি কেহ উপায় করিবার লোক আছে, না কোন বিষয় আশয় আছে?

রামদীন। না মা! তাঁহার কেহই নাই—টাকা কড়িও কিছু নাই; কেবল সামান্য একখানি থাকিবার ঘর আছে? আর একটী বিধবা স্ত্রীলোকের জীবিকার ভাবনা কি; তারাদাস যে এখন কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইতেছে—এই টাকাই যে তাঁহার যথেষ্ট?

"বাবারে তুমি যে আমার গুণময় জামাই রে বাবা! আমি সর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রে যে তোমাকে পেয়েছিলাম, তুমি কোথা বাবা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা এখন বালিকা নহে, সেও বুঝিতে পারিল, যৌবনে সে স্বামীর পাদপদ্ম একবারও দেখে নাই—তথাপি বাল্যের সেই প্রাণযোড়া ভালবাসার প্রভাবে সে নীরব শোকাশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া ভাসাইতে পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অপর ত্রর গাড়ীতে রামদীন স্বদেশ গমন করিবে, এই বার

স্বদেশের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই প্রাণ এত উদাস। রামনিধি ও মোক্ষদা অনেক অনুরোধ করিলেও সে আর, তথায় অপেক্ষা করিল না, এ শোক-দৃশ্যে প্রভুভক্ত রামদীনের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছিল। তাই শীঘ্র আবার চরণ দর্শন করিবে বলিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

কেবল বাল্যের ধূলাখেলার ভালবাসা, তার উপর বিবাহের ক্ষীণ স্মৃতি—বিমলা স্বামী বলিয়া এবং তারাদাস স্ত্রী বলিয়া উভয়ে একদিনও ভালবাসার সুখানুভব করেন নাই, তথাপি শুনিবামাত্রই বিমলা বিলাস-বাসনা সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন, ভাল কাপড়, ভাল গহনাদি সমস্ত খুলিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রাণের ধন দারুণ পীড়ায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পাগলের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিতেছেন, আর তিনি ভাল কাপড়, ভাল আহার, ভাল শয্যা ব্যবহার করিবেন! বিমলার ন্যায় সতী কি তাহা করিতে পারেন, তিনি সেই দিন হইতেই মলিন বসন, জীবন ধারণের মত সামান্য আহার ও তৃণ-শয্যা গ্রহণ করিলেন, কেবল স্বামীর মঙ্গলার্থে তাঁহার দাসীভাবে সীমন্তে সিন্দুর ও মণিবন্ধে লৌহধারণ করিয়া সধবার চিহ্ন রক্ষা করিলেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার রূপের মালিন্য না হইয়া বরং বাড়িয়া উঠিল।

যে দেখিল সেই দেবীভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত রমজানের নয়ন—সে অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া—আরও প্রাণের লালসা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যেরূপে হউক, তাঁহাকে হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্থানান্তরে।

এ জগতে রূপের মোহে বিমোহিত নহে কে? সুরূপা সুন্দরী রমণীর রূপজ-মোহে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া আত্মহারা হয় না, ত্রিজগতে এমন মহাপুরুষ কে আছে? দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, তপস্বী কে কবে সহজে মন্মথ-শর-জাল তুচ্ছ করিয়া আপনার চরিত্র অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে? ত্রিজগতে যখন কেহই সহজে এ প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই; তখন সামান্য মানব রমজান, বিলাস-বাসনার চিরকিঙ্কর লম্পট হইয়া ইহার হাত এড়াইতে পারিবে কেন? ঋণ পরিশোধ হইবার পর রামনিধি মনে করিলেন পাষণ্ড রমজানের গতিবিধি রোধ হইল—সে আর তাঁহার অপূর্ব্ব ললামভূতা যুবতী কন্যা বিমলার প্রতি কটাক্ষপাত করিবে না কিন্তু যাহার চিত্ত কামকামনায় অভিভূত, অনঙ্গ প্রভাবে যাহার অঙ্গ সতত জর্জ্জরিত, এ জগতে ঈপ্সিত বস্তু লাভের চেষ্টায় তাহার অকার্য্য-কুকার্য্য কি আছে?

গতিক ভাল নয়, পাষণ্ডের দুরভিসন্ধির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া রামনিধি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মনোহরপুরের একটী ভদ্রপল্লীতে আসিয়া আজ কয়েক মাস হইল সামান্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুমারখালীর পরিজনবর্গ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও কি করিবেন, অভদ্র রমজানের সহিত অভদ্রতা করিয়া লোকসমাজে একটা ভদ্র পরিবারের কুৎসা রটনা করা ত বাস্তবিক সমীচীন নহে? রমজান

অত্যন্ত ধনশালী, পুলিশের লোকজন সমস্তই তাহার হাতের মুঠার মধ্যে, নালিশ মোকর্দ্দমা করিয়া বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না—আর প্রকাশ্যে ত সে কোন অত্যাচার করিতেছে না—এরূপ ক্ষেত্রে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ফল কি? এই জন্য সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সুপরামর্শে তিনি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে শ্যামাকিঙ্কর নামে অভিহিত হইয়াছেন। *এখন হইতে আমরা রামনিধিকে কিছুদিন শ্যামাকিঙ্কর* নামেই অভিহিত করিব।

দরিদ্রের বিপদ পদে পদে, বিশেষতঃ সুন্দরী যুবতী কন্যা লইয়া অতীব কষ্টে পর্ণ-কুটীরে বাস করিলে, অনেক ধনীলোকের নজর সহজে সেই দিকেই আক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহারা জানে স্বর্গের অমৃত বায়সের আশ্রয়ে থাকিবে কেন? ভালমন্দ বিবেচনা করে না, পাপ-পুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় তাহাদের নাই, ভুলেও একবার উপরের দিকে চাহিয়া দেখে না যে, তথায় একজন রাত্রি-দিনের কর্ত্তা, দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা আছেন। ধনগর্ব্বে তাহারা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য, পরকালের চিন্তা কি তাহাদের মনে উদয় হয়?

স্বামী পাগল হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, কোন প্রকারে তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া—বিমলা সেই দিন হইতেই জীবনের সমস্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। একে ত দরিদ্রের কন্যা, ভোগ-বিলাসের দ্রব্য তাদৃশ কিছু ছিল না, অলঙ্কারাদি যাহা ছিল—রাক্ষসী শাশুড়ী পিত্রালয়ে পাঠাইবার সময় সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি দরিদ্র পিতার আলয়ে যতটুকু ছিল, পিতামাতার দ্বারা যতটুকু প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, বিকৃত-মস্তিষ্ক স্বামীর দেশত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণে সতী সেটুকুও পরিত্যাগ করিয়াছেন। যেটুকু না করিলে—না পারিলে, প্রাণধারণ হইবে না—মাত্র সেটুকু করেন, ধূলিশয্যায় তৃণের উপাধান

মস্তকে দিয়া নিদ্রার জন্য [illegible]

বসতি করিয়া, তাঁহার চৈতন্য হরণ [illegible]

চিন্তা পরিপূর্ণ, নিশ্চিন্ত না হইলে মানবের নিদ্রার অধিকারভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? হায়! বাল্যের সেই চিরমধুর প্রণয়, তারাদাসের সেই প্রাণের ভালবাসা, শিবতুল্য রূপবান্ স্বামীর প্রাণারাম মূর্ত্তি কি বিমলা এ জীবনে ভুলিতে পারিবেন? হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে যাহা একেবারে প্রথর-অঙ্কনে অঙ্কিত, তাহা কি বিস্মৃত হওয়া যায়? পিতা-মাতা অনেক বলেন—অনেক সান্ত্বনা করেন—কত উৎসাহ দেন, সত্বরই তারাদাসকে অন্বেষণ করিয়া আনিবার প্রলোভন দেখান কিন্তু বিমলা তাহাতে কর্ণপাত করেন না। স্বামী যার অনাহারে অনিদ্রায় পাগল হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সতী স্ত্রী কি কখন সুরম্য হর্ম্ম্যতলে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারে? বিমলা ঠিক ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করিয়া অতি কষ্টে, না থাকিলে নয়—তাই থাকেন, না খাইলে নয়—তাই আহার করেন, কিন্তু নিদ্রা কি হইতে পারে—ইহা যে সুখপোষিত—সুখ যার আছে, নিদ্রা তার চির সহচরী।

বিমলা একখানি মলিন বসন পরিয়া সমস্ত দিন জননীর সংসার-কার্য্যে সাহায্য করেন; দেবকল্প বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন; আর এক একবার সময় পাইলে অতি নির্জ্জনে হৃদয়-উচ্ছ্বসিত নেত্রনীর ফেলিয়া শ্রীভগবানের পদে আত্ম-নিবেদন করিয়া বলেন,—"অন্তর্যামিন্! কি পাপে অভাগিনীর এ দণ্ড, এ মর্ম্মকষ্ট হইল ঠাকুর! এজন্মে ত আমি এমন কোন গুরুতর অপরাধ করি নাই—যাহাতে এমন মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে, তবে পূর্ব্বজন্মের কথা ত বলিতে পারি না, যাহা হউক জগদীশ! আমি চিরদিন এমনি করিয়া পুড়িয়া মরিতে রাজী আছি, আমার সুখের জন্য আমি একদিনও কিছু প্রার্থনা করিব না, তবে আমার তাঁহাকে সকল রোগ-শোকমুক্ত করিয়া নিব্যাধি, নিরাময় করিয়া দাও; তিনি

সুখসচ্ছন্দে বেশ আনন্দে আছেন, শুনিলে আমার অন্তরাত্মা পরম আনন্দিত হইবে ; আমি অতুল আনন্দভোগ করিব—তাঁহার আনন্দেই আমার আনন্দ, তাঁহার সুখেই আমার সুখ, তিনি যেখানেই থাকুন, আমাকে দেখুন আর নাই দেখুন, ভালবাসুন আর নাই বাসুন, ধনীর কন্যাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া যেমন ইচ্ছা সুখভোগ করুন, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—তিনি ভাল হইয়া গৃহবাসী হইয়াছেন—সুখে আছেন, শুনিলেই আমার পরম সুখ।" বিমলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেবতার স্থানে নির্জ্জনে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পর আবার জননীর নিকট আসিয়া সংসারের কাযকর্ম্ম করিতেন। অধুনা কন্যাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, জননী কত নিষেধ করিতেন।

কিন্তু হিন্দু-গৃহস্থের লক্ষ্মীস্বরূপা কর্ম্মিষ্ঠা-কন্যা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে মনের উদ্বেগ, প্রাণের উৎকণ্ঠা যে, বাড়িয়া উঠিবে—প্রাণ অশান্তি-অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, তাই সংসারের সকল প্রকার কাযই এখন তাঁহার প্রাণের শান্তি-সাধনের এক মাত্র সহায়। পিতামাতা নিষেধ করিলেও, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন না—চিত্তকে সুস্থির রাখিবার জন্য কর্ম্মই যে প্রধান উপায়।

রামনিধি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে বাস করিলেও, পাষণ্ড রমজানের চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না, সে এখানে আসিয়াও তাঁহার ধর্ম্মনিরতা সচ্চরিত্রা সতী কন্যার প্রতি কুনজর দিতে লাগিল। তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য মনোহরপুরে আসিয়াও আড্ডা গাড়িল। শ্যামা-কিঙ্কর দরিদ্র অর্থহীন বলিয়া সে পাকেপ্রকারে বিমলাকে পাইবার আশা করিয়া এই সুদূর স্থানেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু বিমলাকে হস্তগত করিয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিমলা ত কোন প্রলোভনের বশীভূতা নহেন, এ যে মাতৃমূর্ত্তি—সকল প্রলোভনের অতীতা, গুণবতী সতী ; কিন্তু হায়! মন যার কু-লীন,

তাহার পক্ষে সু-ভাব সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। অর্থবলে রমজানের এখানেও আত্মীয় বন্ধুর অভাব হইল না; কুমারখালী অপেক্ষাও অল্প দিনের মধ্যে সে এখানে খুব প্রতিপত্তি-শালী হইল, কতলোক তাহার মতে মত দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় তৎপর হইয়া ফিরিতে লাগিল।

মনোহরপুর ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। শ্যামাকিঙ্করের স্বভাব চরিত্র, অমায়িকতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানবুদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার সহবাসে আনন্দলাভ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে সকলেই তাহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িল। গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই নানাপ্রকারে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল দেখিয়া, রামনিধি রমজানের বিভীষিকা হইতে কতকটা নির্ভয় হইলেন, যখন এতলোক তাঁহার সহায়; গ্রামের এত সজাতি ভ্রাতাগণ যখন তাঁহাকে অভয় দিতেছে; তখন আর ভয়ের কারণ কি?

তাঁহার গুণবতী কন্যার উপর পাপিষ্ঠ রমজানের কু-নজরের বিষয় সকলে শ্রবণ করিল। সে যে তাহার পাপ অভিসন্ধি সাধনের জন্য সুদূর কুমারখালী হইতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া এখানে আসর জমাইয়াছে—তাহাও বুঝিল; কাযেই রমজানের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার পথ তত সহজ রহিল না। কিন্তু দুষ্ট-সরস্বতী যাহার স্কন্ধে একবার আসন পাতিতে পারিয়াছে—তাহার কি আর নিস্তার আছে? সে নাকফোঁড়া বলদের মত দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য ছুটাছুটী করিবেই করিবে। রমজান ক্রমশঃ মন্ত্রণা-জাল বিস্তার করিতে লাগিল।

শ্যামাকিঙ্করের পুত্র কমলকুমার এখন বড় হইয়াছে—কিন্তু অর্থাভাবে তাহার শিক্ষা হইতেছে না। পণ্ডিত নিজেই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নানাবিধ শোক-দুঃখে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে নতুবা এত লোকের মূর্খ-পুত্রকে যিনি মানুষ করিয়া সমাজের শিরোভূষণ করিয়া দিয়া আসি-

লেন, তাঁহারই প্রাণের পুত্র কমলের লেখাপড়া হইতেছে না? কমল-কুমার প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইয়াছে কিন্তু এখনও তাহার পাঠের উন্নতি হইতেছে না অথচ বালক খুব মেধা-সম্পন্ন, যাহা একবার দেখে বা শ্রবণ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ শিক্ষা করিয়া ফেলে, দেখিয়া মনোহরপুরের শান্তিরাম রায় মহাশয় নিজ পুত্রের সহিত তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। শান্তিরাম গ্রামের মধ্যে খুব অবস্থাপন্ন না হইলেও একেবারে দরিদ্র নহেন; বাড়ীভাড়া এবং চাষ আবাদের আয়ে তাহার সংসার একপ্রকার খুব সুখ-স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যায়। মনোহরপুরে আসিয়া এই শান্তিরামের বাটী ভাড়া লওয়ায় রামনিধি তাহার পরম বন্ধুরূপে দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁহার গুণরাশি সকলের নিকট সুপ্রকাশ হওয়ায় সে গ্রামে তাঁহার বন্ধু হইতে আর কেহ বাকী রহিল না। গোলাপ ফুল অরণ্যে ফুটিলেও তাঁহার গন্ধে বিমোহিত কে না হয়? আর বিদ্বান্, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির আদর আমাদের দেশেই সকলে করিয়া থাকে, ইহা যে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের দেশ—এখানে শ্যামাকিঙ্করের ন্যায় ধার্ম্মিক কখন সহায়-সম্পত্তি-বিহীন থাকিতে পারেন না।

এই আদর্শ-ধার্ম্মিক পরিবারটীকে মনোহরপুরের সকলেই সোণার চক্ষে দেখিল, সকলেই তাঁহাদের গুণমুগ্ধ হইয়া সম্মান সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিতে ক্রুটী করিল না। কাযেই রমজান এই বিদেশে আসিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করা যত সহজ মনে করিয়াছিল—কার্য্যক্ষেত্রে তত সুসাধ্য হইল না—সে অবসর মত নূতন নূতন পন্থা দেখিতে লাগিল কিন্তু একটীও কার্য্যকারিরূপে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে ফলদায়ক হইল না। বিপত্নীক রমজান হতাশ হইবার পাত্র নহে, যাহা সে ধরে—তাহার চরম অবধি না দেখিয়া ছাড়ে না, এইত সবে সূত্রপাত। এখনি কি সে এরূপ একটা মহৎ-কাযের আশা ছাড়িয়া দিতে পারে? কোন প্রকারে হিন্দুর সুন্দরী মেয়েকে নিকা করিতে পারিলে, তাহার

মানবৃদ্ধি, সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথোচিত বৃদ্ধি হইবে—যেমন করিয়া হউক—ইহা অবশ্য করণীয়, ইহাতে তাহার জান যাক আর থাক।

যৌবনকালে সুদূর-প্রবাস যৌনপুরে শিক্ষকতা করিবার সময়—কাশীনাথকে প্রাণের বন্ধুরূপে পাইয়া রামনিধি, যেমন পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন; আজ জীবনের কালবেলায় নিজের বাস্তুর মায়া ছাড়িয়া এই মনোহরপুরে আসিয়া শান্তিরামের সহবাসে, তিনি তেমনি আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। মোক্ষদাকে সকলেই দেবী নির্ব্বিশেষে মান্য করিতে লাগিল—তাঁহার কন্যা বিমলাও দুর্গার মেয়ে লক্ষ্মী—অল্পবয়সে এমন ধার্ম্মিক-কন্যা কি কাহারও হয়? তবে মায়ের ভাগ্য বড় মন্দ, এ ধার্ম্মিকার জীবনে যদি কর্ম্মের আধিপত্য থাকিত, যদি স্বহস্তে পতি-সেবা করিয়া রমণী-সমাজে একটা আদর্শ স্থাপন করিতে পারিত—তাহা হইলে কত সুখের হইত! আর পুত্র কমলকুমারের ত তুলনা নাই—পিতার অনুরূপ গুণসম্পন্ন—ছোট ছেলের এত গুণ, কেহ কখন দেখে নাই—তাই পাড়ার সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, আদর করিত, তাহার সহিত একত্রে খেলা করিয়া চরিত্রবান হইবার জন্য আপন আপন বালকদের অনুমতি প্রদান করিত।

শ্যামাকিঙ্কর জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিবার সময় স্বামী-স্ত্রীতে কতই প্রমাদ গণিয়াছিলেন। নদীর শেওলার মত কোথায় ভাসিয়া যাইব, কি হইবে—কেহ আদর করিবে কিনা? এক্ষণে ভগবান তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। নূতন স্থানে আসিয়া সকলেই তাঁহাদের আদর-যত্ন করিতেছে দেখিয়া, তাঁহারা ভগবচ্চরণে প্রণত হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।



পুনর্জ্জীবন।

স্বামী পূর্ণানন্দ, পশুপতিনাথ-তীর্থ হইতে নিজ নিভৃত-নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট অজয়নদের তীরে "শান্তিনিকেতনে" ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুত্র নির্ম্মলানন্দ পিতাকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কমলাপুরের চতুষ্পাঠী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ সংসারী—স্ত্রীপুত্র পরিজনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তিনি গৃহে প্রায়ই অবস্থান করিতেন না। পুত্র উপযুক্ত হওয়া অবধি, তিনি অনবরত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া—সাধু-সন্ন্যাসীর সহবাসেই কালযাপন করেন; আবশ্যক হইলে কখন কখন অজয়ের তীরে তাঁহার আনন্দময় আশ্রম "শান্তি-নিকেতনের" নিভৃতবাসে যোগসাধনা করেন। এবার গুরুদেবের সহ তীর্থভ্রমণে যে সকল নূতন নূতন যোগ-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, এখানে আসিয়া এখন তাহাই নিত্য নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে কোন্ দরিদ্রের আহার জুটিতেছে না, কোন্ রোগী সেবা অভাবে কষ্ট পাইতেছে—এই সকল অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের উপকারের জন্য প্রাণপণ করিতেন। সন্ন্যাসী-জীবন জগতে এইরূপ দায়ীত্ব লইয়া—এইরূপ মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়া কাটাইয়া থাকেন—ইহাই তাঁহাদের পার্থীব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ণানন্দও এইরূপ করিয়া কাল কাটাইতেন—গৃহীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় একাধারে সাধু ও পণ্ডিত, তখন আর কেহ ছিল না।

একদিন যখন দারুণ শীতের পর বসন্তের মলয়-পবন প্রকৃতির অন্তর আনন্দ-মুখর করিয়া, ধরারাণীর প্রাণে অনন্ত আনন্দ-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া আপন মনে অনন্তের পানে উধাও হইয়া চলিতেছিল, জীবমাত্রেই

যখন এই সুখের দিনে প্রাণের আনন্দে মাতিয়া, আনন্দময়ের রাজত্বে আপনহারা হইয়া বিচরণ করিতেছিল, নববসন্তের আগমনে বিশ্ববাসী যখন আনন্দে বিভোর, পূর্ণানন্দ ঠিক সেই বসন্ত-ঋতুতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বিশ্বদেব নারায়ণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন. তাঁহার সেবকগণ সময়ে সময়ে আসিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়া যাইতেছে, এই সুখের দিনে সকলেই সুখ-মগ্ন, নববসন্তের প্রাদুর্ভাবে মুঞ্জরিত বৃক্ষের ন্যায় রোগ-ক্লিষ্ট নরনারী পূর্ণানন্দের সেবায় রোগমুক্ত হইতে লাগিল। দেখিয়া সাধক পূর্ণানন্দ 'শান্তিনিকেতন' ছাড়িয়া আর কোথাও যাইলেন না, এইখানেই আপনার ইষ্টপূজা, যোগযাগ প্রভৃতি সমাধা করিতে লাগিলেন—ইহার প্রভাবে গ্রামখানিরও বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, দিনদেব পাটে বসিবার কিছু পূর্ব্বে, সাধক আপন মনে শাস্ত্র-পাঠ করিতেছেন, বেদের জটিল রহস্য সকল টিকা-টিপ্পনী সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শিষ্যদ্বয়ের মনোভিষ্ট পূর্ণ করিতেছেন। এমন সময়ে বাহিরে কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল, কোমল-প্রাণ পূর্ণানন্দ আর্ত্তস্বর শুনিয়া বাহিরে আগমন করত দেখিলেন, এক দরিদ্র-যুবক ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে ; তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিয়া আশ্রমে আনিবার জন্য গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখিলেন,—যুবক দারুণ-জ্বরে আক্রান্ত—সংজ্ঞামাত্র নাই। যুবক দরিদ্র হইলেও কোন সদ্বংশজাত বলিয়াই বোধ হইল। পূর্ণানন্দ সেবাধর্ম্মকেই জীবনের সার করিয়াছেন—ইহাতে তিনি যেরূপ আনন্দানুভব করেন—ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালন ইহাতে যেমন প্রকটভাবে প্রকটিত, তেমন আর কিছুতেই নাই—পূর্ণানন্দ এইজন্য ইহাতে প্রাণপাত করিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াই, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। আজ হঠাৎ একজন দুঃস্থ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রমের সন্নিকটে পতিত

দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রমে তুলিয়া লইয়া গিয়া প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণকে শিক্ষাদান ঘুচিয়া গেল, তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া রোগীর সেবায় ব্রতী হইলেন। রজনীযোগে রোগীর গাত্রদাহ সাতিশয় বৃদ্ধি হইল, রোগী দুর্ব্বিসহ যাতনা অনুভব করিতে লাগিল।

পূর্ণানন্দ তাহার সেবা করিয়া অমিয়-মধুর-বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোগী বিকৃত-মস্তিষ্ক, রোগ-যন্ত্রণায় কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"পিশাচি! এই কি তোর মানুষ বশীভূত করিবার ঔষধ—মানুষ কি ঔষধে বশীভূত হয়, না প্রাণের ভালবাসায় বশীভূত হয়? অপরাজিতা! রাক্ষসী!" বলিয়া যুবক পুনরায় নীরব হইল। পূর্ণানন্দ বুঝিলেন—বিকারের ঘোরে মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে—তাই এত প্রলাপ বকিতেছে। সাধক পূর্ণানন্দ সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া রোগীকে একটু সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু প্রাতঃকালে রোগী সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করিল, সর্ব্বাঙ্গে বসন্তরোগের চিহ্ন বাহির হইয়া দেহ শ্রীহীন করিয়া ফেলিল।

অপর কেহ হইলে এই ব্যাধী দর্শনে হয়ত তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিত; সংক্রামক রোগ পাছে তাহাকেও আক্রমণ করে ভাবিয়া তাহার ছায়া স্পর্শও করিত না। কিন্তু আত্মজ্ঞানী পূর্ণানন্দ রোগীর সেরূপ অবস্থা দেখিয়া, আরও বিপুল আগ্রহের সহিত সেবা করিতে লাগিলেন —তিল মাত্র অবহেলা করিলেন না। জ্ঞানী পূর্ণানন্দ ত সাধারণ মানবের মত মৃত্যু-ভয়-ভীত নহেন, তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞানী; আত্মার মৃত্যু নাই— তিনি অজর, অমর, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য; সেবা-ধর্ম্মে যদিও দেহ নষ্ট হয়, তথাপি আমি ত যাইব না, আমিত মরিব না, আমার নাশ কোথায়, আমাকে মারিতে পারে—এমন সাধ্য কার, যাঁহার হৃদয়ে এই ভাব বদ্ধমূল, তাহার ভয় কিসের?

সাংঘাতিক বসন্ত-রোগে রোগী দুই পাঁচ দিনের মধ্যে পচিয়া গলিয়া

পড়িল। আর্ত্তনাদে "শান্তিনিকেতন" অশান্তির আগার হইয়া উঠিল, তথাপি স্বামীজীর ভ্রুক্ষেপ নাই, অনন্যমনে একজন অপরিচিত যুবকের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনে যাহা করিতে কুণ্ঠিত হয়, পিতামাতাও যাহা করিতে পারেন না, স্বামীজী আজ সকল কার্য্য ছাড়িয়া—পূজা জপ ভুলিয়া—তাহাই করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী পিতার নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন—ইহাই যথার্থ সাধনা, ভগবানকে পাইবার ইহাই সুপ্রশস্ত মার্গ। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ফলই সেবককে সেই চির-বাঞ্ছিতের পদতলে পৌছাইয়া দেয়—ইহাই তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস—এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণা করিয়াই ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি স্বামীজী আত্মত্যাগে এতদূর অভ্যস্থ হইয়াছেন, নতুবা কে সে আগন্তুক, তাহার সহিত সম্বন্ধ কি?

দশবারদিন অতিবাহিত হইল, দুর্গন্ধ ছাড়িল, তথাপি অচল-অটল, পূর্ণানন্দ সমভাবেই সেবায় ব্রতী, ভাবের ব্যত্যয় কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। আজীবন জনসেবা করিয়া স্বামীজী অনেক ঔষধাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যোগধর্ম্মের নিয়মানুসারে—গাহস্থ্যধর্ম্মের বিধানানুযায়ী সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেও, তিনি ছাড়িলেন না, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই সেই অনাথশরণের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন,—"বিপদ-বিনাশন, দরিদ্রজীবন! ঠাকুর! দরিদ্র যুবকের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, মুকুলিত-জীবন যেন ইহারই মধ্যে ঝরিয়া না পড়ে। অভীষ্টফল-দাতা! তুমি আমার এ পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ, এই যুবকের প্রাণ দান কর। স্বামীজীর প্রাণের আবেদন যেন বিশ্বস্বামীর চরণতলে পৌছিল, আরও দুই দিন পরে বিকারের অবস্থা কাটিয়া গেল, রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে আসিতে লাগিল; ক্ষত ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিল কিন্তু বদনমণ্ডলের বহু বিস্তৃত ক্ষত তাহার বদন বিকৃত করিয়া দিল এবং একটী চক্ষুও নষ্ট করিল, কিন্তু প্রাণহানী করিল না। স্বামীজী ভগবানকে

ধন্যবাদ দিলেন, প্রায় একমাস প্রাণান্তকর সেবার পর যুবক সম্পূর্ণরূপে অব্যাহিত লাভ করিল—রোগ মুক্ত হইল। একটী অঙ্গহানি হইল বটে কিন্তু তাহার আর উপায় কি? মা শীতলা যে এযাত্রা রক্ষা করিয়াছেন—ইহাই মঙ্গল। প্রাণ থাকিলে কালে আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমা এক প্রকার বর্দ্ধিত হইবে, পুরুষের আবার সুন্দর ও কুৎসিত কি? গুণ থাকিলে দৈহিক সৌন্দর্য্যহানীর জন্য কিছু যায় আসে না। গুণমণ্ডিত দেহ যতই কেন সৌন্দর্য্য-বিহীন হউক না; মান তার হইবেই হইবে—জগতে গুণের আদর যে সর্ব্বত্র, অবস্থা মন্দ হইলে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিমলিন থাকে বটে কিন্তু সে কতদিন! একটা সুবাতাস বহিয়া ভস্মাপসারিত হইলেই, তেজ আপনি ফুটিয়া বাহির হইবে।

পূর্ণানন্দ উহার জন্য দুঃখানুভব করিলেন না। যুবক যে তাঁহার সেবায় এই দারুণ ব্যাধি মুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই তিনি ভগবানকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এতদিন শিষ্যগণ কেহই ভয়ে গুরুর আশ্রমে আসে নাই—যুবকের আরোগ্য-সংবাদ শুনিয়া আবার দুই একজন শিষ্য ক্রমশঃ দেখা দিতে লাগিল, প্রসন্নচিত্ত পূর্ণানন্দ তাহাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট হইয়াছিলেন; দেহ-সর্ব্বস্ব সংসারী জীবের এত সাহস কোথায় যে তাহারা এই সংক্রামক ব্যাধির সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া পরাভূত করিবে? গুরুর আদেশে এইবার শিষ্যগণ রোগীর উপযুক্ত আহারাদি যোগাইতে লাগিল। যুবক রোগ-মুক্ত হইল বটে কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতি সারিল না; সময়ে সময়ে বেশ থাকে, কিন্তু মন একটু অস্থির হইলেই যেন চাঞ্চল্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়; পূর্ণানন্দ ইহার প্রতিকার-কল্পে তাহাকে সামান্য সামান্য যোগাভ্যাস করাইতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার প্রভূত উপকার সাধিত হইতে লাগিল, মস্তিষ্ক-বিকৃতি সামান্য দিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়া গেল। পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যুবক সহজ মনুষ্যের মত মনের আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল।

পুনর্জ্জীবন।

যুবক একদিন আহারাদি করিয়া একখানি শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, তাহার সংস্কৃত আবৃত্তি দেখিয়া পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"বাবা! তুমি কি সংস্কৃত-ভাষা কখন অভ্যাস করিয়াছিলে?"

যুবক বলিলেন,—"প্রভু! জীবনে দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার অবসর পাই নাই; তবে বিজাতীয় শিক্ষা বি, এ অবধি পাঠ করিয়া—তাহার দ্বারা যতদূর সম্ভব শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু আশার পরিতৃপ্তি হয় নাই।"

পূর্ণানন্দ যুবককে ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ শিক্ষিত জানিয়া এবং তাহার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। যুবক প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু বলিতে অস্বীকৃত হইতেছিলেন, কিন্তু জীবনদাতা গুরুর আদেশ অমান্য করায় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে ভাবিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতে লাগিলেন। পূর্ণানন্দ তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমার প্রিয়শিষ্য রামনিধির জামাতা! আহা! তাহারা আমার বড়ই প্রিয় ছিল; মা বিমলাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম; এখন তাহারা যে কোথায় আছে—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদের কোন সংবাদ পাই নাই। তুমি তাহাদের অবস্থিতির বিষয় কিছু জান কি? এ যুবক যে কাশীনাথের পুত্র তারাদাস তাহা আর পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। তারাদাস বিকৃতচিত্ত হইয়া চলিয়া যাওয়ার পর কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পূর্ণানন্দের আশ্রমে কি ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণপণ যত্নে কি ভাবে আরোগ্যলাভ করিলেন, আমরা ইতি-পূর্ব্বে তাহা বিবৃত করিয়াছি। তারাদাস গুরুর কথা শুনিয়া সেই যৌন-পুরের ঘটনা হইতে তাহাদের মনোমালিন্যের কারণ অবধি বিবৃত করি-লেন, কেবল জননীর কৌশলে তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা, তাহা-দের দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিলেন না এবং তাহার শ্বশুর রামনিধি যে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন—তাহার সংবাদও দিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার জননীর কথা মনে পড়িয়া—রাজরাণী হইতে ভিখারিণী

অবস্থায় পতিত হওয়ার চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে দারুণ ব্যথিত করিল তিনি কাঁদিয়া বলিলেন,—"প্রভু! শ্বশুরালয়ের কথা ছাড়িয়া দিন, আমার গর্ভধারিণী দেবী-স্বরূপিনী জননী এখন কোথায়—তাহাও জানি না। চুঁচুড়ার বাস্ত বিক্রয় হইবার পর আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়—আমি বাটী ছাড়িয়া চলিয়া আসি—কিন্তু মা আমার কোথায় কি অবস্থায় আছেন—তাহা ত জানি না; প্রভু! ইহার উপায় কি?"

পূর্ণানন্দ যুবককে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"বৎস! চিন্তা করিও না, আমি সেদিন চুঁচুড়ায় কোন শিষ্যবাটী যাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি; তোমার পিতার খুল্লতাত সারদাচরণের সহিত তথাকার ডেপুটী শ্যামাচরণ বাবুর তুমুল বিবাদ হইয়া শ্রাদ্ধ আদালত অবধি গড়াইয়াছে; অজস্র টাকার অপলাপ করাই এই মকর্দ্দমার কারণ; ইহাতে বোধ হয়—তাহার কারাবাস হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্য সে আমার নিকট তাঁহার কোষ্ঠিফল গণনার জন্য আসিয়াছিল, তাহারই মুখে সমস্ত শুনিলাম—সে যে কাশীনাথের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে—অনুতাপছলে তাহাও প্রকাশ করিল। তোমার জননী এখন ভবানীপুরে নিজ-পিত্রালয়ে আছেন; পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থাও শোচনীয়—যাও বৎস! গৃহে গমন করিয়া জননীকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা কর, পুত্রশোক সমাচ্ছন্ন প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ কর! যখন যেখানে থাক, সময়ে সময়ে আমাকে সংবাদ দিও, রামনিধির যদি কোন সন্ধান পাও, সে সংবাদ প্রদান করিতে তিলমাত্র বিলম্ব করিও না। আমি পাইলেও তোমাকে তাহা জ্ঞাপন করিব। পরের মন্দ করিয়া আপনার উন্নতি চেষ্টা করিলে কখন শুভ হয় না। সারদাচরণ এবার খুব শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার আর অব্যাহতি নাই।"

তারাদাস সারদাচরণ সম্বন্ধে কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই উপরে একজন রাত্রিদিনের কর্ত্তা আছেন—ভালমন্দের ফলদাতা তিনি

যে যেমন কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ শাস্তি তিনিই প্রদান করিবেন। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী—কখন এড়ান যায় না; তাহার জন্য চিন্তা করিবার আমি কে? মা আমার পিত্রালয়ে আছেন—আমার জন্য জীবন্মৃত; আর আমার কোথাও অবস্থান করা উচিত নয়। মাতৃভক্ত পুত্র গুরুপদে বিদায় হইয়া, সেইদিনই জননীর উদ্দেশে গমন করিলেন। এ জগতে মা ছাড়া কে থাকিতে চায়? যার আছে,—যে ভক্ত, সে তাঁহাকে না দেখিয়া, তাঁর পদপূজা না করিয়া কোথাও থাকিতে পারে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।



আপোষ-নিষ্পত্তি।

এ জগতে আমিত্বের প্রসার সর্ব্বত্র। আমি বড়, আমি জ্ঞানী, গুণী, মানী—ইহা কে না ভাবে, নিজেকে বড় কে না দেখে? জগতে আমি ত সব, আমিই ত উত্তম-পুরুষ, আর তুমি, তোমাকে বড় ভালবাসি, তাই তুমি মধ্যম-পুরুষ—তা ছাড়া যাহা দেখি—সমস্তই অধম-পুরুষ। আত্ম-সর্ব্বস্ব, স্বার্থপর আমি, আমা ছাড়া, আমার প্রাণের আত্মীয় ছাড়া—সকলেই যে মন্দ, দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণ-শাস্ত্র আমাদিগকে উদাহরণ দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছে, তাই আমি সকলকেই পর ভাবিয়া কাছ ছাড়া করিয়া দিই। কিন্তু এই অহমিকা-মণ্ডিত আমিত্বকে যদি আবরণ ভেদ করিয়া দিই, যদি তাহাতে আত্মাভিমান না থাকে, তাহা হইলে এই আমিত্বই তুমিত্বে পৌঁছিয়া তোমাময় হইতে বেশী দেরি লাগে না; তখন অহমিকা-শূন্য আমার ক্ষুদ্র আমিত্ব মধ্যে যে বিরাট নিরাময় তুমিত্ব রহিয়াছে, যখন তোমার আমার মধ্যে এইরূপ ব্যবধান ঘুচিবে—তখন আমি বলিবার আর কিছুই থাকিবে না, তখন সবই তুমি—তোমাময় জগৎ

দেখিয়া সাধক আপন পর ভাবিতে ভুলিয়া যাইবে। যতদিন এইরূপ ভুল না হয়—ততদিন মানুষ পশু অপেক্ষা একটু উচ্চ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের ডেপুটী শ্যামাচরণ শিক্ষিত, তবে জড়বিজ্ঞানে জ্ঞানবান, আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ত তাঁহার হৃদ্‌গত নহে—তাঁহার ধনের অহঙ্কার, মানের গর্ব্ব, পদের মর্য্যাদা ত এখনও যায় নাই—তাই তিনি নিজেকে সকলের চেয়েই বড় দেখেন। আর আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন ত নকূড়া-ছকূড়া এত ডেপুটীর ছড়াছড়ি হয় নাই, কাযেই শ্যামাচরণ বাবুর ন্যায় বড় কে, তাঁহার আমিত্বের অঙ্কের এত দাম্ভিক-ভাবে সমাজে প্রতিফলিত না হইবে কেন?

শ্যামাচরণের কন্যা অপরাজিতার রূপ নাই—গুণ নাই। কেবল তাঁহার অর্থ আছে, পদের মর্য্যাদাও যথেষ্ট আছে, তথাপি তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে কেহই স্বীকৃত হয় নাই। বাপের অর্থ এবং পদমর্য্যাদা থাকিলে এবং তিনি রাজসরকারে বিশেষ সম্ভ্রমশালী হইলেই, তাঁহার কন্যাকে সকলে আগ্রহ করিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিবে, শ্যামাচরণের এ ধারণা পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, কন্যা যত বড় হইতে লাগিল, বিবাহার্থী আসিয়া যখন অপরাজিতাকে অপছন্দ করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল—তখন ডেপুটীবাবু চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, অজস্র অর্থের প্রলোভন দেখাইলেও—কেহ তাঁহার কন্যার পাণী-গ্রহণে স্বীকৃত হইল না।

শুধু টাকায় ত আর প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হইবে না—যাহাকে লইয়া আজীবন ঘরসংসার করিতে হইবে, জীবনসঙ্গিনী করিয়া যাহার সহবাসে প্রাণের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, তাহা কি একটা নির্গুণ-প্রাণীর সম্মিলনে পাওয়া সম্ভব? অপরাজিতার গুণের মধ্যে

তনি বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু সে বড়লোক তখনকার সমাজে ত শোভনীয় নহে। শ্যামাচরণ ব্রাহ্মণ, পদস্থ এবং বিজ্ঞ হইলেও নাচারী, বিদেশীয় হাবভাবে পরিপূর্ণ, ধর্ম্মকর্ম্মে মতিও তাদৃশ ছল না, তাঁহার সেকালের বৃদ্ধা-জননী সময়ে সময়ে সামান্য ধর্ম্ম-র্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, পুত্রের সহিত পৃথক থাকিতেন, তথাপি ার্য্যকালে তাঁহার দান কোন ভাললোক গ্রহণ করিত না, তাঁহার াটীতে জলগ্রহণ করিতেও সমাজ কুণ্ঠিত হইত। ইহার জন্য জননী ময়ে সময়ে অনুযোগ করিলে দক্ষিণার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া তবে কান কোন দরিদ্র-বিপ্রভবনে তাহা স্থানলাভ করিত। শ্যামাচরণের কথাই নাই—তিনি সে সকলের কোন ধারই ধারিতেন না। অপরা-জতা এইরূপ পিতামাতার দ্বারা প্রতিপালিতা, শিক্ষিতা. তবে তাহার াদর তখনকার সমাজে কেমন করিয়া হইবে? তাহার বিবাহ না ইবার ইহাই প্রধান কারণ, তারপর নামে অপরাজিতা কাযে বজিতার অগ্রগণ্যা, এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে অপরাজিতাকে দখিয়া সকলে পছন্দ করিবে। রূপ কৃষ্টবর্ণ তবে বিজাতীয় হাবভাবে, পাষক-পরিচ্ছদে ঢাকা দিয়া একপ্রকার দেখাইত, বড়লোকের বিদুষী-ন্যা বলিয়া তাহার অহঙ্কার বেশ পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কেহ দেখিতে াসিলে, আগন্তুককে বেশভুষায় ভূষিত না দেখিলে শ্যামাচরণ প্রায়ই ন্যাকে দেখাইবার জন্য বাহির করিতেন না, তিনি তাহাকে াষাভূষার অন্তর্গত ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। এই সকল নানা ারণে আর বড় কেহ যখন দেখিতে আসিল না, তখন শ্যামাচরণের হিত সারদাচরণের আলাপ হয়, তিনি আশ্বাস দিয়া তারাদাসের সহিত পরাজিতার প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ সংঘটন করিয়া দিয়া শ্যামাচরণের াড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

সমাজের লোক যাহাকে একেবারেই সমাজে স্থান দিত না, করণ-

কারণ দেখিয়া যাহার সহিত আহার-ব্যবহার রহিত করিয়াছিল, তাহার কন্যার সহিত তারাদাসের ন্যায় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশজ পাত্রের বিবাহ এক সারদাচরণ ভিন্ন কেহই ঘটাইতে পারিত না। সারদাচরণ তাহাদের সকল প্রকারে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, বৃদ্ধ মৃত্যু সময়ে পুত্রবধূ ও পৌত্রটীকে হাতে হাতে সপিয়া দিয়া যাইলেও সারদাচরণ বৃদ্ধের শেষ-প্রার্থনা কিছুই রক্ষা করেন নাই পরন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। ইহাতেও আশা পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, একটা আচার-ভ্রষ্ট অহিন্দুর কন্যার সহিত তারাদাসের বিবাহ দিয়া কিছু মোটা লাভ করিয়া লইল। কেবল শ্বশুরের আত্মীয় বলিয়া ষোড়শী তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই এবং প্রথমা-বধূ বিমলার প্রতি তাঁহার একটা বিষম সন্দেহ হওয়ায় সারদাচরণের আশা সহজেই ফলবতী হইয়াছিল কিন্তু এখন ষোড়শী বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের চক্রান্তের মর্ম্মভেদ করিতে পারিয়া কপালে করাঘাত করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া গুণবতী বিমলার জন্য আবার তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে।

একটা বিষম দায়োদ্ধার করিয়া দিয়া সারদাচরণ ডেপুটীর খুব সুনজরে পড়িয়াছিল, তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া শ্যামাচরণ নিজের সেরেস্তায় একটী কায করিয়া দিয়াছিলেন। বাটীর খরচপত্র, দেনা পাওনা সমস্তই সারদাচরণ দেখিতেন, অল্পদিনের মধ্যে ডেপুটীর ভবনে সারদাচরণের প্রতিপত্তি আশাতীত বাড়িয়া গেল। সারদাচরণ লোকটীও তোষামোদ করিতে খুব পটু ছিল। তোষামোদের বশ এ জগতে নয় কে? দেখিতে পাওয়া যায়, যে বড়লোক বলেন—তোষামোদ ভালবাসি না, তিনিই অতিরিক্ত তোষামোদ-প্রয়াসী। যাহার দ্বার দেবতার আসন টলে, মানুষ তাহা চায় না, ইহা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায়? আমরা বেশ জানি—শ্যামাচরণ তোষামোদেই বশ হইয়া-

ছিলেন। সারদাচরণ যেরূপ করিত, অপরে সেরূপ করিতে পারে না, তাই সামান্য দিনের মধ্যে কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া, সে ডেপুটীর অতিরিক্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিল।

সারদাচরণ সাতিশয় কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন, সময়ে সময়ে এমন অনেক জালজালিয়াতি করিয়াছে, যাহা বড় বড় শিক্ষিতলোকেও ধরিতে পারে নাই। বারবার এইরূপ করিয়া সারদাচরণের মনে একটা সাহস বদ্ধমূল হইয়াছিল—এই সাহসের বলেই সারদা ডেপুটীর স্বাক্ষর জাল করিয়া কতকগুলি ভাড়ার টাকা অপলাপ করিয়াছে, কিন্তু এবার আর কিছুতেই গোপন রহিল না—শ্যামাচরণের নিকট সারদার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, ডেপুটী স্বয়ং হাকিম—তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলেন। এত যে প্রাণের ভালবাসা, খাতির-যত্ন, কোথায় তিরোহিত হইল—তাহার স্থিরতা নাই। সারদাচরণ এইবার ফাঁদে পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কাশীনাথের পিতা তাহার একজন প্রধান সহায় ছিলেন, অনেক বিপদাপদে রক্ষা করিতেন। হায়! তিনিও আর নাই, পাষণ্ড যে তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, চির-উপকারকের শেষ-সম্বলের বল দাগাবাজী করিয়া নষ্ট করিয়াছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ভগবান দিবেন না? এখনও রাত্রিদিন হইতেছে, বিশ্বাস-ঘাতকের কি পতন হইবে না; চিরদিন কি সমান প্রভাবে পাপের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না, ভগবানের রাজত্বে পাপ চিরদিন অপ্রতিহত প্রভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লোকলোচনে ধাঁধাঁ প্রদান করিতে পারে না! সেই জন্যই আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া সারদাচরণের দুর্গতির একশেষ, শেষ অবস্থায় বোধ হয় তাহাকে শ্রীঘরের অতিথি হইতে হয়। এযাত্রা আর পরিত্রাণ নাই—মকর্দ্দমা যেরূপভাবে চলিয়াছে তাহাতে অব্যাহতি নাই, বৃদ্ধবয়সে একজন ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রের হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া একটা

জঘন্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে—সমাজে তাহার পুত্র কন্যাগণ মুখ দেখাইতে পারিবে না; প্রতিবাসী সকলেত ভদ্রলোক, সারদার প্রতি জাতক্রোধ থাকিলেও এ দুঃসময়ে তাহারা বিপক্ষতাচরণ করিল না, অন্ততঃ তাহার স্ত্রীপুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া তাহারা সারদার অব্যাহতি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

এই সময় স্বামীপূর্ণানন্দ চুঁচুঁড়ায় কোন শিষ্যবাটী অসিয়াছিলেন তাঁহাকে খুব ভাল জ্যোতিষী জানিয়া সারদাচরণের বৃদ্ধা-স্ত্রী স্বামীর কোষ্ঠির ফল গণনা করাইতে গিয়াছিলেন। এই দিন পূর্ণানন্দ সারদাচরণের সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হন, স্বামী কুট-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও স্ত্রী-জাতি চিরকালই সরল-প্রাণা; স্বামীর যাবতীয় বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় তিনি এই মহাপুরুষের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিলেন; ইহাতেই পূর্ণানন্দ তারাদাস ও তাহার মাতার সন্ধান সামান্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারদাচরণের স্ত্রী কাত্যায়ণীর ক্রন্দন দেখিয়া পূর্ণানন্দ বিশেষ ব্যথিত হইয়া তাহার কোষ্ঠির ফলাফল বিচার করিয়া বলিয়া দিলেন—শাস্তি হইবার খুব সম্ভাবনা, তবে আপোষে নিষ্পত্তি করিলে ভাল হয়। মন্দ লোকের প্রতি কাহারও সহানুভূতি থাকেনা, তাহার বিপদাপদে মাথা দিতে কেহ সহজে চায় না। সারদাচরণের প্রতিও কাহারও সহানুভূতি ছিল না, আজীবন সে পাড়ার সকলকে জ্বালাইয়া আসিয়াছে, একটু ফাঁকে পাইলেই একজনকে না একজনকে বিপদজালে জড়ীভূত করিয়াছে। এ হেন দুষ্টবুদ্ধির বিপদোদ্ধারের জন্য পাড়ার কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না, তবে কাত্যায়নীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন ও পূর্ণানন্দের উপরোধ-অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সকলে শ্যামাচরণের নিকট অগ্রসর হইল এবং বিনয়-নম্র-বচনে ব্রাহ্মণকে এ যাত্রা ক্ষমা করিবার অনুরোধ করিল।

শ্যামাচরণ বহুদিন এ জেলায় অবস্থান করিতেছেন, উচ্চপদস্থ ধনীও

বটেন কিন্তু অদ্যাবধি পাড়ার কেহ তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করেন নাই, কোন বিষয়ের জন্য কেহ কখন তাঁহার শরণাপন্নও হয় নাই। আজ অনাত্মীয় তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পাড়ার বহু মান্যগণ্য লোক তাঁহার দ্বারস্থ, তাঁহার কৃপাপ্রার্থী—দেখিয়া ডেপুটীর উগ্রপ্রকৃতি অনেকটা নত হইয়া পড়িল। পাড়ায় বাস করিতে হইলে পাড়ার লোকের সহিত সদ্ভাব রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা তুমি যত বড়লোকই হও না, অর্থবল তোমার যতই থাকুক না, তুমি কিছুতেই তথায় অবস্থান করিতে পারিবে না। পাড়ার লোকের সহিত মনোবিবাদ-ভঞ্জনের ইহাই প্রকৃত সুযোগ বুঝিয়া শ্যামাচরণ সকলকে আপ্যায়িত করিবার ছলে বলিলেন,—"আপনারা বহু মহারথী আজ একটা নগণ্য জুয়াচোর পাষণ্ডের মুক্তির জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহাতে আমি যার-পর-নাই বাধিত হইয়াছি; তবে সারদার মত একজন জালিয়াতকে মুক্তি প্রদান করিলে, তাহার উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে, সময়ে হয়ত আপনাদেরও অপকার করিতে পারে, আমার আর কি, আমি বোধ হয় শীঘ্রই বদলী হইয়া যাইব, পাষণ্ডের মুখ আর আমায় দেখিতে হইবেনা।" যতই হউক, শ্যামাচরণ শিক্ষিত, শিক্ষার একটা গুণত আছেই, সকলে তাঁহার নম্রতা দেখিয়া বলিল,—"মহাশয়! আমরা তাহার জন্য তত দুঃখিত নহি, তাহার জন্য আমাদের অন্তরে তিলমাত্র দয়ামায়া নাই, আমরাও মহাশয়ের ন্যায় অশেষ প্রকার ঘৃণিত ব্যবহারে সারদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তবে কি করিব—তাহার পতিব্রতা পত্নীর কাতর-ক্রন্দন আমাদিগকে বাধ্য করিয়া আপনার দ্বারস্থ করিয়াছে, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়—করুন।" ডেপুটি শ্যামাচরণ দশের বাক্য কোন মতে ঠেলিতে পারিলেন না, সমস্ত বিষয় আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। পরদিন শ্যামাচরণ সারদার বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়া লইলেন, সারদার অব্যাহতি হইল দেখিয়া পূর্ণানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাটোয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যবনের অত্যাচার।

অর্থহীন হইলে, অবস্থা সচ্ছল না হইলে, প্রাণের আনন্দে আহার বিহার করিতে না পাইলে, অথবা উপর্য্যুপরি নানাপ্রকার মনোকষ্ট পাইলে, যুবা-জীবনই যখন অকাল-বার্দ্ধক্যে নত হইয়া পড়ে, দেহমন ভাঙ্গিয়া নৈরাশ্য-সাগরে হাবুডুবু খায়,—তখন শ্যামাকিঙ্করের যে অকাল-বার্দ্ধক্য আসিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বয়স হইয়াছে—তবে ব্রাহ্মণ নাকি বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাই সংসারের এত ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও এখন বানচাল হন নাই। গ্রামের লোক সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী, সকলেই তাঁহার অমায়িক-গুণে একান্ত বিমুগ্ধচিত্ত, বিশেষতঃ শান্তিরাম যে তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন—তাহা বলিতে পারা যায় না।

গ্রামের মধ্যে শান্তিরাম রায় অর্থবান;—দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত সৎ-লোক দেখিলে তিনি অকাতরে সাহায্য করিয়া থাকেন; আপনার ফেলিয়াও তাহার উপকার জন্য প্রাণপণ করেন—মনোহরপুরে এরূপ স্বার্থত্যাগী লোক আর কেহই ছিল না। তাঁহার সহিত শ্যামাকিঙ্কর মিলিয়াছেন, মণি-কাঞ্চন সংযোগে আর কি কোন ত্রুটী থাকিতে পারে? এতদিন শ্যামাকিঙ্কর বড়ই মনমরা, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন, এখন শান্তিরামের সাহায্যে আবার যেন একটু একটু করিয়া প্রাণে তেজের সঞ্চার হইতে লাগিল। শান্তি-রাম নিজ পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কমলকুমারেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বার্দ্ধক্য-দশায় আর পুত্রের শিক্ষাভার নিজহস্তে গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া শান্তিরাম অবস্থানুসারে তাহাদের

জন্য একটী গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয় চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে আসিয়াছেন; কোন সদ্‌ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার ও বাসস্থান পাইলেই তাঁহার যথেষ্ট হইবে, নগদ কিছুই দিতে হইবে না; সকালে বৈকালে তিনি শান্তিরামের পুত্রের ভার লইবেন; শিক্ষকটী বেশ উপযুক্ত, বি, এ অবধি অধ্যয়ন করিয়া অবস্থাবৈগুণ্যে এখন চাকুরী করিতে আসিয়াছেন। শান্তিরাম ভদ্রগৃহস্থের সন্তান, পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। বলাবাহুল্য শান্তিরাম রায়ের পুত্র নিত্যানন্দের সহিত কমলকুমারও ঐ শিক্ষকের নিকট পড়িতে লাগিল। কমলকুমারের প্রখর-বুদ্ধি দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় যার-পর-নাই আনন্দে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। বালকদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দুই বন্ধুতে পরকাল নিস্তারের জন্য ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। সময়ে সময়ে অবসর পাইলে শ্যামাকিঙ্কর পুত্রগণের কিরূপ শিক্ষা হইতেছে—তাহা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। শিক্ষকটী যে প্রাণপণে খাটিতেছে—বালকদের শিক্ষা বিষয়ে যে কোনও প্রকার ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন না—ভুক্তভোগী হইয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। শিক্ষকটীর প্রতি সকলেরই মন পড়িল—যাহাতে আহারাদির কোনরূপ ক্রটী না হয়, নিত্যানন্দের জননী এবং কমলকুমারের জননী মোক্ষদা সে বিষয়ে প্রখর-দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন; নতুবা আহারাদির কষ্ট হইলে, বিনা-বেতনে নির্ভর করিয়া ভদ্রলোকের ছেলে থাকিবে কেন?

ক্রমে ক্রমে শিক্ষকটীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া উঠিল। শান্তিরামের বাটিতে তিনি এক প্রকার পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইলেন; তাঁহার অনেক বিষয়কর্ম্মও অনেক সময় শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা সমাহিত হইত; ইহার জন্য শান্তিরাম বার্ষিক তাঁহাকে আরও কিছু পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিতেন। আহা! বেচারী খুব ভদ্রলোক,

উচ্চ-বংশের ছেলে না হইলে কি এমন হয়? শিক্ষকটীর দোষের মধ্যে একটী চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু তাহাতে কার্য্যের কোন হানি হইত না; তাহা হইলে কি অফিসে তাঁহাকে এত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখে? মাষ্টার মহাশয়ের সদ্‌গুণ যে অনেক, সর্ব্বোপরি তাঁহার নম্রতা, শুধু শান্তিরাম ও শ্যামাকিঙ্কর কেন, পাড়ার সকলকেই মোহিত করিয়াছিল।

এইরূপে মনোহরপুরে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। শ্যামাকিঙ্কর ও মোক্ষদা দেশের কথা ভুলিয়া গিয়া, দেনার দায়ে যে তাহাদের বাস্তুপর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা পরের গ্রামে পর হইয়া আছেন; তাহা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া পরম আনন্দে কাল কাটাই-তেছেন। সকলেরই ভাল, সকল প্রকার আনন্দে সকলেরই প্রাণ উৎফুল্ল, কেবল বিমলার চিন্তা শ্যামাকিঙ্করের মনের মধ্যে উদয় হইলে প্রাণ যেন কেমন আন্‌চান্ করিয়া উঠে, মন যেন কেমন একটা ভবিষ্যতের দুর্ব্বিসহ চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। আহা! অভাগিনীর এই ত ফুটন্ত-যৌবন, এইত জীবনের মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যার যে এখনও অনেক বাকী, আশা-নিবৃত্তির পথে যে এখন অনেক বিভীষিকা, যদিও মা আমার আজীবন-ব্রহ্মচারিণী হইয়া কাল কাটাইতেছেন, অচল অটলভাবে যদিও চিত্তকে স্ববশে রাখিয়াছেন, কিন্তু হায়! এমন যে মনোহর নারীজীবন, মাতৃত্বের এমন যে অভিনব জীবন্ত-প্রতিমূর্ত্তি; যখন কালের দাপে শুকাইয়া যাইবে, তখন ইহার ছায়ামাত্র থাকিবে না; ইহার নাম লোপ হইয়া যাইবে। আমি যে এত করিয়া মানুষ করিলাম, বিবাহ দিলাম, কিন্তু বাছাকে একদিনের জন্য সুখী করিতে পারিলাম না, এত কষ্ট, সংসারে এতটা টানাটানি, তথাপি মা যেন আমার আনন্দের বিমলছবি, মধুর অধরে হাসির রেখা সদাই ফুটিয়া রহিয়াছে, এতকষ্টেও বিমলাকে কেহ কখন বিমলিন দেখে নাই, যেন আনন্দের জীবন্তমূর্ত্তি,

মায়ের অত্যুজ্জ্বল রূপ-সাগরে ধর্ম্মের বিমলভাতি প্রতিভাত হওয়ায় যেন স্বর্গের সুষমা খেলিয়া বেড়াইতেছে, হায় বাবা তারাদাস! এ সময় তুমি থাকিলে, তোমার সোহাগ, সুখ মাখা হইলে মায়ের আমার জ্যোতিঃ যে কতদূর বাড়িয়া উঠিত—তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়! তারাদাস! বাপ আমার কোথায় তুমি, আমি যে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তোমার মত রূপবান ও গুণবান পাত্রে, তোমার মত সুরসাল রসালে আমার প্রাণের স্বর্ণ-লতিকাকে বেড়িয়া দিয়াছিলাম; বাবা! এ বন্ধন ছিঁড়িয়া তুমি, কোথায় চলিয়া গেলে, আর কি দেখা দেবে না?

মায়ের মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না। কন্যার জীবন বৃথায় বহিয়া যাইতেছে, এমন সোণার দেহ ধর্ম্মজ্যোতিমণ্ডিত হইয়া তেজোময়ী হইলেও মায়ের প্রাণ তাহাতে আনন্দিত হয় না, বিমলার পুত্র কন্যা হইবে, বিমলা তারাদাসের সহিত আদর্শসংসার পাতিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবে, পিতা মাতার ইহাইত প্রাণের আশা, ইহাইত তাঁহাদের জীবনের শান্তি! তাহা না হইয়া একি হইল, নামে সধবা কিন্তু কার্য্যত যে বিধবারই অনুরূপ। হায়! ললাটের লিখন যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে, বিধাতা যেরূপভাবে তাহার ভাগ্যগঠন করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করে, জগতে এমন সাধ্য কার, দুঃখ দেখিয়া কেবল হা হুতাশ করিয়া প্রাণে মরা ভিন্ন আর উপায় কি?

বিমলা কিন্তু ঠিক সমভাবে আছে; কোনরূপ চাঞ্চল্যে স্বভাবের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। অগাধ জলের মৎস্য যেমন ধীরস্থির প্রশান্ত থাকে; কিছুতেই যেমন নড়ে চড়ে না, বিমলা রূপযৌবনের তলে ডুবিয়া ধর্ম্মধৈর্য্যে তেমনি দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন; কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিলে চিত্ত যে কিছুতে দমিতে পারে না, বিমলা-চরিত্রই তাহার একমাত্র নিদর্শন।

মনোহরপুরে আজ দুই বৎসর অবস্থান করিয়া তাঁহারা খুব সুখে

আছেন। সকলেই এই আদর্শ-পরিবারকে বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে-ছেন, বিমলার ন্যায় পরমাসুন্দরী যুবতী রমণীর ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া, সকলেই অবাক্ হইয়া তাহাকে দেবীনির্ব্বিশেষে মনের মন্দিরে পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন। হিন্দুমাত্রেরই এই ভাব—কিন্তু লোভে, আপ্‌শোষে ফাটিয়া মরিতেছে একজন,—সে পাষণ্ড রমজান সেখ! পাষণ্ড এইরূপ জ্যোতিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য পতঙ্গের মত ছট্‌ফট্ করিতেছে; মনোহর-পুরে প্রথমে আসিয়া সে বিমলা-লাভের আশায় এক প্রকার হতাশ হইয়াছিল কিন্তু অর্থে কি না হয়, অর্থবলে জগতে অসাধ্য কি আছে? অজস্র অর্থ খরচ করিয়া সেখ সাহেব এই দুই বৎসর পাড়ার ভদ্রমণ্ডলীতে না পারুক, ছোটলোক মহলে বেশ পসার করিয়াছে, তাহাদিগকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে; এখন রমজান তাহাদিগকে যাহা বলে—তাহারা তাহাই করে। ভালমন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা গোঁয়ারগোবিন্দ, অশিক্ষিত ছোটলোকদের আছে কি? তাই তাহারা কিছুদিন পরে রমজানের যন্ত্রচালিত হইয়া একটা ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল। পুকুর-ঘাটে বিমলাকে পাইলে ঠাট্টা 'তামাসা ক'রে ভয় দেখায়, তাহা দেখিয়া বিমলা ঘাটে আসা বন্ধ করিলেন, তাহাতেও সুফল না পাইয়া পাষণ্ডেরা শ্যামাকিঙ্করের বাটীতে গভীররাত্রে ইট-পাটকেল ফেলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। নানা আশঙ্কা-জনক অত্যাচার করিয়া একটী ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিষম অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। আকস্মিক-বিপদে বৃদ্ধ-শ্যামাকিঙ্কর বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পাড়ারলোকের শরণাপন্ন হইলেন। শান্তিরাম ত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আছেনই—সকলে পরামর্শ করিয়া পুলিশে সংবাদ প্রদান করিল; পুলিশ আসিল বটে কিন্তু ভিতরে যে অর্থবান রম-জানের বিশেষ কলকাটী আছে। তাহারা কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না; আর রজনীর নিভৃত-যামে কখন কি হয়, তাহার জন্য প্রত্যহ কে

জাগিয়া বসিয়া থাকিবে ? পুলিশ নিযুক্ত হইলে দুই চারিদিন অত্যাচার বন্ধ হইল বটে কিন্তু পুলিশ যেমন চলিয়া যাইল, আবার অমনি উপদ্রব হইতে লগিল। পাড়ার লোক যদি অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করে ত, সে অত্যাচার নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নয়; কখন কি করিবে, সাধে কখন বাদ সাধিবে—তাহা কে জানে ?

ঘোরতর অত্যাচার, বিনাদোষে একজন নিরীহ ভদ্র-পরিবারের প্রতি এমন অবিচার দেখিয়া হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই স্তম্ভিত হইলেন। প্রতি-কারের জন্য নানা উপায় উদ্ভাপন করিতে লাগিলেন। শ্যামাকিঙ্কর বিনা-দোষে অত্যাচার দেখিয়া সস্ত্রীক কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন—বিমলার জন্যই এই উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে; সতীর সতীত্ব-নাশের জন্যই দুর্বৃত্তেরা শ্যামাকিঙ্করকে উদ্‌বাস্তু করিবার চেষ্টা করিতেছে। দরিদ্রের ঘরে এমন ললামভূতা রমনীরত্ন দেখিয়া পাষণ্ডদের লোভ জন্মিয়াছে, তাই এ অত্যাচার! সিদ্ধান্ত হইল—কোন বিশেষ পরিচিত লোকের সহিত বিমলাকে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নতুবা ঐ উৎপাত থামিবে না। দুর্বৃত্ত রমজান যে ইহার ভিতরে থাকিয়া অজস্র পয়সা ছড়াইতেছে—তাহারই যে এই কায, রূপজ-মোহে পড়িয়া সেই যে এতদূর অত্যাচার করিতেছে, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না, কিন্তু তাহাকে স্পষ্টত অত্যচার করিতে না দেখিয়া ত আর কিছু বলা যায় না, সেত যে সে লোক নহে! এই জন্য সকলেরই মত হইল বিমলাকে কোন বিশিষ্ট-পরিচিতের সহিত কিছু দিনের জন্য গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত করা; কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহাতে প্রবোধ মানিল না; প্রাণের কন্যাকে কাছ ছাড়া করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিস্কৃতি ।

বিপদাপদে বন্ধু-বান্ধবের কথা অবহেলা করা যুক্তিসঙ্গত নয়; বিশেষতঃ সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে,—বিমলার জন্যই এই অত্যাচার, তখন তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক স্থানান্তরিত করা উচিত। এত চেষ্টা, এত অন্বেষণ করিয়াও যখন তারাদাসের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন এ বিষের-বাতি গৃহে জ্বালাইয়া আর আমি ছারখার হই কেন? এখন হৃদয় দৃঢ় করিতে হইবে, মায়া-মমতা প্রাণ হইতে তাড়াইয়া নির্ম্মম হইতে হইবে, কিছুতেই ভয় পাইলে চলিবে না, এমন কি বিমলাকে যদি স্বহস্তে মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিয়া এ বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাও মঙ্গল, তথাপি একজন যবন যে চক্ষের সম্মুখ হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, পবিত্র-বংশে ঘোর-কলঙ্ক কালিমা মাখাইয়া দিবে—তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। শ্যামাকিঙ্কর মনে মনে এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন।

দেশের সমস্ত বিষয়-আশয় নষ্ট করিলাম, পিতাপুত্রে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সুদূর মনোহরপুরে আসিলাম তথাপিও নিস্তার নাই, রমজান ঠিক পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, এখন বুঝিলাম বিমলার অদৃষ্ট মন্দ, কন্যাকে একজন মুসলমানের কবলে ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা তাহাকে জীবন্ত-প্রোথিত করিয়া মারিয়া ফেলাও ভাল। বিমলা আমাদের বুদ্ধিমতি কন্যা, তাহার জন্য আমাদের অতিরিক্ত ভুগিতে হইতেছে, দিবারাত্র কষ্টের একশেষ হইয়াছে দেখিয়া সেও হাসিমুখে বলিতেছে,—"বাবা! পাষণ্ড অর্থের লোভ দেখাইতেছে, সে আমাকে হস্তগত করিবার জন্য অজস্র অর্থ জলের

মত খরচ করিতেছে, অত্যাচারের মাত্রা অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে; আমার জন্য আপনাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। অতএব আমাকে হয় কোন অজানিত দুর্গম-স্থানে পাঠাইয়া দিন, না হয় স্বহস্তে আমার প্রাণ-বিনাশ করিয়া আপনারা শাস্তিলাভ করুন। দরিদ্রের প্রতি প্রবলের অত্যাচার ত কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না—ইহা যে চারিযুগ চলিয়া আসিতেছে।" ধর্ম্মরক্ষার্থ বিমলার তেজোদৃপ্ত এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিলে বাস্তবিক মরা-প্রাণেও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। অগ্রে মান তারপর প্রাণ, মান নষ্ট হইলে প্রাণের আবশ্যক কি? হায়! মা বিমলা! এতদিন প্রাণের স্নেহ-মমতা দিয়া পালন করিলাম, তোমায় সুখী করিবার জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ দিয়া শেষে কি এই করিতে হইল? মা! তোমার ভাগ্য-লিপি কি এতই জটিল; জীবনে কি তিল মাত্র সুখ নাই? ঐ যে তেজের মূর্ত্তি বিমলা আসিতেছে। ওঃ বেটী কি নির্ভীকচিত্ত, অম্লান-বদনে বলে,—"বাবা! আমায় জীবন্ত মাটিতে পুতিয়া ফেল, না হয় কোথাও গুপ্তভাবে পাঠাইয়া দাও—যেখানে পাপিষ্ঠের পাপ-ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে না, যেখানে যাইলে লোকবল ও অর্থবলে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে, আমাকে এমন কোন প্রবল রাজার রাজ্যে রাখিয়া আইস।"

আমার জন্য পিতামাতার কষ্টের একশেষ হইয়াছে—সুখে আহার করিতে পাইতেছেন না, নিদ্রার সময়ও সেই বিভীষিকা, পাষণ্ডের অনুচরগণ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে, প্রাণে মারিবার ভয় দেখাইতেছে. হায়! এত বেলা হইল—তথাপি পিতা কোথায় বসিয়া এই বৃদ্ধ-বয়সে কেবল আমার জন্য চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছেন, পিতামাতা ভাবিয়া ভাবিয়া যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে আমার চিন্তাই বুঝি তাঁহাদের সঙ্গের সাথী হয়। হা ভগবান! আর কেন, আমাকে গ্রহণ কর,—পিতৃ-মাতৃঘাতী করিয়া এ ধরাতলে রাখিয়া

আর কেন পরের চক্ষুশূল করিতেছ? যদি একান্তই রাখিতে হয়, তাহা হইলে তোমার প্রদত্ত এই প্রবল রূপ-শিখা কোন মহাবল ব্যাধিতে বিনষ্ট কর, আমাকে অতিশয় কুরূপা করিয়া লোকচক্ষু হইতে রক্ষা কর। যাহাতে আমি নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাইতে পারি। পতি-পরিত্যক্তা নারীর রূপের আবশ্যক কি? কেই বা তাহা দেখিবে —কেই বা আদর করিবে। ইহা লইয়া পরের কুনজরে পড়িয়া কেবল কলহ-বিবাদ বাড়াইয়া জীবন অশান্তিময় করা বইত নয়? চাইনা দয়াময়! তোমার এ দয়া, তোমার এ মোহ-মদিরাময় রূপের ভরা; ইহা অপেক্ষা কুরূপা হইয়া বিমল শান্তি-সুখে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করা সহস্রগুণে শ্রেয়। অধিক বেলা হইয়াছে, ছোটভাই কমলকুমার অশান্তি-অনলে পুড়িয়া জীবন-ধারণের মত চারিটী আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গিয়াছে। মায়ের প্রাণে সুখ নাই—তিনি অবিরত আমার জন্য নয়ন-জলে বুক ভাসাইতেছেন—পিতা পাগলের মত হইয়াছেন। এ সকল দেখিয়া কি আমার প্রাণ-ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়?

বেলা তখন দুইটা বাজিয়াছে—বিমলা ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে পিতার অন্বেষণে আসিলেন। আজ শ্যামাকিঙ্করের হাবভাব অন্যরূপ, কোমলতা মাখা দেহকান্তি যেন বিষম উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে; বার্দ্ধক্যে যেন যৌবনের তেজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কন্যাকে দেখিয়া পিতা দন্ত কড়-মড় করিয়া বলিলেন,—"হতভাগিনী! তোর ভাগ্য যদি এতই খারাপ, তবে অন্য কয়টার মত ছেলেবেলায় মরিলিনা কেন, তাহা হইলে তোর জন্য আর আমাদের এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না?

সে উগ্রভাব দেখিয়া বিমলা স্তম্ভিত হইয়া গেল—নতমুখে ভয়ে-দুঃখে বদন আরক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বাবা! সমস্তই বুঝিতেছি; বৃদ্ধ-বয়সে আমিই তোমাদের মহা অশান্তির কারণ হইয়াছি, কি বলিব বাবা! সমস্তই অদৃষ্টের ফল—কপালের লেখা দুর্গতি ত খণ্ডন হইবার নহে। হয় আমাকে

জীবন্ত মারিয়া ফেলুন, না হয় কোন শ্বাপদসঙ্কুল গহনবনে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন—তাহা হইলে আপনাদের সমস্ত কষ্ট দূর হইবে।"

আদরের কন্যার প্রতি জীবনে এই প্রথম কটূক্তি, প্রাণের দারুণ অশান্তিতে হঠাৎ বাহির হইয়াছে। কন্যার দুঃখ-কষ্ট-বিমণ্ডিত মুখের প্রতি চাহিয়া চিরপোষিত মমতা যেন আঁকড়াইয়া ধরিল। শ্যামাকিঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা! অসহ্য হইয়াছে, এত চেষ্টায়ও ত কৈ অব্যাহতি নাই। এখন পাড়ার সকলে বলিতেছে—মাষ্টার সুদূর রাজপুতনায় বদলী হইতেছেন—সকলের ইচ্ছা, সেইখানে তোমাকে পাঠাইয়া দিই।"

বিমলা শিহরিয়া উঠিলেন; তারপর বলিলেন,—"আমাকে হত্যা করিলেও কি নিষ্কৃতি হইবেনা বাবা?"

পিতা বলিলেন,—"সময়ে সময়ে হৃদয় সেইরূপ কঠিন হয় বটে, কিন্তু পিতা কি স্বহস্তে তাহা করিতে পারে?"

বিমলা আর কোন উত্তর দিলেন না; যত কথা কহিবে ততই বাড়িয়া যাইবে। বেলা যে অনেক হইয়াছে, তজ্জন্য বলিলেন,—"বাবা! বেলা অনেক হইয়াছে, আর এখন কথায় কায নাই; যদি আপনারা সুখী হন, আমি বিষ খাইয়াও মরিতে প্রস্তুত। এক্ষণে গৃহে চলুন—মার কাল রাত্র হইতে অসুখ বাড়িয়াছে।" যে পীড়ার কথা শুনিলে পিতা অস্থির হইতেন, আজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত কন্যার সহিত তিনি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। মোক্ষদা অন্নপ্রদান করিলেন। পিতা আহারে বসিলেন দেখিয়া, বিমলা পূজা আহ্নিক সমাধার জন্য দেবালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিমলা এখন একাহারী, সমস্ত দিন পূজা-আহ্নিকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দিবসের শেষভাগে একবার মাত্র আহার করেন; ভূমিশয্যায় কখন একটু বিশ্রাম করেন, কখন বা জননীর অসাক্ষাতে সংসারের সকল কাযকর্ম্ম সারিয়া রাখেন। মা দেখিলে ত ননীর-পুতুলী কন্যাকে এত

খাটিতে দিবেন না। তাই জননী ঘুমাইলে সারারাত ধরিয়া বিমলার কাবের বিশ্রাম থাকেনা—ইহাতে তাঁহার প্রাণের হু হু প্রজ্জলিত আগুন অনেকটা প্রশমিত থাকে।

বিমলা চলিয়া গিয়াছে; পতির আহার হইয়াছে—তিনি আচমনাদি করিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন দেখিয়া, মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কোন উপায় করিতে পারিলে কি?"

শ্যামাকিঙ্কর। আজ তিন দিন ধরিয়া তারাদাসের অন্বেষণ করিয়াছি, তার পর গুরুদেবের জন্য কাটোয়ায় লোক পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এখন তথায় নাই—তবে গ্রহ-পূজার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? মাষ্টার আজ চলিয়া যাইবে, তোমার মত কি?

"তুমি স্নেহময় পিতা, প্রাণ ধরিয়া যদি পরের হাতে, মেয়েকে তুলিয়া দিতে পার—দাও, আমার আর আপত্তি কি?" বলিয়া, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা মাতা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—ধর্ম্ম-প্রভাপ্রোজ্জ্বলা দেবী-প্রতিমা বিমলা ধীরে ধীরে দেবগৃহ হইতে পিসীমাতার নিকট আসিলেন। পিসীমাতা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। উভয়েই আহারাদি করিলেন।

আজ মোক্ষদার অতিরিক্ত জ্বর হইয়াছে; উঠিবার ক্ষমতা নাই। নানা প্রকার মানসিক চিন্তায় জ্বর দেহ ছাড়া হইতেছে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে বেহুঁস করিয়া ফেলিতেছে। রাত্রি দশটা অবধি তাঁহার চৈতন্য থাকেনা। এই অবসরে আজ শ্যামাকিঙ্কর তাঁহার মর্ম্মযাতনার শেষ করিবেন—সকল দুঃখের অন্ত করিবেন, নিষ্কৃতি পাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তখন রাত্রি খুব বেশী হয় নাই—পাষণ্ডগণের অত্যাচার আরম্ভ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে—ইতস্ততঃ কিছু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া—কন্যা সঙ্গে শ্যামাকিঙ্কর হলুদ-বাগানে প্রবেশ করিলেন। শ্যামা পূর্ব্বেই

শুন্তিরামের বাটী গিয়াছিল। বাটীতে কেবল অচৈতন্য অবস্থায় মোক্ষদা পড়িয়া জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। পাড়ার কয়েকজন বন্ধুবর্গ তাঁহার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর চন্দ্র, তখন আকাশের গায়ে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। শ্যামাকিঙ্করের কীর্ত্তিকথা প্রকাশ হইলে ম্যালেরিয়া-গ্রস্তা ক্ষীণ-প্রাণা মোক্ষদার প্রাণভেদী ক্রন্দন শ্রবণ করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইবে, বুঝিয়া আজ উভয়ে এত মন্দগতি, এত অস্থিরমতি, কিন্তু তা বলিয়া ত জগতের কায বন্ধ থাকিবে না—বিধাতার নিয়ম ত লঙ্ঘন হইতে পারেনা, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রজনীনাথ ধীরে ধীরে গগনগাত্রে আপনার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দুঃখের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোক্ষদার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে—কমলকুমার বিষণ্ন-চিত্তে জননীর সেবা করিতেছেন; পিসীর সহিত দিদিকে লইয়া পিতা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—কাযেই বালক একাকী রুগ্না-জননীর শয্যা-পার্শ্বে অবস্থিত—নিজেদের অবস্থা ভাবিয়া এবং বিনাদোষে নির্যাতন সহ্য করিয়া কমলকুমারেরও শরীর আধখানি হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার সহিত তাহারও শান্তিশশী অস্তমিত।

হঠাৎ কালনিশিথীনির দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্যামাকিঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরহন্তার আকৃতি ভীষণ-ভাবাপন্ন হয়—আজ অতিশয় কোমল প্রকৃতি, ধীর শান্ত শ্যামাকান্তের দেহ-জ্যোতিঃও সেইরূপ কঠিন হইয়াছে, যেন একজন দানব নররক্ত পান করিয়া লোলীহান রসনায় গৃহাগমন করিয়াছে। দেহে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্তরেখা দেখা যাইতেছে। মোক্ষদা স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া ভয়-বিহ্বল-প্রাণে বলিলেন,—"আমার বিমলা কোথায়?"

শ্যামাকিঙ্কর তীব্রস্বরে বলিলেন,—"তোমার বিমলাকে যমের হাতে,

কি কাহার হাতে চিরতরে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি।” কর্ত্তার এই কয়দিনের মতিগতি এবং অদ্যকার অবস্থা দেখিয়া মাতাপুত্রে দারুণ সন্দেহে কাঁদিয়া উঠিলেন। হঠাৎ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া আশেপাশের লোক সমবেত হইল। শ্যাম্যকিঙ্কর বিকট-হাসি হাসিয়া—“নিষ্কৃতি! নিষ্কৃতি! নিষ্কৃতি! আজ শ্যামাকিঙ্কর আর শ্যামাকিঙ্কর নয়—রামনিধি! পণ্ডিত রামনিধি! পুত্র কমলকুমার নহে—অনাথনাথ” বলিয়া, গৃহত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া সকলেই পাগল হইয়াছে—মনে করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। বাহিরে শান্তিরামের মুখে সকল কথা শুনিয়া বন্ধুগণ বুঝিল,—বাস্তবিক নিষ্কৃতিই বটে, এইবার পাষণ্ড রমজানের আশায় ছাই পড়িয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।



পাক-চক্র।

রামনিধি এতদিন নাম ভাঁড়াইয়া মনোহরপুরে বাস করিতেছেন—একে ভিটামাটী বিক্রয় হওয়ায় একটা অপমান বোধ হইয়াছে; তাহার উপর নাম জানিতে না পারিলে রমজানের অত্যাচারে অব্যাহতি পাইতে পারেন, এই আশায় তিনি তাঁহার গুরুদত্ত শ্যামা-কিঙ্কর নামেই এখানে পরিচিত হইয়াছিলেন, পুত্র অনাথনাথকে কমলকুমার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; পাষণ্ড ঠিক সন্ধান করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে আবার এখানে আসিয়াও ঢুকিয়াছে। কাযেই আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি আপনার ও পুত্রের প্রকৃত নাম প্রচার করিলেন এবং সকল মায়া-মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া—প্রকারান্তরে কন্যার জীয়ন্তে প্রাণবধ করিয়া বাটী ফিরিলেন। বাটী ফিরিবার সময় রমজানের লোক, তাঁহাকে দারুণ অন্ধকারেও পীড়ন করিয়াছিল; দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছিল, তথাপি

ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ দুঃখের বদলে আনন্দ, কষ্টের বদলে সুখ, অশান্তির বদলে বহুদিনের পর অসীম শান্তিলাভ করিয়া, তিনি তীব্র-উৎসাহে বাটী ফিরিয়াছেন। যে কন্যা বিমলা তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল, যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না—আজ তাহাকে অন্তর হইতে অন্তর করিয়াও তাঁহার তিলমাত্র কষ্ট অনুভূত হইল না। বিষম বাজিল—কেবল মোক্ষদার হৃদয়ে, আর ভগ্নীগত-প্রাণ অনাথনাথ দিদিকে না দেখিয়া নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। কিন্তু মোক্ষদা ভাবিলেন, স্বামী যাহা করিয়াছেন—অনাথ ভাবিল—পিতা যাহা করিয়াছেন—তাহা এখন চুপে চুপে সহ্য করাই ভাল; নতুবা সংসার-তরীর-মাঝি হতাশ হইলে নিমজ্জমান সংসার, যে আরও অতলে যাইবে। সকলেই চুপ করিয়া রহিল, পণ্ডিত রামনিধি এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে দিন কাটাইতেছিলেন; সূর্য্য মেঘে ঢাকিয়া ছিল। এক্ষণে রামনিধি সুপ্রকাশ হইয়াছেন দেখিয়া বন্ধু-বান্ধব সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। খুব বড়-বংশের বংশধর বলিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া পণ্ডিত রামনিধির নাম তখন বাঙ্গালা দেশে খুব বিখ্যাত ছিল। মনোহরপুরে সেই রামনিধি আসিয়া বাস করিতেছেন দেখিয়া, অধিবাসিগণ আপনাদের সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিল।

অসন্তোষ প্রকাশ করিল একজন—সে রমজান সেখ। তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল; যাহাকে হাতে পাইবার সম্ভাবনা খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, দুষ্ট রামনিধি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে কি করিল—তবে কি সত্য সত্যই তাহাকে খুন করিয়াছে? নতুবা একরাত্রির মধ্যে আমাদের এতগুলাচক্ষুর মধ্য হইতে তাহাকে ত অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়, ব্যাটা বামুন বাপ-ব্যাটায় নাম ভাঁড়াইয়া মনে করিয়াছিল—আমি তাহাদের সন্ধান করিতে পারিব না; কিন্তু তাহা ত করিয়া এক প্রকার সমস্ত ঠিক করিয়াছিলাম—আর দুইচারিদিন হইলে

বোধ হয় আমার আশা ফলবতী হইত—কিন্তু এবার সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে ত নৈরাশ্য-সাগরে ভাসিলাম। এত অর্থব্যয়—এত পরিশ্রম, সকলই কি বিফল হইল? যাহাই হউক, আমি কিন্তু রমজান সেখ, সে ব্যাটা যেমন শান্তিলাভের জন্য আমাকে হতাশ করিল—আমি তাহাকে সহজে ছাড়িব না, তাহার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিব, খুনের দায়ে ফেলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিব, দেখি সে কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পায়? বাপ হ'য়ে মেয়েকে খুন ক'র্‌তে পারে, এমন বাপও ত কথন দেখি নাই, বেটা রাক্ষস নাকি! অথবা কলঙ্কের দায়ে হিন্দু-বেটারা এ সকল কায ক'র্ত্তে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপ-পুণ্য—কিছুই মানে না। এদিকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম রোজ না ক'রে ব্যাটাদের জল খাওয়া হয় না; একটা জীয়ন্ত মেয়ে মেরে ফেলা বুঝি ধর্ম্ম? আর তোর ধর্ম্ম-কর্ম্মের মুখে আগুন! রমজান রামনিধির ষড়যন্ত্রের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল এবং যেমন করিয়া হউক পণ্ডিতকে পাকচক্রে ফেলিয়া জেলে পুরিবে—এই আশায় ফিরিতে লাগিল।

অর্থে কি না হইতে পারে—অর্থবানের অসাধ্য জগতে কি আছে? রমজান বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ পাকা করিতে লাগিল। লোক পরম্পরায় যাহা শুনিল—তাহাতে রামনিধি যে তাহার কন্যাকে খুন করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। মানুষ মাত্রেরই যখন শত্রু ও মিত্র উভয়ই আছে, তখন রামনিধি ত আর দেবতা নহেন, তাঁহার শত্রু যে থাকিতে পারে না—এমন নহে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রলোভন বড়ই লোভনীয়, রমজানের মত আরও যাহারা বিমলার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিল—এক্ষেত্রে হতাশ হইয়া তাহারা সকলেই রমজানের সহিত যোগদান করিয়া, তাহাকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিতে লাগিল। যখন এত লোক রামনিধিকে কন্যাহন্তা বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে, তখন আর ভাবনা কিসের! রমজান

পুলীশের কর্ণে একথা তুলিয়া দিল, আবশ্যক হইলে সেও ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করিতে পারে, বলিয়া পুলীশের নিকট যখন প্রতিজ্ঞা করিল—তখন শান্তিরক্ষক পুলীশ খুনের আস্কারায় প্রবৃত্ত হইল!

একদিন বেলা দশটার সময় যখন রামনিধি পূজাহ্নিক সমাধা করিয়া আহারে বসিবেন, ঠিক সেই সময়ে মনোহরপুরের দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবলসহ পণ্ডিতের বাটী অবরোধ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাটীতে পুলীশের হুড়াহুড়ি দেখিয়া নিরীহ ধর্ম্মভীরু রামনিধি ভয়ে জড়সড় হইয়া গেলেন, কি করিবেন—কাহাকে ডাকিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি এমন কি দোষ করিয়াছেন—যে পুলীশ তাঁহার বাটী অবরোধ করিবে? এমন কি দোষ পণ্ডিত রামনিধি করিতে পারেন, পাড়ার কেহ তাহা খুঁজিয়া পাইল না! তথাপি পণ্ডিতের আকস্মিক বিপদে সাহসে ভর করিয়া দুই একজন আসিয়া উপস্থিত হইল,—রামনিধির প্রধান সহায় শান্তিরাম বাবু আজ বহুদিন হইল উদরাময় রোগে শয্যা-শায়ী, তিনি আসিতে না পারিলেও পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে—বন্ধুর এ বিপদে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের দেখিয়া পণ্ডিত কতকটা সাহস পাইলেন—দারোগার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! হঠাৎ আমার বাটী অবরোধ করিবার কারণ কি? আমার বিপক্ষে কি কোনও পরওয়ানা আছে?"

দারোগা। তোমার কন্যা বিমলা কোথায় এখনি বাহির কর, নতুবা তোমাদের সকলকেই বাঁধিয়া থানায় লইয়া যাইব।

পণ্ডিত। আমার কন্যার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাকে দূর দেশে কোন বন্ধুর বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছি, সে এখানে নাই।

দারোগা। সাবধানে মিথ্যা কথা কহিও, জান পুলীশের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিয়া কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইবে না।

পণ্ডিত। মহাশয়, জীবনে মিথ্যা কথা কখনও বলিয়াছি বলিয়া ত

মনে হয় না, আপনি বিনাদোষে একজন ভদ্রলোকের উপর এরূপ অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন কেন?

দারোগা। অন্যায় কি ন্যায় এখনি সকলে জানিতে পারিবে— কুলটা-কন্যাকে খুন করিয়া এখন লুকাইবার চেষ্টা করিলে বাঁকাউল্লা দারোগার কাছে অব্যাহতি পাইবে না। এখনি সমস্ত গুপ্ত-হত্যাকাণ্ড বাহির করিয়া দিব। এই বলিয়া দারোগাসাহেব একজন কনেষ্টবল দ্বারা পণ্ডিতকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ধার্ম্মিক পিতার অবস্থা দেখিয়া পুত্র অনাথনাথও কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহারা এ ব্যাপার ভালরূপ বুঝিতে পারিল না।

শান্তিরামের কর্ণে বন্ধুর দুরবস্থার কথা পৌছিল কিন্তু তাঁহার ত উত্থান-শক্তি রহিত, কেমন করিয়া এ বিপদে সহায়তা করিবেন, তথাপি পাড়ার দুই একজন বিচক্ষণ লোককে রামনিধির সাহায্য করিতে বলিয়া দিলেন। শান্তিরামের কথায় এবং পণ্ডিতের প্রতি তাঁহাদের অটল বিশ্বাস থাকাতে তাঁহারা পণ্ডিতকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিয়া নিরীহ ভদ্রলোক যাহাতে এই চক্রান্ত হইতে অব্যাহতি পান, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুলীশ কি ছাড়িয়া দিবার পাত্র? তাহারা খুব বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছে, যে রামনিধি তাঁহার কন্যাকে হত্যা করিয়া বাটীর পার্শ্বে হলুদবনে পুঁতিয়া রাখিয়াছে এবং পত্রলেখক ইহার জন্য প্রমাণ-প্রয়োগ সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সে পত্র প্রেরক আর কেহই নহে—জমীদার রমজান সেখ। মুসলমান সমাজের একজন অগ্রণী জমীদার রমজানের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? বাঁকাউল্লা তদন্তে অগ্রসর হইলেন। বাটীর পার্শ্বে সুবিস্তৃত হলুদবনে প্রবেশ করিলেন। বাগানটী নামে হলুদবন কিন্তু এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ যে হত্যা করিয়া তাহার মধ্যে প্রোথিত করিলে, সহজে কেহই অনুসন্ধান করিতে পারে না। দারোগা সাহেব লোকজন ও তাহার দুইটী শীকারী

কুকুর সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বাগান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

রামনিধি, মোক্ষদা ও তদীয় পুত্র অনাথনাথকে নজরবন্দী রাখা হইল। সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার জন্য স্বপক্ষ-বিপক্ষ অনেক লোকই বাগানে প্রবেশ করিল। স্বয়ং রমজান সেথ বাঁকাউল্লার সহ ঘুরিতেছে কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইতেছে না, সুবিস্তৃত বাগানের কোন্‌খানে কি হইয়াছে, কে সহজে তাহার তদন্ত করিবে? শিকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি সাতিশয় তীক্ষ্ণ, তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে করিতে একস্থানে আসিয়া অনবরত পদের দ্বারা মাটী খুঁড়িতে লাগিল ও তাহার ঘ্রাণ লইতে লাগিল, দেখিয়া দারোগা সাহেবের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল, তিনি তথাকার মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। দুই তিন জন নীচজাতীয় ব্যক্তি মাটী খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু বেশী দূর খুঁড়িতে হইল না। মাটীর কিছু নিম্ন হইতেই একটী শবদেহ বাহির হইল। প্রায় পনর কুড়ি দিন মৃত্তিকা-প্রোথিত থাকায় শবদেহ গলিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে, দেখিলে সহজে চিনিতে পারা যায় না। তবে তাহা যে স্ত্রীলোকের মৃত-দেহ এবং তাহাকে যে কোন অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে—তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মাটীর মধ্য হইতে গলিত-শবদেহ বাহির হওয়ায় দারোগা সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না। এতদিন পরে একটী গুম-খুনের যথার্থ আস্কারা করিতে পারিলেন বুঝিয়া, তিনি খোদাকে শত ধন্যবাদ দিলেন এবং উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে উহা রামনিধির কন্যা বিমলার মৃতদেহ কিনা তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বলিলেন। সকলেই মৃতদেহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, বিপক্ষ সকলে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—ইহা রামনিধির কন্যা বিমলার মৃতদেহই

বটে। স্বপক্ষ সকলেই রামনিধিকে অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত, তাঁহার দ্বারা কখনও এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে না, কিন্তু যখন শবদেহ বাহির হইয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল —হায় রে! কলিতে মানুষ চেনা দায়—বাঁড়ুয্যে মশাইকে দেখিলে বোধ হয় ভিজে-বিড়ালটী, যেন কত ধার্ম্মিক—কিন্তু ও পেটে যে এত বুদ্ধি, ধর্ম্মভাণে এত অধর্ম্ম যে প্রাণে বদ্ধমূল, তাহা কে জানে? ওঃ এত বড় একটা পাপ-কায, নিজের মেয়েকে খুন ক'র্‌তে একটু দয়াও হ'লো না, না হয় মেয়েটার চরিত্র একটু খারাপই হইয়াছিল। দারোগা সাহেব যখন বলিলেন,—"মশাই! আপনারা এ লাস চিনিতে পারেন কি?" অনেকে বলিল—"হাঁ, রামনিধির মেয়ে বিমলাই বটে!" আর যাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস রামনিধির ন্যায় ধার্ম্মিকের দ্বারা এমন একটা চণ্ডালের মত গর্হিত-কার্য্য কখনও সমাহিত হইতে পারে না, তাহারা বলিল,— "শব ত পচিয়া গিয়াছে, চিনিতে পারা যায় না, তবে স্ত্রীলোকের দেহ— ইহাকে খুন করা হইয়াছে—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।" রামনিধির বিপক্ষে এমন বিষম দোষারোপ করিতে, তাহাদের প্রাণ চাহিল না—তবে সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া, তাহারা আকুল হইতে লাগিল।

ইহার পর দারোগাসাহেব ভিতরে আসিয়া মোক্ষদা, রামনিধি ও তাহার পুত্র অনাথনাথকে যার-পর-নাই পীড়ন করিতে লাগিল। সে অমানুষিক নির্যাতন দেখিলে বা শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ক্রন্দনের রোলে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহ দারুণ অশান্তির আগার হইয়া উঠিল, রামনিধি একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জগদীশ! এ আবার কি ভীষণ পরীক্ষায় ফেলিলে প্রভু!" তারপর পত্নী ও পুত্রকে বলিলেন,— "তোমরা বল যে, আমি কন্যাকে খুন করিয়াছি, স্বীকার কর যে এ খুনের কর্ত্তা আমি এবং ঐ শবদেহ বিমলার।" এখন পুলীশের দারুণ উৎপীড়ন হইতে ক্ষণিক অব্যাহতি লাভের জন্য স্বামীর কথায় মোক্ষদা ও অনাথনাথ

নাজাই স্বীকার করিলে, পুলীশ শব ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইয়া দিয়া, তাহা-দিগকে চালান দিল। পাড়ার সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল! সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"হায়! একি সত্য—না পাকচক্র।"

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মঞ্জুর।

এ মোকর্দ্দমার প্রধান আসামী হইলেন—পণ্ডিত রামনিধি আর অপরের আসামী হইলেন—মোক্ষদা ও তদীয় পুত্র অনাথনাথ। পুলীশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফরিয়াদি না হইলেও মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। বদ্ধপরিকর হইয়া ফরিয়াদি হইল—রমজান সেখ,—সে বহু-দিনের গাত্রদাহ মিটাইবে. খুনী রামনিধি যেমন তাহার বাসনাপূর্ণ করিবার অন্তরায় ঘটাইয়াছিল, এইবার তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইবে বলিয়া—আনন্দে আটখানা হইতে লাগিল। তুমুল মোকর্দ্দমা, রমজান অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিল।

শান্তিরাম পীড়িত—বন্ধুর বিপদে, তিনি কিছুই করিতে বা দেখিতে পারেন নাই কিন্তু যখন শুনিলেন—রামনিধি জীবন-মরণের পথে, তখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস কেন—রামনিধির ন্যায় পরম নিষ্ঠাবান্, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বিপ্র যে নিজ-কন্যাকে খুন করিবে—তাহা কথনই মনে লয় না—এও এক প্রকার ষড়যন্ত্র। সকলে বার বার শান্তিরামকে নিষেধ করিয়া বলিতেছে—যে আপনি তাহার পক্ষাবলম্বন করিবেন না। যখন লাস বাহির

হইয়াছে এবং তাহার কন্যার মৃতদেহ বলিয়া যখন সকলে সনাক্ত করিয়াছে—তখন আপনি অগ্রসর হইয়া পুলীশের বিপক্ষতাচরণ করিয়া একটা অনর্থপাত ঘটাইবেন না।" শান্তিরাম কাহারও কথা শুনিলেন না, বাধা মানিলেন না। তিনি জামিনের জন্য আবেদন করিলেন—শেষে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা জামিনে সপরিবার বন্ধু রামনিধিকে খালাস করিয়া আনিলেন। শান্তিরাম গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি, ধনে-মানে সকল বিষয়েই বড়, কাযেই আদালত তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া ব্রাহ্মণ পরিবারটীকে খালাস দিলেন। প্রাণ যাহা চাহিল, নিজে যাহা ভাল বুঝিলেন, শান্তিরাম তাহাই করিলেন। মনোহরপুরগ্রামে রামনিধির অনেক বন্ধু ছিল কিন্তু অসময়ে কেহই দাঁড়াইল না। শাস্ত্র বলেন,—"রাজদ্বারে শ্মশানে চ, য তিষ্ঠতি স বান্ধব", অতএব শান্তিরাম যে রামনিধির পরমবন্ধু, প্রাণে প্রাণে বন্ধুত্ব সংঘটন হইয়াছে—এ ঘটনায় তাহাই প্রকাশ পাইল। শান্তিরামের রোগ সারিয়া গেল, প্রাণে একটা তীব্র উৎসাহ, সাহস ও ধর্ম্মতেজ একত্র হইয়া তাঁহাকে সবল করিয়া তুলিল—বন্ধু-দম্পতীর বিপদ তিনি হাসিতে হাসিতে বুক পাতিয়া লইলেন।

মামলা মোকদ্দমা বুঝিতে শান্তিরাম বড় পটু। তবে ধর্ম্মপক্ষ না হইলে, তিনি যোগদান করিতেন না। এতদিন রামনিধির সহিত সহবাসে তিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে যতটা চিনিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহাকে নিষ্পাপ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস—কোন বিষম ষড়যন্ত্র যে বন্ধুকে এরূপ ভয়ানক বিপদের মুখে তুলিয়া দিয়া প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, শান্তিরাম তাহা বুঝিয়াই এ প্রবল-পক্ষের বিপক্ষতাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, অসহায়ের সহায় তিনি, অবশ্যই এ বিপদ-সমুদ্রে কুল দিবেন। শান্তিরাম সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। যখন তিনি যোগ দিয়াছেন—তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন ত বড় কম নহে—অনেক

শিক্ষিত, বুদ্ধিমানও রামনিধির পক্ষ সমর্থন করিয়া, তাঁহার অব্যাহতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

তদ্বিরের উপরই মোকর্দ্দমার জয়-পরাজয় নির্ভর করিয়া থাকে। বিপক্ষ-পক্ষ পুলীশের সাহায্যে খুব তদ্বির করিতেছে—ভাল ভাল উকীল দিতেছে—রমজানের অর্থের ত অভাব নাই! তাহার উপর এ মোকর্দ্দমায় পুলীশের একটা জেদ পড়িয়াছে। শান্তিরামও অবস্থানুসারে উকীল নিযুক্ত করিয়াছেন—বাহ্যিক বিষয়ে তিনিও ব্যবস্থার ত্রুটী করেন নাই—আর অন্তরে কেবল বিপত্তির মধুসূদন, অনাথ-শরণের শ্রীচরণ স্মরণ করিতেছেন—তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন। রামনিধি এখন একপ্রকার হতবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি-বিহীন, কি পাপে এ পরিতাপ আসিয়া জুটিল, সত্যসত্যই ত বিমলার শবদেহ বাহির হইয়াছে, তবে কি মা আমার নাই। পাষণ্ডগণ জানিতে পারিয়া সত্য সত্যই কি তাহাকে খুন করিয়া বাগানে পুতিয়া রাখিয়া আমার প্রতি বৈর-নির্যাতনের চেষ্টা করিতেছে—হা ভগবান! বৃদ্ধ-বয়সে এ কি করিলে ঠাকুর! হত্যার অপরাধে অপরাধী করিয়া প্রাণে মারিলে, জহ্লাদের হস্তে শেষে এই পবিত্র-প্রাণ নষ্ট হইবে, মৃত্যুকালে নীচ-জাতি এ পবিত্র দেহস্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে! হা ভগবান! করিলে কি? আজীবন সুখ কাহাকে বলে তাহাত জানিতে দিলে না, দারুণ কষ্টে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া একদিনের জন্যও তোমার প্রতি দোষারোপ করি নাই, এরূপ কষ্টের অবস্থায়ও হাসিমুখে তোমার বিধান মানিয়া চলিয়াছি, তাহাতেও কি তোমার মনঃপুত হইল না প্রভু! প্রাণ লইয়া টানাটানি, না তোমার জিনিস তুমি লইতেছ, তাহাতে দুঃখ নাই, সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিব; খুনী আমি—ধর্ম্মাধিকরণ ত তোমারই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, রাজরূপে তুমিই ত তাহার দণ্ড-বিধান করিবে, কর—তাতে আমি তিলমাত্র ভীত নহি। প্রাণময়! এ ক্ষুদ্র-প্রাণ বিশ্বপ্রাণে

মিশিবে, তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু প্রভো! ঐ বুদ্ধিহীন বালকটী আর ঐ সাধ্বী পতিব্রতা, ধর্ম্ম-প্রতিমা স্ত্রীলোকটী কি করিয়াছে, যে তাহাদের আমার সহিত জড়াইয়া ঘোর দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ করিতেছ! শান্তিময় শান্তি দাও, ঐ দুটী নিরীহ প্রাণীর জীবন-রক্ষা কর, তাহাদের বিপদ-খণ্ডন কর—বিপত্তারণ! রামনিধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—এই কয় দিনে তাঁহার দৈহিক পরিবর্ত্তন এত হইয়াছে যে—দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, কিন্তু তাঁহার নিজের জন্য কোন প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। জন্মাইলেই মৃত্যু, এক প্রকারে না এক প্রকারে প্রাণটা এ দেহ ছাড়িয়া যাইবেই, তবে এরূপ আর সেরূপ কি? মরিতে যখন হইবে—তখন আর ভয় কিসের, কিন্তু এই দুইটী নিরীহ প্রাণী আমার জন্য কালগ্রাসে পতিত হইবে কেন? তাহারা ত ইহার বিন্দু-বিসর্গও কিছু জানেনা। ভগবান! ইহাদিগকে এ কলঙ্ক হইতে মুক্তি দান করিয়া, যত কষ্ট আছে, আমার প্রতি আরোপ কর; আমি তোমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া যে শাস্তি-বিধান করিবে, তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিব।

জামীনে মুক্তির পর দুই দিন হইয়াছে, মোক্ষদা পাকাদি করিয়া স্বামীকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে, একবার উপবেশন করেন মাত্র—পঞ্চ-প্রাণকে পঞ্চগ্রাসমাত্র প্রদান করিয়াই উঠিয়া পড়েন—খাওয়া হয় না, প্রাণ আর পার্থিব কিছু আহার করিতে চায় না। আর ক'দিন; কেন আর বৃথা আহারের জন্য সময় নষ্ট করিয়া ভগবচ্চরণে বঞ্চিত হই। পত্নীর ও পুত্রের জন্য বসেন মাত্র, কিন্তু আহার না করিয়া উঠিয়া পড়েন নিভৃত একটী কক্ষে বসিয়া তন্ময় হইয়া থাকেন, সময়ে সময়ে বলেন,—"মোক্ষদা! এ বিপদপাত বড় মন্দ নহে, ভগবানে একধী হইবার এমন সুগম পথ আর নাই। আমার প্রাণের মায়া করিনা তবে তোমাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া দেহ নষ্ট হইতেছে।"

মোক্ষদা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন,—"আমাদের জন্য চিন্তা করেন কেন? অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাত হইবেই?"

রামনিধি। তাত জানি মোক্ষদা! তবে কেমন একটা মায়ার টান; স্ত্রী-পুত্রের কেমন একটা প্রাণ-ভরা মায়া, কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না।

বালক অনাথনাথ, চিন্তা কাহাকে বলে জানে না। সে কখন পাপে-তাপে রত নহে, দুশ্চিন্তা তাহার অন্তরে উদয় হইয়া কখন দেহ কালা করিতে পারে নাই। তাই অনাথের মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া মাত্র পতিত হয় নাই। সে পূর্ব্বে যেমন ছিল—এখনও ঠিক সেইরূপ আদুরে-গোপাল।

কেবল পিতামাতার বিরস-বদন দেখিয়া সময়ে সময়ে মাতাকে বলে,—"মা কপাল-ছাড়া পথ নাই। অত চিন্তা কিসের! বাবাকে ভাবিতে বারণ কর; ভগবান আছেন।" কিন্তু সে কথায় জননীর প্রাণ সান্ত্বনা মানে না। এ বিপদ যে তাঁহার প্রাণের দেবতা স্বামীর সহিত বিজড়িত। মোক্ষদা ত এ রহস্যের বিষয়—স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর পান না, বিষম দায়ে পড়িয়া মর্ম্মান্তিক-চিন্তায় সতী দিন দিন হীন-জ্যোতিঃ হইতেছেন।

শান্তিরাম দুই তিন দিন রামনিধির সহিত দেখা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই কেবল মোকদ্দমার তদ্বির লইয়া ব্যস্ত; কলিকাতার একজন ভাল উকিল মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া এবং একটী নিরীহ ব্রাহ্মণ-পরিবার মুসলমানগণের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া প্রাণে মারা যায় দেখিয়া, দয়া-পরবশ হইয়া অতি অল্প পারিশ্রমিকে মকদ্দমা হাতে লইয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের দয়া, নতুবা এমন উকীল কি অত অল্প পয়সায় স্বীকৃত হয়? শান্তিরাম তাই আজ আনন্দিত মনে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া সাহস দিতে আসিয়াছেন।

বন্ধুর দুঃখে কেমন করিয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হয়, শান্তি রাম তাহা জানিতেন; এই জন্য অসীম ত্যাগ-স্বীকার [illegible], তিনি এই মোকর্দ্দমায় অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। আলীপুরের যাবতীয় উকীল বিপক্ষ-পক্ষের সহায়তায় নিযুক্ত, সেখানে আর উকীল পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া শান্তিরাম বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভগবানের কৃপায় বিনায়াসে একজন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এই মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিয়াছেন—এই শুভ-সংবাদ দিবার জন্য এবং মাষ্টারের নিকট যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য রায়মহাশয় বন্ধু-ভবনে সমুপস্থিত হইলেন।

শান্তিরাম গৃহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র মোক্ষদা একখানি বসিবার আসন প্রদান করিয়া নির্জ্জন-গৃহ হইতে পতিকে ডাকিয়া দিলেন। রামনিধি বন্ধুবরের আগমন শুনিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ভাল করিয়া আহার না করিয়া রামনিধির শরীর-কান্তি অনেকটা মলিন হইয়াছিল কিন্তু প্রাণের তেজ কিছুমাত্র কমে নাই, মুখে তখনও তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। ধর্ম্মের তেজ কি জাগতিক বাধা-বিপত্তিতে কমিতে পারে? প্রথম প্রথম পুলীশের অত্যাচারে কথঞ্চিৎ ম্রিয়মান হইলেও জামিনে মুক্তি-লাভের পর তিনি এরূপভাবে প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে পুরিয়া রাখিতেছেন, যে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিবার পূর্ব্বে, তাহা অনায়াসে মহাপ্রাণে মিশিতে পারিবে।

রামনিধিকে প্রতিনমস্কার করিয়া শান্তিরাম নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন—"ভাই! এ কয়দিন তুমি বাটী হইতে বাহির হও নাই কেন?"

রামনিধি। ভাই! যখন তুমি আমার জন্য এরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিতেছ, প্রাণপণ করিয়া এ বিষয়ের তদ্বির করিতেছ, তখন আমার আর বাহির হইবার আবশ্যক কি? আর আমি চিরকাল বালক তাড়াইয়া

জীবন-যাপন করিয়াছি, মোকর্দ্দমা মামলার কি বুঝি বল, যদি একান্তই মরিতে হয়—তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া ভাল নয় কি?

শান্তিরাম। কে বলিল যে তোমাকে এই মোকর্দ্দমায় দণ্ডিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইবে?

রামনিধি। ভাই! তুমি বুঝো না, "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।" যখন রমজান পুলীশের সহিত পরামর্শ করিয়া কায করিতেছে, যখন বিমলার ন্যায় একটী শবদেহ সকলের সমক্ষে বাহির হইয়াছে, তখন অব্যাহতি না হইলেও হইতে পারে, আর তুমি ত বিমলাকে আনিবার জন্য মাষ্টারের কাছে লোক পাঠাইয়াছিলে, তিনি ত হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন খুনই যে সত্য নয়, তা কে বলিবে, তবে খুনী যে হউক না কেন, তাহা প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে।

শান্তিরাম কতকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"উহা বিষম চক্রান্ত, সত্যসত্যই কি পাষণ্ডেরা পথিমধ্যে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিয়া, তোমার উপর দোষ চাপাইল? আমার ভগ্নীপতি ত মাষ্টারের সন্ধানে গিয়াছিল, কিন্তু তথায় ত কোন সন্ধান পায় নাই—তাহারা গেল কোথায়—এ যে বিষম প্রহেলিকা, এত করিয়া শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া শেষে কি মাষ্টারের গ্রাসে তুলিয়া দেওয়া হইল? অথবা এই বেটারাই পথে খুন করিল?"

রামনিধি। যদি প্রথমটা সত্য হয়, তাহা হইলেত কতকটা রক্ষা, যবনের উপভোগ্যা না হইয়া যদি বিমলা মাষ্টারের ন্যায় সদ্ব্রাহ্মণের করতলগত হয়, তাহা হইলে ত তাহার একপ্রকার সুকৃতি বলিতে হইবে, কিন্তু আমার বোধ হয়—এত করিয়াও তাহার দুষ্কৃতি নাশ করিতে পারা যায় নাই—পথিমধ্যেই বেহাত হইয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইয়াছে। কিছুতেই সম্মত করিতে না পারায় দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে হত্যা করিয়া হলুদ-বাগানে পুতিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়াছে। এইজন্য বলি—ভাই! কেন

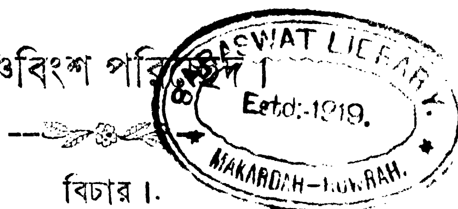
তুমি এ হতভাগ্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছ, কেন এ বৃদ্ধ-বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়িয়া অনবরত বৃথা কাযে সময় নষ্ট করিতেছ—এ মোকর্দ্দমায় যে কিছু করিতে পারিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

শান্তিরাম। আমি জানি ধর্ম্মপক্ষের জয় চিরদিন, অধর্ম্মপক্ষ কখনই জয়লাভ করিতে পারে না। দেখাই যাক্ না, ভগবান কি অকূলে কূল দিবেন না, তিনি কি এতই নিষ্ঠুর, তোমার এ অসময়ে আমার দুরারোগ্য ব্যাধি যখন নিরাময় হইয়াছে, আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—"হা ভগবান! বন্ধুর এ দুঃসময়ে আমাকে শয্যাগত করিয়া না রাখিলে, তোমার নামস্মরণ করিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতাম।" কথাও যা কার্য্যও তাই, যখন সেদিন হইতে আমি বেশ সবল ও সুস্থ হইয়াছি, তখন ভগবান যে ইহা হইতে অব্যাহতি দিবেন না—তাহা তোমাকে কে বলিল? ধার্ম্মিকের বিপদ হয়—ভগবানে তাহাকে শক্ত, দৃঢ় এবং আরও আসক্ত করিতে। তুমি মুহ্যমান হইও না, আমার বোধ হয়—ইহা তাহাই, অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়া সুবর্ণের যদি কিছু মলিনত্ব থাকে, তাহাই নাশ করা উদ্দেশ্য।

রামনিধি আত্মপ্রশংসা শুনিতে চিরদিনই অনিচ্ছুক—কেহ কহিলে তথা হইতে সরিয়া যাইতেন। শান্তিরাম রামনিধিকে বিশেষভাবে চিনিয়াছিলেন,—রামনিধি যে দেবদ্বিজ উন্নতি-সাধক, বিপদে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন—ত্যাগের জলন্ত-প্রতিমূর্ত্তি—শান্তিরাম অনেক বিষয়ে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুরারোগ্য ব্যাধি, বহুবিধ চিকিৎসায় এবং স্থান-পরিবর্ত্তনে উপশমের পরিবর্ত্তে কেবল প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতেছিল; রামনিধির একদিনকার জপযজ্ঞে তাহার পনর আনা উপশম হইয়াছে, ছিল একআনা, এই বিপদে পড়িয়া —পুলীশের হাপাজতে থাকিয়া—তাহা আর করিতে পারেন নাই। কিন্তু চিরকৃতজ্ঞ রামনিধি কায়মনে ভগবানকে ডাকিয়া—যে মন্ত্র তাহাকে জপ

করিতে বলিয়াছিলেন—শান্তিরাম তাহা জপমালা করিয়া অগ্নিতে জলসেকের ন্যায় সদ্য শান্তিলাভ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সাধনার শক্তি আর কি হইতে পারে? এই জন্যই তাঁহার প্রাণ রামনিধির জন্য এত কাতর, এমন একজন বেদজ্ঞ-ধার্ম্মিক-সাধক, মুসলমানের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে, মানুষ হইয়া কি তাহা সহ্য করা যায়? তাই শান্তিরামের এত প্রাণপণ, তাই এত ত্যাগ-স্বীকার! এখন অপর সকলের ও ইচ্ছা রামনিধি অব্যাহতি লাভ করুন, পরোপকারী শান্তিরামের অধ্যবসায় সফল হউক।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।



বিচার।

আজ পণ্ডিতের বিচারের দিন, আদালত লোকে লোকারণ্য। পণ্ডিত রামনিধিকে যাহারা ভাললোক বলিয়া জানে—যাহারা তাঁহাকে ভক্তি করে—তাহারা তাঁহার এই দারুণ বিপদে হা-হুতাশ করিতেছে, দেবতার নিকট তাঁহার অব্যাহতির জন্য কত প্রার্থনা করিতেছে; আজ আদালতে আসিয়াও তাহারা ব্যস্ততা সহকারে উকীল-মোক্তারের পরামর্শ লইতেছে, বিচার-ফল দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

করোনারের রিপোর্টে প্রকাশ—বিমলার দেহ অস্ত্রাঘাতেই হত্যা করা হইয়াছে। রমজানের একজন লোক সাক্ষ্যপ্রদান করিল,—"যে সে ঐদিন গভীর-রাত্রে রামনিধিকে রক্তাক্ত-কলেবরে দা হস্তে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে; রমজান নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছে যে পণ্ডিতের কন্যা খুব রূপসী, শুনিয়াছি তাহার স্বামী নাই। তাহার চরিত্র দূষিত হইয়াছিল

বলিয়া, পণ্ডিত তাহার উপর বড়ই বিরক্ত, তাহাকে প্রায়ই শাসন করিত,—ভাল খাইতে-পরিতে দিত না, হিন্দু-বিধবার মত রাখিত কিন্তু খুবসুরত চেহারায় সে সেরূপ-ভাবে থাকিতে রাজী হইত না, তাই বাপে ঝিয়ে প্রায়ই বচসা হইত, মাও মেয়েকে দেখিতে পারিত না।"

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মুসলমান হইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরের সংবাদ কেমন করিয়া জানিলে, তাহারা ত আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাপে-ঝিয়ে ঝগড়া করিত না?"

রমজান। আমি পণ্ডিতকে টাকা ধার দিয়াছিলাম, ঐ টাকার তাগাদার জন্য যখনই উহাদের বাটী যাইতাম—তখনই দেখিতাম মেয়েটা কাঁদিতেছে; হয় পণ্ডিত না হয় পণ্ডিতের জরু তাহাকে কেবল গালাগালি দিতেছে। আমি বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে সদর দরজা অবধি যাইলেই তাহারা থামিয়া যাইত।

হাকিম। তুমি বাহির হইতে ডাকিবার সময় ভিতরের বিষয় কেমন করিয়া দেখিতে পাইতে?

রমজান। সদর-দরজা এমনি ভাবে প্রস্তুত যে তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের অনেক জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উকীল। তুমি যে দিন তাগাদায় যাইতে, সেই দিন ঠিক এক স্থানেই কি তাহাদের ঝগড়া দেখিতে পাইতে?

রমজান। না, নানাস্থানে।

উকীল। বাহির হইতে ভদ্র-গৃহস্থের বাটীর সকল স্থান দেখিতে পাওয়া অসম্ভব।

রমজান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"যখন ডাকিয়া সাড়া পাইতাম না, তখন আমি বাটীর ভিতর ঢুকিয়া যাইতাম।"

রমজানের সাক্ষ্য-প্রদান শেষ হইলে, পুলীশের রিপোর্ট দেখা হইল—তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল।

প্রথম দিনই আসামীর জবানবন্দীতে হাকিমের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহার স্ত্রীপুত্র এ বিষয় বিন্দু-বিসর্গও জানে না, তাহারা ইহাতে সহায়তা করে নাই—বা লিপ্ত ছিল না। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীগণের এজাহারেও ইহাদের দুইজনের নাম-গন্ধও কিছু পাওয়া গেল না; কাযেই মোক্ষদাদেবী ও পুত্র অনাথনাথ সেইদিনই অব্যাহতি পাইলেন।

আসামীকে দেখিয়া প্রথম হইতেই হাকিমের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছে। এমন নম্র-প্রকৃতি, এরূপ সৌম্যমূর্ত্তি ব্যক্তি কখন কি খুনের আসামী হইতে পারে? এরূপ লোক কি নিজের কন্যাকে খুন করিয়া পুতিয়া রাখিতে পারে, ইহার বাহিক প্রকৃতি দেখিয়াও কোন সন্দেহ করা যায় না। খুনের আসামীর প্রকৃতি কত উগ্র, খুন করিলে তাহার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আত্মগ্লানী, একটা বিষাদভাব আসিয়া থাকে—ইহাতে ত তাহার কিছুই নাই, কিন্তু তিনি কি করিবেন—সমস্তইত প্রমাণের অধীন। লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুন করিয়া মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়াছে। করোনারের রিপোর্টে ইহাত স্পষ্ট প্রকাশ, পুলীশের রিপোর্টে দারোগা প্রভৃতির চাক্ষুস প্রমাণও রহিয়াছে, যেসকল সাক্ষী গ্রহণ করা হইল, তাহারা সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করিল যে পণ্ডিতকে তাহারা রক্তাক্ত কলেবরে দা হস্তে ঘুরিতে দেখিয়াছে। তাহার বিপক্ষে যখন এত প্রমাণ-প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন আসামীকে নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস দেন কেমন করিয়া?

দ্বিতীয় দিনও তিনি আসামীপক্ষের সাক্ষীর তলপ করিলেন, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। সে সাক্ষ্য তত বিশ্বাস-যোগ্য নহে, তাহারা সকলেই প্রায় শুনা-কথায় সাক্ষ্য দিল। এ পক্ষের বড় উকীল মনমোহন বাবু বড় আশা করিয়া আসামীকে খালাস দিয়া নাম কিনিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন—লাস বাহির হইয়াছে, বিপক্ষ-পক্ষের সাক্ষীগণ সমস্তই পাকা, জেরায় কেহ

ঘটিতেছে না, তখন আর উপায় কি? রামনিধির পক্ষের উকীল ও তদ্বির-কারকগণ সকলেই ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিলেন। নিজের ও পুত্রের অব্যাহতিতে পতিগতপ্রাণা মোক্ষদার কিছুমাত্র শান্তি নাই। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। দেবতার ভোগ প্রদানের জন্য, স্বামীপুত্রকে আহার করাইবার জন্য পাকাদি করিতেন, তাঁহাদের দিতেন, রামনিধি প্রথম প্রথম আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর তাহা করেন না, যাহাদের জন্য তাঁহার বিষম ভাবনা ছিল, ভগবৎকৃপায় তাহারা যখন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় খালাস পাইয়াছে—তখন আর ভাবনা কিসের? নিজের জন্য ত তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয় নাই; জন্মাইলেই যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যুর মত নিশ্চিত বিষয় যখন আর কিছুই নাই; তখন পণ্ডিত রামনিধি তাঁহার জন্য চিন্তা করিবেন কেন? এক প্রকারে না একপ্রকারে দেহ ত পাত হইবেই; তবে লোকে বলিবে—পাষণ্ড কন্যাকে খুন করিয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিয়া মরিল, কিন্তু তাহাতে আমার হাত কি? অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই, অদৃষ্টে যদি দুর্নাম রটনা বা ফাঁসী থাকে ত রোধ করিবার সাধ্য কার?

তৃতীয় দিবস মোকর্দ্দমার যাবতীয় অবস্থা বুঝিয়া নবাগত হাকিম শ্যামাচরণ বাবু নিজে কোন মত প্রকাশে অনিচ্ছুক হইয়া আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। অবস্থা দেখিয়া তিনি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন—তাহাতে আসামী নির্দ্দোষী বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। খুনী ব্যক্তির বদন-মণ্ডল কখন ঐরূপ প্রশান্ত হইতে পারে না। একজনের প্রাণ হনন করিলে নিজপ্রাণে একটা ধিক্কার হইবেই হইবে, বিশেষতঃ নিজ-কন্যাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া প্রাণের এমন আনন্দভাব কাহারও মুখ ফুটিয়া কখন বাহির হইতে দেখা যায় নাই—

আমি আজীবন কতস্থানে কত বিচার করিয়াছি কিন্তু এরূপ কখন দেখি নাই। শ্যামাচরণ বাবু মোকদ্দমার কোন শেষ সিদ্ধান্ত না করিয়া কোন রায় প্রকাশ না করিয়া শেসন-সোপর্দ্দ করিলেন দেখিয়া, সকলেই প্রমাদ গণিল। দেশীয় লোকের বিচারে দণ্ড-লাঘবের আশা কতকটা ছিল, শেসনে যে সাহেব জজ, সেখানে কি বিচারে দণ্ড-লাঘবের আশা আছে? তথাপি সকলেই প্রাণপণে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই সমান, কাহারও পক্ষে নৈরাশ্য আসিয়া পথাবরোধ করে নাই। রমজান সেখ "বিষকুম্ভ পয়োমুখ", মুখে বলে আমি কিছু জানি না, কিছুই করিতেছি না, মিষ্ট কথায় সকলের নিকট সাধু সাজিতে চেষ্টা করে, ভিতরে কিন্তু হারামের জরী, ক্ষার-মণ্ডিত হীরক-ফলকের ন্যায় কায করিতেছে, তাহার সকল চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে, অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে।

মোকর্দ্দমা শেসনে উঠিল—রমজান অর্থবল সম্বল করিয়া মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য যেমন প্রাণপণ করিতে লাগিল, আসামীপক্ষও তদ্রূপ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে পণ্ডিত অব্যাহতি লাভ করেন—যাহাতে নির্দ্দোষ প্রমাণ হইয়া মানের সহিত মুক্তিলাভ করিতে পারেন—তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। শান্তিরাম যেন উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, তিনিও জলের মত অজস্র টাকা খরচ করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। একজন অপরিচিত ব্যক্তির বিষম বিপদ মাথা পাতিয়া লইয়া শান্তিরাম শেষে স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না, প্রকৃত বন্ধুত্বের টান এমনি আত্মবিস্মরকর। রামনিধি দোষী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, অনেকেই বলে—যদি খুন না করিল ত বিমলা গেল কোথায়, তাহাকে বাহির করুক, কুলটা বলিয়া কন্যাকে যে সে খুন করিয়াছে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই—তাই

তাহারা মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"রায়মশাই! করেন কি? একটা কন্যাহন্তা মহাপাপীর জন্য আপনার এতটা করা ভাল দেখায় না।" রায়মশাই কিন্তু আপনার মতানুযায়ী কায করিতে লাগিলেন। কাহারও কথায় কাণ দিলেন না।

শেসনে তুমুল মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। চারিজন নিরপেক্ষ ভদ্রলোক জুরী নির্ব্বাচিত হইয়া জজের সহিত বিচার করিতে বসিলেন, কিন্তু যখন লাস পাওয়া গিয়াছে, সাক্ষীগণ যখন সকলেই এক-বাক্যে রামনিধিকে খুনী বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে, তখন তাহার কি আর শাস্তি না হইয়া থাকিতে পারে? শেসনে কয়েকদিন মোকর্দ্দমার অবস্থা বুঝিয়া আসামী পক্ষের উকীল নিরাশ হইয়া পড়িলেন। শান্তিরাম ও তাঁহার পক্ষীয় জনগণের আর বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না, পরশ্ব তারিখে রায় প্রকাশ হইবে শুনিয়া আসামীপক্ষ বিষাদ-মলিন মুখে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ফরিয়াদিপক্ষের জয়োল্লাসের সীমা রহিল না। মোক্ষদা মোকর্দ্দমার অবস্থা শুনিয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—এমন ধার্ম্মিক-পিতাকে আগামী পরশ্ব চিরতরে হারাইতে হইবে ভাবিয়া বালক অনাথনাথ ডাকছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তিরাম বন্ধুর সহিত শেষ দেখা করিতে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, রামনিধির মুখে বিষাদের লেশমাত্র নাই—তিনি বন্ধুকে বুকে ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই! প্রত্যেক কার্য্যই দৈবাধীন, পুরুষকারও দৈব-সাপেক্ষ, তবে করিতে হয় বলিয়া তুমি আমার জন্য যেরূপ করিয়াছ, তাহা অতুলনীয়,—মানুষে কখন করিতে পারে না, দেব-হৃদয় তুমি, শোক করিও না, মৃত্যুত যেরূপে হউক হইবে, তাহার জন্য অধৈর্য্য হইবে কেন? যাহা করিবার তাহা ত করিয়াছ, তদ্বির করিতে কিছু মাত্র ত্রুটী কর নাই, আমার ন্যায় মহাপাপীর জন্য তুমি অকাতরে সর্ব্বস্ব পণ করিলে, ভগবান তোমার এ সাধু-সঙ্কল্পের পুরস্কার প্রদান

করিলেন না ; বোধ হয়, এইরূপে আমার মৃত্যু হওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কি করিবে ভাই ! এখন দুই একদিন যাহা আছি, এস হাসি-মুখে ভগবানের নাম গান করিয়া দেহ-মন পবিত্র করি।” এত দৃঢ়চিত্ত কার ? প্রাণ এরূপ ধর্ম্মবলে বলীয়ান কে করিতে পারিয়াছে যে, আসন্নমৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিমুখে ভগবানের নাম করিতে জিহ্বা সবল করিবে ?

শান্তিরাম, মোক্ষদা বা পুত্র অনাথনাথ কিছুতেই তাহা পারিল না। সতীস্ত্রীর স্বামীই যে সব, তাঁহার আসন্নমৃত্যু স্মরণ করিয়া কি তিনি আনন্দে মত্ত হইতে পারেন ? তথাপি স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। রামনিধি পূজায় বসিলেন. সে দিনের পূজা এক স্বতন্ত্র প্রকারের, তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণ নাই, পুষ্প-চন্দনের অঞ্জলী প্রদান হইল না, কেবল জপে চিত্তস্থির করিয়া ইষ্টদেবতার চরণে আত্ম-নিবেদন, প্রাণ-পরিক্রমণ এবং দেহ-বিসর্জ্জন ইত্যাদি ক্রিয়ায় পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করা হইতেছে। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, এ অশ্রু শোকাশ্রু নয়—আনন্দাশ্রু ; সাধক ভগবচ্চরণে বিলীন হইবার পূর্ব্বে যেমন তন্ময়, আনন্দময়, গভীর ভাবময় হন, রামনিধির এ অবস্থাও সেইরূপ, ক্ষণে ক্ষণে দেহ কণ্টকিত হইতেছে ; কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে—ষট্‌চক্রে পর পর অধিষ্ঠানে দেহ যেমন আনন্দ আপ্লুত হইয়া শিহরিয়া উঠিতে থাকে—রামনিধি সেইরূপ ভাবে অনবরত শিহরিতে লাগিলেন। সাধকের সহিত তদীয় সহচরগণ তেমনি ভাবমুগ্ধ হইয়া স্পন্দহীনভাবে বসিয়া রহিল—তাহারাও অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য জাগতিক সমস্ত চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কি এক আত্মনির্ভরভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইল। বিপদে কূল না পাইয়া, পুরুষকারের বলে সমস্ত কার্য্যে হতাশ হইয়া মানুষ যখন এইরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তখন দেবতা আর

১৬১]

থাকিতে পারেন না, দৈবের আসন তখন টলটলায়মান হইয়া সাধকের হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত করত একটা আশার, একটা উৎসাহের, একটা অমিত শক্তির প্রবল-বন্যা তাহাতে প্রবাহিত করাইয়া দিয়া তাহার প্রাণটাকে এত দৃঢ়, এত শক্ত, এত শক্তিসমন্বিত করে, যে তখন সে আর ত্রিজগতের কোন প্রকার শাস্তিকে, কোন প্রকার বিপদকে গ্রাহ্য করে না। অচল অটলভাবে সে সমস্ত অকাতরে সহ্য করে, কাতরতা তাহার প্রাণের নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। সমস্ত দৈত্য-শক্তির প্রবল উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তাই হরিভক্ত প্রহ্লাদ তিল মাত্র কাতর হন নাই—অম্লান-বদনে সমস্ত উৎপাত সহ্য করিয়া জগৎকে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সাধকের আত্মনির্ভর-শক্তি বদ্ধমূল হইলে, প্রাণে প্রাণময়ীকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে—ভয় বলিয়া কোন পদার্থ আর তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে না, নির্ভর করিয়া তাহার অন্তর যে চিরকালের জন্য নির্ভর হইয়াছে—তাহার আর ভয়জনিত অশান্তির আবেগ আসিবার আশা কোথায়?

রামনিধি অকস্মাৎ এই বিপদে পড়িয়া প্রথম আকুল হইয়াছিলেন—তারপর তাঁহার অন্তর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে এরূপ দৃঢ় হইল, ভগবানে চিত্তস্থির করিয়া এরূপ আনন্দময় হইল—যে ভাবী বিপদ, মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁহাকে শঙ্কিত করিতে পারিল না। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল, সকলেই তাঁহার হাসি-মুখের ভয়শূন্য ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।



বিপরীত বিপত্তি।

আজ রায় প্রকাশের দিন। উভয় পক্ষই আগ্রহান্বিত হইয়া আদালতে আসিয়াছে। অদৃষ্টদেবী কাহার অদৃষ্টে কিরূপ ফল প্রদান করিবেন—একপক্ষ মোকর্দ্দমা জিতিয়া হাসিমুখে বাটী ফিরিবে, আর একপক্ষ মোকর্দ্দমা হারিয়া, দণ্ড স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, খুনের আসামী রূপে সাব্যস্থ হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিবে, চিরকালের জন্য এ সংসার ত্যাগ করিবে। যাহাদের মোকর্দ্দমার ফলাফল ভাল বলিয়া বিবেচনা হইয়াছে—তাহারা হাসিমুখে বেড়াইতেছে, আর যাহারা বুঝিয়াছে মোকর্দ্দমার ফলাফল ভাল হইবে না,—তাহারা বিষণ্ণবদনে কেবল ভগবানের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে।

বিচারালয়ে আজ আর লোক ধরে না—এরূপ মোকর্দ্দমা তাহারা কখন দেখে নাই, তাই শেষফল দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। রামনিধি চিরকাল ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত—সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে—কিন্তু আজ তিনি খুনের দায়ে পড়িয়াছেন, এই ধর্ম্মসেবার ভিতর কিরূপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা। রমজানের পক্ষই জয়লাভ করিবে, কারণ ইহাদের মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, পুলীশ লাস বাহির করিয়া সকলের সাক্ষাতেই তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

বাঁকাউল্লা দারোগা খুব বিচক্ষণ কর্ম্মচারী—পুলীশ বিভাগের কার্য্যে তাঁহার গুণপণা অশেষ প্রশংসার যোগ্য; রামনিধিকে তিনি ভাল লোক বলিয়া জানিতেন, কিন্তু যখন লাস বাহির হইল এবং বিমলাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন কন্যার চরিত্রদোষের

জন্য রাগের বশবর্ত্তী হইয়া রামনিধির খুন করা অসম্ভব নহে। রমজান প্রভৃতি অনেকে যখন দেখিয়াছে—এবং তাহারা ফরিয়াদি হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতেছে—তখন আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

বেলা বারটার সময় সাহেব হাকিম আদালতে আসিলেন এবং খাস্-কামরায় জুরীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। দুইজন ভাল জুরী খুনের পক্ষে সন্দেহ করিলেন—আর দুইজন জজের সহিত একমত হইয়া বলিলেন—যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জজসাহেব বেলা একটার সময় নিজের আসন পরিগ্রহ করিলেন। একজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। জজ সাহেব রায় প্রকাশের পূর্ব্বেও আসনে বসিয়া আর একবার সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জনমণ্ডলী সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছে, কখন কি বলেন, কি ভাবে রায় প্রকাশ করেন, তাহা শুনিবার ও দেখিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব, জনতা এত নীরব ও নিস্তব্ধ যে একটী আলপিন পতনের শব্দেও সকলকে চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। কেহ নড়ে চড়ে নাই—স্থান পরিত্যাগের ইচ্ছা কাহারও নাই, যেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—ঠিক সেই ভাবেই অবস্থিত, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের অবসর বা স্থান নাই, জনতা এত বেশী। আদালতের পেয়াদা সময়ে সময়ে অতি ধীরে দুই একজনকে কর্কশ বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়া বাহির করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাও এত সন্তর্পণে যে হুজুরের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিতেছে না। হুজুর কলমের পশ্চাৎভাগ দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া গভীর চিন্তামগ্ন, জনসঙ্ঘও গভীর নীরব।

ঠিক বেলা দুইটা, রায় প্রকাশ হয় হয়, এমন সময় বাহিরে একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল, সেই ক্রন্দনধ্বনি ক্রমশঃ এজলাসের

মধ্যে আসিতে লাগিল। দায়রা-গৃহের সেই ভীষণ জনতার মধ্যে একটী যুবতী স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতেছে, "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার পিতা আমাকে খুন করেন নাই, আমি সুস্থ শরীরে এখনও বাঁচিয়া আছি।" যুবতী স্ত্রীলোকটী সবেগে সেই ভীষণ-জনতা ভেদ করিয়া হাকিমের আসন সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর! আমিই বিমলা—আমার পিতা আমাকে খুন করেন নাই, এই দেখুন আমি বাঁচিয়া আছি।"

একটা অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য সম্মুখে পাইলে, লোকে যেমন অতীব আগ্রহের সহিত ঠেলাঠেলি করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে—কিসে অগ্রে দেখিতে পাইবে বলিয়া জনতার মধ্যে আত্মবল প্রয়োগ করে, এক্ষেত্রেও সেই ভাব—সকলেই আগ্রহ-সহকারে "কে এ রমণী" দেখিবার জন্য নানাসূত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল,—যাহারা নিকটে ছিল, রমণীকে দেখিয়া সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এই যে বিমলা, এই যে পণ্ডিত মহাশয়ের মেয়ে বিমলা; হায় হায়! তুই এতদিন কোথায় ছিলি গো! তোর বাপ যে যায়!"

রমণীকণ্ঠ হইতে করুণ চিৎকারধ্বনি হইল, "ওগো! তোমরা আমার বাবাকে রক্ষা কর—হুজুরকে বল, আমি খুন হই নাই—আমি জীবিত!"

জজসাহেব একজনকে যমের মুখে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন—চক্ষু মুদিত করিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনাগুলি একবার তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়া লইতেছিলেন—এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আসন পার্শ্বে রমণীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইলেন। জুরীগণ সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন—একি! এই যে পণ্ডিত রামনিধির মেয়ে বিমলা, যাহারা তাহাকে চিনিত তাহারা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ধন্য ভগবান, ধন্য তুমি, আজ একজন ধার্ম্মিকের প্রাণরক্ষা

করিলে।" তারপর হাকিমের প্রতি চাহিয়া সকলে সমস্বরে বলি "হুজুর! এই দেখুন—পণ্ডিতের কন্যা বিমলা আসিয়াছে; সে খুন হয় নাই, সে সুস্থ শরীরে জীবিত রহিয়াছে।"

উপস্থিত জনগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না—তাই এ উহার ঘাড়ে পীঠে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কেহ বা জানালার উপর উঠিয়া উঁকি মারিতে লাগিল; এ বিষম নীরব জনতার মধ্যে একটা ভয়ানক চঞ্চলতা, একটা বিষম আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। অনেকেই রমণীকে দেখিয়া বলিল, "এই যে পণ্ডিতের মেয়ে বিমলা, তুই এতদিন কোথায় ছিলি মা!" আসামী পক্ষের তদ্বিরকারকগণ এবং শান্তি-রাম ও উকীল মনমোহন বাবু—এইবার ভীষণ তেজে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাকিমকে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আদালতময় একটা সজীবতার আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল। আসামী কাটগড়ার মধ্যে আবদ্ধ, তাঁহার চৈতন্য ছিল না; কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মরণের কোলে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; তাঁহার অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাইবে—এইজন্য সাধক রামনিধি নিবিষ্টচিত্তে সেই চিৎ-বিহারী মধুসূদনের পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। বাহিরের এত কোলাহল, এত জয়োল্লাস তাঁহার কর্ণে আদৌ প্রবিষ্ট হয় নাই। শান্তিরাম যখন এই আনন্দ সংবাদ, সহসা বিমলার আগমন সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন—তখন তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল—একবার মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"বিমলা! মা আমার, এতদিন কোথায় ছিলি মা!" বিমলা ধার্ম্মিক পিতার সেই দুরবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া "বাবা! বাবা! এদশা তোমার কে ক'রলে গো!" বলিয়া, একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। শান্তিরাম প্রভৃতি সকলে—জনতার একটু হ্রাস করাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন—শীতল জল মস্তকে ও বদনে প্রদান করা হইল।

হাকিম ব্যাপার দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন—আমূল এই বিষম ষড়যন্ত্রের বিষয় ভাবিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছে, একটী নিরীহ জীব যে তাঁহার অন্যায় বিচারে—মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই—ভগবান যে নির্দ্দোষীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন এই ভাবিয়া ন্যায়বান বিচারপতি তাঁহার চরণ উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম করিলেন এবং আদেশ করিলেন,—"গৃহের সমস্ত দ্বরজা বন্ধ করিয়া দাও, একটী লোকও যেন বাহিরে যাইতে না পারে।" হুজুরের হুকুম তৎক্ষণাৎ মান্য করা হইল; পেয়াদাগণ তৎক্ষণাৎ দ্বরজা বন্ধ করিয়া দিল, কাহাকেও গৃহের বাহির হইতে দিল না, ইত্যবসরে বিমলার চৈতন্য সম্পাদিত হইল। হাকিম সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটী যে রামনিধির কন্যা—তাহা আপনারা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন কি?" জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া সমস্বরে উত্তর হইল,—"হাঁ হুজুর! এই-ই রামনিধির কন্যা—ইহা আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি। শুধু আমরা কেন, যাহাকেই দেখাইবেন—সেই বলিবে—ইনিই রামনিধির কন্যা—বিমলা!" হাকিম তথাপি মনোহরপুরের কয়েকজন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া বিমলাকে সনাক্ত করিতে বলিলেন,—সকলেই একবাক্যে বলিলেন—এ মেয়েটী যে রামনিধির কন্যা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জজ সাহেব এইবার মনমোহনবাবুরও দ্বারা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে এতদিন কোথায় গিয়াছিল?

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের অদৃষ্টের কথা সমস্ত বিবৃত করিতে লাগিল। রমজান যে তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল এবং কত প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারিয়া, তাহাদের ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য গুণ্ডার দ্বারা তাহাদের বাটীতে ঢিল ফেলিত, পথে ঘাটে নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল—এমন কি রাত্রিকালে ঘরের বাহির হইতে দিত না। আমাদের এই কষ্ট

দেখিয়া এবং আমার জন্যই এই অত্যাচার হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, আমার পিতার পরম বন্ধু শান্তিরাম বাবু আমাকে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ দিলেন—কিন্তু কোথায় যাইব, কাহার উপর বিশ্বাস করিয়া আমাকে তাহার নিকট পাঠাইবেন! পিতা মহাভাবনায় পড়িলেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

হাকিম। তবে তুমি কোথায়, কাহার সঙ্গে গিয়াছিলে?

বিমলা। এই সময় শান্তিরামবাবুর গৃহ-শিক্ষক, চাকরী হইতে রাজপুতানায় বদলী হইলেন—তিনি বহুদিন বাটীতে শিক্ষকতা করায় এক প্রকার বাটীর ছেলে পীলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম, তিনি আমার ভ্রাতা অনাথনাথেরও শিক্ষক ছিলেন। শান্তিরাম বাবু তাঁহাকে এই কথা বলায়, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার যাইবার দিন আমার পিসীমা ও আমি তাঁহার সহিত গমন করি।

হাকিম। তুমি এবং তোমার পিসীমা কখন তাহার সহিত গিয়াছিলে?

বিমলা। একদিন অন্ধকার রাত্রে আমরা তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। বাবা আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কয়েকদিন গাড়ীতে থাকিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম, কিছুদিন তথায় রহিলাম কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের সেখানে সুবিধা না হওয়ায়, তিনি পুনরায় জামালপুরে বদলী হইলেন—আমরাও তাঁহার সহিত জামালপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলাম।

হাকিম। এখানে যে তোমার পিতা এইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন—তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে এবং কোথা হইতে এখানে আসিলে?

বিমলা। আমরা জামালপুরেই ছিলাম—মাষ্টার মহাশয় নূতন বদলী হওয়ার জন্য কাযের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি না হওয়া পর্য্যন্ত পত্র দিতে

পারেন নাই, আর সহজভাবে পত্র দিলে পাছে প্রকাশ হইয়া আবার রমজানের নজরে পড়িতে হয়, এইজন্য মাষ্টার কোন লোকদ্বারা পত্র দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন—তাই এত বিলম্ব। প্রায় দেড়মাস দুইমাস কাটিয়া গেল, লোক পাওয়া গেল না—মাষ্টারের সেখানে থাকিবার তত ইচ্ছা ছিল না, হয়ত চলিয়া যাইবেন বলিয়াও পত্র দেন নাই। আমি তাঁহার সম্মুখে কখন বাহির হইতাম না, আমার পিসীমা তাঁহাকে ছেলের মত দেখিতেন। একদিন তিনি একখানি সুলভ সমাচার সংবাদপত্র ঘরের ভিতর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছিলেন, আমি দাওয়ায় বসিয়া পান সাজিতেছিলাম, পিসীমা অন্য ঘরে কাষ করিতেছিলেন। ঐ সংবাদপত্রে তিনি পড়িতেছিলেন,—"পণ্ডিত রামনিধি মেয়ে খুনের মামলায় পড়িয়া দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন, এখন রায় প্রকাশ হয় নাই, খুন প্রমাণ হইলে পণ্ডিতের ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা।" মাষ্টার মহাশয় বাবার নাম শ্যামাকিঙ্করই জানিতেন, দেশ ত্যাগ করিয়া আসিবার পর মনোহরপুরে তিনি রমজানের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ঐ নামেই অভিহিত হইতেন। আমার কাণে উহা পৌঁছিবামাত্র আমি কাঁদিয়া পিসীমার নিকট সমস্ত বলিলাম। পিসীমা মুসলমানের ষড়যন্ত্রের বিষয় বেশ জানিতেন, এইবার খুনের দায়ে ফেলিয়া বাবাকে প্রাণে মারিয়া আক্রোশ মিটাইবে বুঝিলেন। তিনি কাঁদিয়া মাষ্টারের নিকট উহা ভাল করিয়া শুনিলেন। মাষ্টার মহাশয়ও ভাল করিয়া পড়িয়া ব্যাপার গুরুতর বুঝিলেন, তিনি আর আমাদিগকে তথায় না রাখিয়া পিতার প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য সেইদিনই আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, আমরা এইমাত্র ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দৌড়িয়া আদালতে আসিয়াছি।

হাকিম। তোমার পিসীমা কোথায়?

বিমলা। তিনি রমেশ কাকার দোকানে বসিয়া আছেন। হাকিমের অনুমতি অনুসারে কয়েকজন লোক রমেশের দোকানে গমন করিল এবং

অবগুণ্ঠনবতী শ্যামাকে আদালতে হাজির করিল। হাকিম তাঁহাকে বিমলার কথার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন এবং পণ্ডিত রামানাথকে সসম্মানে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। হাকিমের ন্যায় বিচারের জয়োল্লাসে আদালত-গৃহ মুখরিত হইল।

এবার বিচারপতির আক্রোশ পড়িল ষড়যন্ত্রকারীদের উপর। উকীল মনমোহন বাবুও এতদিন কিছুই করিতে পারেন নাই, মোকদ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তবে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্য হইতে মোকদ্দমা যেরূপ সাজান হইয়াছে, যেরূপ সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমা কিছুতেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয় না, আসামীকে দণ্ড না দিয়াও থাকিতে পারা যায় না। মনমোহনবাবু মিথ্যা বুঝিয়াও প্রমাণাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না, দুঃখে-ক্ষোভে কেবল মর্ম্মযাতনা অনুভব করিতেছিলেন; এক্ষণে সমস্ত সত্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে; আর রক্ষা নাই, উকীল মনমোহনবাবু তীব্র তেজে পাষণ্ডগণের নষ্টামী, তাহাদের বিষম ষড়যন্ত্র, মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া একজন ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের প্রাণবধ করিতেছিল ইত্যাদি সমুদয়ই বিচারককে বুঝাইয়া বলিলেন, "হুজুর! আর দুই একদিন পরে যদি বিমলা আসিত, তাহা হইলে না জানি কি সর্ব্বনাশই হইত! আপনি ন্যায়বান বিচারপতি, ভাল করিয়া ইহার বিচার করুন।"

জজ সাহেব ষড়যন্ত্রের মর্ম্মভেদ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছেন। জগতে এমন দুর্বৃত্ত অধম প্রকৃতির মনুষ্য যে থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি রাগে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন মূর্ত্তিধারণ করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পিড়ন করিয়া হুকুম করিলেন,—"আভি বদ্‌মাস্ লোককো হিঁয়া হাজির করো।" অনুমতি পাইবামাত্র পুলীশ রমজান ও তাহার সহচরবর্গকে বন্ধনাবস্থায় হুজুরের সম্মুখে হাজির করিল। এক্ষেত্রে

পুলীশের প্রতি কোনও প্রকার দোষারোপ করা হইল না। কারণ পুলীশ দেশের শান্তিরক্ষক; বিশেষতঃ বাঁকাউল্লা দারোগা পুলীশের কার্য্যে চুল পাকাইয়াছেন, তিনি সম্মুখে যেরূপ বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথমতঃ খুন বাস্তবিক হইয়াছে কি না; তাহা জানিবার জন্য বিমলাকে দেখাইবার আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী পক্ষ তাহাকে দেখাইতে পারেন নাই; তারপর রমজান হলুদবাগানে লাস দেখাইয়া দিয়াছে, বিকৃত শবদেহ বিমলার মত বলিয়া অনেকেই সনাক্ত করিয়াছে এবং রমজান নিজে বহুসাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমা চালাইতেছে। সে একজন বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান, পাড়ার মধ্যে এমন একটা খুনের ব্যাপার তাহার অজানিত নহে, এই কারণে পুলীশ রামনিধিকে আসামী করিয়া চালান দিয়াছে। ইহাতে পুলীশের দোষ কি? যত দোষ চাপিল রমজানের স্কন্ধে হাকিম সাহেব তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াই অত্যধিক রাগে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"বদমাস্! তুম্‌কো হাম ফাঁসী দেনে মাংতা"?

রমজানের সমস্ত চাতুরী ধরা পড়িয়াছে, কাযেই সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না; হতভাগ্য মনে করিয়াছিল—অর্থের দ্বারা এ জগতে অসাধ্যসাধন হইতে পারে কিন্তু উপরে যে একজন সর্ব্বদর্শী আছেন, পাপ পুণ্যের বিচার যে তিনি অহরহঃ করিয়া জীবের ভাগ্যফল বিধান করিতেছেন,—মহাপাপী কামুক রমজান তাহা একদিনের জন্যও মনোমধ্যে স্থান দেয় নাই। তাই মনে করিয়াছিল—অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া সে ধার্ম্মিক রামনিধিকে খুনের দায়ে ফেলিয়া ফাঁসী দিবে, সে যেমন তাহার অভিলষিত ফললাভের অন্তরায় হইয়া বিমলাকে দেশান্তরিত করিল, এইবার তাহাকে পাকচক্রে ফেলিয়া প্রাণে মারিয়া নিজের গায়ের জ্বালা জুড়াইবে। কিন্তু পাপীর পাপ আশা পূর্ণ হইল না— বিধাতা ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন।

যে দোষে দোষী হইয়া পণ্ডিত রামনিধি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে যাইতে ছিলেন, ঠিক সেই দোষ ঘুরিয়া রমজানের ঘাড়ে চাপিল। হাকিম রমজানের ন্যায় পাষণ্ডের প্রতি সাতবৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ, আর একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মানহানীর জন্য অতিরিক্ত দুই সহস্র টাকা অর্থদণ্ড করিলেন, টাকা দিতে না পারিলে আরও তিন বৎসর ঐরূপ দণ্ডভোগ করিতে হইবে। রমজানের আরও পাঁচজন সহচরের প্রতি, চারি বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর ও এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা বাহাল হইল। পুলীশ তাহাদের হাতে হাতকড়ি দিয়া টানিয়া জেলে লইয়া গেল।

সকলে জজ সাহেবের বিচার শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। যেমন পাপ তেমনই তাহার শাস্তি হইয়াছে। শান্তিরাম হাসিমুখে বন্ধুকে লইয়া বাটী ফিরিলেন। বিপক্ষ পক্ষের মুখে চূণকালী পড়িল।

মোক্ষদা আজ প্রাতঃকাল হইতেই ঠাকুর ঘরে অনাহারে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সোণার প্রতিমা কালিমাময় হইয়াছিল। রক্তবর্ণচক্ষু জলে ভাসিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখে কেবল বলিতেছেন,—ঠাকুর! ধর্মের মান রক্ষা ক'রো, আমাদের জন্য যেন, তোমার দয়াময় নামে কলঙ্কপাত না হয়, ধর্মের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা না আসে। মধুসূদন! বিপদে রক্ষা কর, দাসীর আরাধ্য-দেবতাকে ফিরাইয়া দাও। প্রভু! বিনা দোষে যদি তাঁর দণ্ডাদেশ হয়, তাহা হইলে বুঝিব—তোমার অমোঘশক্তিও বদমাইসের প্রবলশক্তির নিকট হার মানিয়া যায়।" মনোহরপুর গ্রামের অধিকাংশ বাটীতেই আজ হাহাকার, রামনিধির মঙ্গলের জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়ন হইতেছে; শান্তিরামের বাটীতে প্রাতঃকাল হইতেই চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইয়াছে; সকলেই কায়মনে বলিতেছে,—"হে ধর্ম্ম! ধার্ম্মিক রামনিধিকে রক্ষা কর, সতী মোক্ষদার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

আষাঢ়ের সুদীর্ঘ বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই; ঠিক এই সময় গগনভেদী জয়োল্লাসে মনোহরপুর পরিপূর্ণ হইল। গবাক্ষ পথে রমণীগণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—ধর্ম্মের জয় হইয়াছে—রামনিধি সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, আর পাষণ্ড রমজান দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। শুভ সংবাদ বায়ুভরে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; যে শুনিল—সেই বলিল,—"এখনও ধর্ম্ম আছে—এখনও রাতদিন হইতেছে; এখনও গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে—এত অধর্ম্ম কি কখনও সহ্য হয়; যেমন কর্ম্ম ঠিক তেমনি ফল হইয়াছে। এক্ষণে মা ভগবতী যে সতী-লক্ষ্মীর মুখ রক্ষা ক'রেছেন—এই ভাল। আহা! বামুনের আজ দুইমাস কি কষ্টেই কাল কাটিয়াছে। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা না ক'রে কখন জল খায় না—এমন ধার্ম্মিককে কেউ কি বিপদে ফেল্‌তে পারে—তা হলে যে শাস্ত্র মিথ্যা হবে।" লোক মুখে ক্রমশঃ শুভবার্ত্তা রামনিধির বাটীতে ও শান্তিরামের অন্দরে প্রবেশ করিল,—শুধু এই শুভসংবাদ নহে, মৃতা বিমলাও এই সঙ্গে জীবিত হইয়া শ্যামার সহিত গৃহে আসিতেছে। অনাথনাথ আসিয়া অর্দ্ধমৃতা জননীকে যখন এই সংবাদ প্রদান করিল, তখন মোক্ষদা আনন্দে আত্মহারা, অঙ্গের বসনাদি ঠিক না করিয়া পাগলিনীর ন্যায় দরজার সম্মুখীন হইলেন। শান্তিরামের বাটীর সকলেই বিজয়দৃপ্ত রামনিধিকে দেখিতে বাহির হইলেন। সকলেই দেখিলেন—সেই একই তেজোময় মূর্ত্তি; সেই চিরপ্রশান্ত অনিন্দ্যসুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি—হাসিরাশী সুশোভিত হইয়া সঙ্গোপাঙ্গ সহ গৃহে আসিতেছেন। সম্মুখে মঙ্গলঘট; পুরোহিত ভগবতী চণ্ডিকার নির্ম্মাল্য লইয়া প্রথমেই ধার্ম্মিকপ্রবরকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রামনিধি আনন্দ গদগদ প্রাণে সকলকে যথাযোগ্য সাদর-সম্ভাষণ, আদর-অভিবাদন করিয়া গৃহে গমন করিলেন—শান্তিরামের এতদিনের

পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে; আজ যথার্থ একটী মহাত্মার প্রাণ-সঙ্কটে, তিনি তাঁহার অকিঞ্চিৎকর অর্থের সদ্ব্যয় করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মনোহরপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শান্তিরামের ত্যাগ স্বীকার, বন্ধুর প্রতি অকপট অনুরাগ, দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,—"এমন না হ'লে বন্ধু! সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অকপট বন্ধুত্ব রাখিতে কেবল শান্তিরামই শিখিয়াছিল।"

মোক্ষদা স্বামীকে সম্মানের সহিত অব্যাহতি লাভ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে হাসিমুখে বাটী ফিরিতে দেখিয়া ভগবানকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল—বোধ হয় বিমলা রমজানের দ্বারা খুন হইয়া মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়াছে। এক্ষণে বিমলা ও শ্যামাকে অক্ষত-শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ-দেহে বাটী ফিরিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণে যে কিরূপ আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আরাধ্য-দেবতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া পাষণ্ডগণ মসীময় করিয়াছিল—সর্ব্ব সমক্ষে ধর্ম্মাধিকরণের ন্যায় বিচারে তাহা আজ প্রক্ষালিত হইল এবং তৎসহ তাঁহার হারানিধি, আদরের দুহিতাকে ভগবান ফিরাইয়া আনিয়া দিলেন, দুর্বৃত্ত রমজানও কারারুদ্ধ হইল—এক্ষণে তাঁহারা নিষ্কণ্টকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ভাবিয়া মোক্ষদার হৃদয় আনন্দ-আবেশে দিশাহারা হইয়া পড়িল—জগতে এ আনন্দের কি বিনিময় হইতে পারে? আনন্দদাতা ভগবান এ আনন্দ যাঁহার দ্বারা ভোগ করাইলেন, সেই শান্তিরাম দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করুন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

প্রায়শ্চিত্ত।

ধর্ম্মকার্য্য ধার্ম্মিকেরই অঙ্গভূষণ—ধার্ম্মিক রামনিধি লোকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন—দারুণ কলঙ্কে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিচারে সে কলঙ্ক মোচন হইলেও, কয়েকদিন হাজত বাস জন্য তাঁহার পবিত্র ব্রাহ্মণ্যে দোষ পড়িয়াছে ভাবিয়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কোন প্রকার অখাদ্য ভোজন না করিলেও অন্যান্য পাপীর সহবাস-জনিত দোষ তাঁহাকে অপবিত্র করিতে পারে, এই ভাবিয়া পূর্ণাভিষিক্ত শাক্ত-ভক্ত সাধক রামনিধিও শাস্ত্রের বিধি বিধান মানিয়া চলিতে ইচ্ছা করিলেন। এ প্রায়শ্চিত্তে তাঁহার গুরুদেব পূর্ণানন্দকে আবশ্যক, কিন্তু তিনি কোথায়? বহুদিন হইতে শান্তিরামেরও সস্ত্রীক তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছা আছে কিন্তু এতদিন রামনিধির বিপদ পাতে তিনি সাতিশয় ব্যস্ত থাকায় অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় নাই। এইবার রামনিধির ইচ্ছা পূরণের সহিত তাঁহারও বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। তিনি অজয়ের তীরে তাঁহার সিদ্ধাশ্রমে লোক পাঠাইলেন--কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তিনি বহুদিন আশ্রম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, একবার একটী বসন্ত রোগীকে নিরাময় করিয়া সেই যে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন, তদবধি আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। গুরুর অদর্শনে কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে বিষম বিঘ্ন দেখিয়া রামনিধি বড়ই বিষন্ন হইলেন, শান্তিরামেরও আশার বুঝি মূলোচ্ছেদ হইল। বোধ হয় সাধক সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন আর ফিরিবেন না। কিন্তু প্রাণের টান একটা বড় টান, যাঁহাকে প্রাণে-প্রাণে টানা যায়, মনে-প্রাণে যাঁহাকে ডাকা যায়, ভক্তের নিকট তাঁহার

আবির্ভাব ত স্থির নিশ্চয়; মনে প্রাণে ডাকিয়া কে কবে দেবতার দর্শন না পাইয়াছে? ভক্তিভরে প্রাণের মধ্যে পূজা করিয়া কোন্ ভক্ত ইষ্ট দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছে? প্রাণের ধনকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে, তাঁহার উপস্থিতি নিশ্চয় সিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

একদিন রজনীর গুরু গম্ভীর যামে দুই বন্ধুতে বাহির্বাটীর একটী গুপ্ত-গৃহে, বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, শান্তিরাম বলিতেছেন,—"ভগবানের দর্শন কেমন করিয়া পাওয়া যায়। তুমি বলিতেছ পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও সময়ে সময়ে সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। মনে হয় যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া, শরীরকে বল্মীকে পরিণত করিয়াও সাধক যাহা করিতে পারে না, আর একবার মাত্র প্রাণভরিয়া ডাকিলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়?" রামনিধি বলিলেন,—তপস্যাও ত তাঁহাকে ডাকা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ডাকটীকে ভাল করিয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিয়া লইবার জন্য তপস্যার আবশ্যক; কিন্তু তুমি যদি গুরুর কৃপায় তাহা সহজেই স্ফূর্ত্তিযুক্ত, আনন্দভরা করিয়া লইতে পার, তবে আনন্দময় তাহাতে সাড়া দিবেন না কেন? তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না কেন?" রামনিধি আনন্দময় হইয়া তন্ময় ভাবে বলিলেন,—"অবশ্য সাড়া দিবেন, গুরুদেব যে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন—তোমাকে কে বলিল? দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন সুসাধ্য হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই; তুই একদিন অপেক্ষা কর, তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।" পূর্ণানন্দের অনুসন্ধান না পাইয়া শান্তিরাম রামনিধিকেই গুরুপদে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন,—তাহাতে তিনি বলিলেন, "ভাই! ব্যস্ত হইও না, দেবতা আসিবেন। কর্ণে মন্ত্রপ্রদান তাঁহার দ্বারা হইলেই ভাল হয়, তিনি সিদ্ধ-সাধক এবং সংসারী। তিনি আমাদের ন্যায় সংসার-বদ্ধ জীবকে পাপমুক্ত করিতে বিশেষ পারদর্শী, প্রায় এক বৎসর হইল

দেখা পাই নাই—তাঁহার আসিবার সময় হইয়াছে। প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছি, শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন।"

শান্তিরাম। ডাকিলে,—দেবতার দেখা পাওয়া যায়?

রামনিধি। গুরুই দেবতা, প্রাণের অধিষ্ঠাতা, তোমার মন্ত্রগ্রহণের বিশেষ আগ্রহ হইলে, প্রাণে একটা পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জাগিলে, তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। উপযুক্ত সময় হইলে শিষ্যকে গুরুর জন্য ভাবিতে হয় না।

শান্তিরাম। আমারত ভাই অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

রজনীর গাঢ় তমিশ্রা, তখন অতীব গাঢ় হইয়া তাহাদের গৃহের চারিধারে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। অমানিশার দুর্ভেদ্য অন্ধকার-কবচ ভেদ করিয়া জোনাকীর ক্ষীণ আলো, একবার গবাক্ষ পথে অন্ধকারের বিপুলতা প্রতীয়মান করিতেছিল। পৃথিবীর স্বত্বা তখন উপলব্ধি হইতেছিল না—এত গভীর নিস্তব্ধতা। কেবল শান্তিরাম ধীরে ধীরে বলিতেছিলেন, "ভাই! অসম্ভব!" কেবল তাঁহারা যেন দুই প্রাণী মাত্র, জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আর সমস্ত যেন নীরবতায় ডুবিয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

এমন সময় কে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে কুটীর দ্বারে দাড়াইয়া বলিল,—"বৎস! সব সম্ভব—সব সম্ভব, ভগবানের প্রাণপ্রিয় মানবের পক্ষে অসম্ভব কি আছে! রামনিধি এতক্ষণ ইষ্টধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন, কিসে পরম বন্ধু শান্তিরামের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—তাহার চিন্তা করিতেছিলেন—এমন সময় সেই চিরপরিচিত সুমধুর কণ্ঠের গভীর শব্দ, সেই চির-আশ্বাসবাণী, "বৎস! সব সম্ভব।" শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, চমকিত হইয়া শশব্যস্তে প্রণাম করিয়া দাড়াইয়া বলিলেন,—"ভাই! সব সম্ভব, অসম্ভব মানুষের পক্ষে কিছু নাই শুনিলে ত, এইবার তোমার আশাতরুমূলে জল সেচনের ব্যবস্থা হইবে।"

১৭৭]

শান্তিরাম বন্ধুর অনন্য-সাধারণ যোগবল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, সেই তেজপুঞ্জ কলেবর সাধক চূড়ামণীকে সম্মুখে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পূর্ণানন্দ শিষ্যের দুরবস্থার কথা সমস্তই শুনিয়াছিলেন, তবে সে সময় উপস্থিত হইলে পাছে, তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা নষ্ট হয়, পাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য দর্শন দেন নাই। শিষ্য সম্মানের সহিত পরিক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে—তাহার মুখোজ্জল হইয়াছে, এইবার দেখা করিয়া তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে আসিয়াছেন। রামনিধি আপনার বিপদাপদের কথা বিবৃত করিবার পূর্ব্বেই পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"বৎস! বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল—পাছে প্রাণের মমতা করিয়া তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দাও, পাছে ইহকালের জন্য অমূল্য পরকাল নষ্ট কর, এখন বিশ্বাস হইয়াছে, যে তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য, দেহাত্মবোধ তোমার তিরোহিত হইয়াছে, দেহাতিরিক্ত একটা দ্রব্য যে আমাদের ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহাই যে সার সর্ব্বস্ব, তোমার উপলব্ধি হইয়াছে জানিতে পারিয়া, আনন্দিত হইলাম।"

রামনিধি। গুরুদেব! এখন সামাজিক হিসাবে একটা অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি; আপনি তাহার ব্যবস্থা প্রদান করুন।

পূর্ণানন্দ। বৎস! সংসারে থাকিতে হইলে হাজার উন্নত হইলেও সাধারণের হিতের জন্য এ সমস্ত শাস্ত্রের বিধান অবশ্য মানিয়া চলিতে হইবে। আগামী কল্য তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

পরদিন প্রভাতে তাহাই হইল, পূর্ণানন্দের আদেশ মত রামনিধি শাস্ত্র-সঙ্গত দেহশুদ্ধি করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু সামাজিক হিসাবে কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিলেন না। সকলেই বলিলেন,—"রামনিধি তাহার কুলটা কন্যাটীকে গৃহে আনিয়াছে; সে এতদিন কুলের বাহির হইয়াছিল—তাহার সহিত

একত্র বাস করিয়া সে এখন পতিত, অতএব তাহার বাটীতে আহারাদি অসম্ভব। তাহাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, সমাজে তাহার স্থান হইবে না।” রামনিধি প্রমাদ গণিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

সমাজচ্যুতি।

হিন্দু-সমাজ কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নহে। রামনিধিকেও ছাড়িল না, তিনি নিরুদ্দিষ্টা কন্যা বিমলাকে ঘরে আনিয়াছেন দেখিয়া সমাজ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল, তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার বন্ধ করিল। প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ার নিমন্ত্রণে একটী ব্রাহ্মণও ভোজন করিতে আসিলেন না। বিমলা ব্যভিচারিণী কিনা শান্তিগ্রাম তাহা বেশ জানিতেন—সকলকে তিনি শপথ করিয়া বলিলেন,—“রমজানের অত্যাচারের জন্য তাহাকে শ্যামার সহিত কোন দূরদেশে পাঠান হইয়াছিল, পিতার বিপদ শুনিয়া সে আর থাকিতে না পারিয়া বাটী আসিয়াছে। রামনিধির ভগ্নী শ্যামা ত উপস্থিত, সে ত আর বালিকা নহে এবং অতি ধার্ম্মিকা রমণী; তাহাকে তামা-তুলসী হাতে দিয়া বিমলার চরিত্র সম্বন্ধে বলিতে বলুন, তিনি কি বলেন দেখুন!” কিন্তু এ কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

রামনিধি সমাজপতিগণের বিচার দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হইলেন না, সমাজের বন্ধন এইরূপ দৃঢ় থাকাই উচিত বিবেচনা করিলেন। যদিও তিনি নির্লিপ্ত, সংসারে থাকা না থাকা, সমাজে রহিত হওয়া না হওয়া সবই সমান, তথাপি পুত্র

কন্যাগণের কলঙ্কমোচন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শান্তিরাম বন্ধুর এ নূতন বিপদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার ন্যায় পবিত্র-চিত্ত লোককে, বিমলার ন্যায় গুণবতী রমণীকে সমাজ না জানিয়া শুনিয়া নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। গুরুদেব এই সময় উপস্থিত আছেন—তাঁহার মধ্যস্থতা সকলেই মানিয়া চলিবে, পূর্ণানন্দের কথা অবহেলা করিবে কে? কাশীর সাধকাগ্রগণ্য পূর্ণানন্দকে কে না জানে? পূর্ণানন্দের প্রতিপত্তি এখন কাশীধামে যথেষ্ট; যিনি একবার ৺বারাণসী ধামে গিয়াছেন, তিনিই সাধক পূর্ণানন্দের ধর্ম্মভাব, সাধনক্ষেত্রে তাঁহার অত্যুন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে দেবতাভাবে পূজা করিয়াছেন; এহেন পূর্ণানন্দের উপস্থিতিতে বন্ধুর এই সমাজবিরুদ্ধ কলঙ্কটার ক্ষালন হইলেই ভাল হয়।

শান্তিরাম সমাজপতিগণকে সমবেত করিয়া রামনিধির বহির্বাটীতে একটী সভা করিয়া কিরূপ প্রতিকার করিলে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি হয়, তাঁহারা রামনিধির সহিত অবাধে চলিতে পারেন—সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সমাজপতিগণ পূর্ণানন্দকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"এই যে একজন মহাপুরুষ রহিয়াছেন, ইনিই তাহার মীমাংসা করুন, সমাজে এরূপ একটা ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া মন্দ কি ভাল, উনিই তাহার বিচার করুন।"

পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"সমাজের এরূপ বাঁধাবাধি খুব ভাল, আমি তাহার বিপক্ষে কোন প্রকার কথা কহিতে পারি না; তবে আপনারা রামনিধিকে সমাজে রহিত করিতেছেন কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

প্রধান সমাজপতি বলিলেন,—"রামনিধির কন্যা বিমলা স্বামী পরিত্যক্তা, তাহার স্বামী জীবিত কি মৃত কেহ জানে না; সে এতদিন পিতার অধীনে বেশ ছিল, পরে হঠাৎ বাটী হইতে কোথায় চলিয়া

যায়, শান্তিরাম বহু চেষ্টা করিয়াও এই মোকর্দ্দমার সময় তাহাকে বাহির করিতে পারে নাই। তাহার পর সে দিন সে নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছে, এতদিন পরপুরুষের সহিত বিদেশে ছিল—পিতার বিপদ শুনিয়া দেশে আসিয়াছে, এক্ষেত্রে হিন্দুস্ত্রীর কলঙ্ক হইতে পারে কি না এবং তাহাকে সংসারে স্থান দিলে সমাজ তাহার পিতামাতাকে রহিত করিতে পারে কি না?"

পূর্ণানন্দ। সে'ত তাহার পিসীমাতার সহিত গিয়াছিল—তাহাতে দোষ কি?

সমাজপতি। পিসীমাতাও ত স্ত্রীলোক, তাহার সহিত দূরদেশে যাইয়া পরপুরুসের সহিত একত্র থাকিয়া যে সে চরিত্র ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল —তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? অল্প বয়সে স্বামীহীনা হইলে এবং ঐরূপ অসাবধানে থাকিলে দুর্ব্বলা স্ত্রীজাতি সহজেই চরিত্র নষ্ট করিয়া থাকে।

"বিমলা যে পতিহীনা, তাহা আপনাদের কে বলিল? আমিই বাল্যকালে তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, তাহাতে বিধবা যোগ আদৌ নাই; সে আজীবন সধবা থাকিবে—তবে বিবাহের পর পঁচিশ বৎসর অবধি নানাপ্রকার পাকচক্রে পড়িয়া জীবন শঙ্কটাপন্ন হইবে। আমি না হয় এখনি তাহার কোষ্ঠী বিচার করিতেছি দেখুন।" এই বলিয়া পূর্ণানন্দ বিমলার কোষ্ঠী আনিতে বলিলেন— অনাথনাথ জননীর নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিল।

পূর্ণানন্দ বিচার করিয়া বলিলেন,—"এখন বিমলার পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এই সময় হইতে তাহার সৌভাগ্যযোগ উপস্থিত, তাহার স্বামীও জীবিত আছেন; ব্যভিচারিণী হওয়া একটা ভয়ানক অসৌভাগ্যযোগ, বড়ই মন্দ ফল, অদৃষ্টে থাকিলে নিশ্চয়ই গণনা করিয়া পাইতাম কিন্তু তাহা ত নাই। এইবার অতি শীঘ্র সে রাজরাণী হইবে, তাহার কুগ্রহের দৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে।

বাহিরের একটী ঘরে বহুলোক একত্র হইয়া এরূপ নানাপ্রকার বাক-বিতণ্ডা তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল,—"বাঁড়ুয্যে মহাশয় ঘরে আছেন ?"

আহ্বান শব্দ রামনিধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত, কাশীনাথের চাকর রামদীন ডাকিতেছে।

পণ্ডিতমহাশয় রামদীনকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়ে বলিলেন,—"কি বাবা ! দেশ থেকে আস্‌ছো কি ?"

রামদীন পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"না বাবা ! আমি আজ একমাস আসিয়াছি ; আসিয়া দেখিলাম আপনার জামাতার অনুসন্ধান হইয়াছে ; তিনি এখন বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন। মাজীর আর এখন আপনাদের উপর আক্রোশ নাই, বরং নূতন বধূর ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের নাম আর মুখে আনেন না ; এখন কেবল আপনার কন্যার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন।"

রামনিধি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভিতরে লইয়া যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন,—"গুরুদেবের কথাই ঠিক, আমার জামাতা জীবিত আছেন ; তিনি কন্যাকে লইয়া যাইতে এই লোক পাঠাইয়াছেন।"

উপস্থিত জনগণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল। পূর্ণানন্দ রামদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহারা এখন কোথায় আছেন ?"

রামদীন। ভবানীপুরে আছেন ; কাশীনাথবাবুর শ্বশুরের যে বাস্তুভিটা ছিল, তারাদাস এখন তাহারই উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পূর্ণানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"কাশীনাথ ! কোন্ কাশীনাথ, তিনি জীবিত কি মৃত ?"

রামদীন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রামনিধি বলিলেন,—"কাশীবাবু আমার

বেহাই, বিমলার শ্বশুর, আজ আট দশ বৎসর হইল তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। তাঁর পুত্র তারাদাস আমার জামাতা।"

পূর্ণানন্দ আরও আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তারাদাস, আমার ত একজন শিষ্য তারাদাস ভবানীপুরে থাকে, তাহার কেবল জননী বর্ত্তমান আছেন—নাম ষোড়শী দেবী! সেই তারাদাসকেই ত আমার "শান্তি নিকেতনে" দারুণ বসন্ত রোগের হস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিলাম।" এইবার রামদীনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"হাঁহে! যুবকটী কি খুব গৌরবর্ণ এবং একটী চক্ষু হীন?"

রামদীন। আজ্ঞে হাঁ, শুনিয়াছি সম্প্রতি দারুণ বসন্তরোগে তাঁহার একটী চক্ষু হানি হইয়াছে। অঙ্গের বর্ণও পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে।

পূর্ণানন্দ। রামনিধি! এই তারাদাস কি তোমার জামাতা, সে ত এখন ভাল চাকুরী করিতেছে; জামালপুরের আদালতে সে এখন প্রধান সেরেস্তাদার! তবে আর ভাবনা কি, চল তাহাকে এখানে লইয়া আসি, তারপর সর্ব্বসমক্ষে বিমলার সতীত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

এই শুনিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। বাটীর মধ্যে এই সংবাদ পৌঁছিলে, মোক্ষদা রামদীনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট হারানিধির সংবাদ পাইয়া পরম পুলকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামদীন! আমার তারাদাস কেমন আছেন, বেহান কেমন আছেন?"

রামদীন। মা! তাঁহাদের অবস্থা এখন আবার ভাল হইতেছে, তারাদাস বেশ উপায় উপার্জ্জন করিতেছে; মা-জীর আর আপনাদের প্রতি কোন প্রকার রাগ নাই; এখন সে বৌয়ের প্রতি একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়া বিমলাকে পাইবার জন্য বড়ই উতলা হইয়াছেন! আপনাদের সন্ধান জানিতেন না; তারাদাস নাকি কোথা হইতে জানিয়া মাকে বলিয়াছিল; আমি দেশ হইতে আসিবামাত্র মা-জী আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আনন্দের আবেগ অত্যধিক হইলে মানুষ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া

যায়, কথা কহিবার শক্তি থাকে না; কেবল কি সূত্রে এই অভাবনীয় আনন্দের উৎস উচ্ছ্সিত হইল, মনে মনে তাহাই ভাবিতে থাকে—ভগবান এতদিন পরে তাহাদের দুঃখের রজনী প্রভাত করিলেন।

বিমলার অনিন্দ্য সুন্দর মুখপদ্ম এতদিন চিন্তা-রাহুর কবলে পড়িয়া সন্ধ্যাকালীন কমলিনীর ন্যায় অতিশয় ম্লানভাব ধারণ করিয়াছিল, মা হইয়া কন্যার সে ভাব দর্শন প্রাণবিয়োগের তুল্য কষ্টকর। এই বার মায়ের অপ্রসন্ন মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইবে—শান্তশ্রী ধারণ করিবে, অদ্যই তারাদাসকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইবে মনে করিয়া তখনই এই মঙ্গল সংবাদ শ্রবণের জন্য দেবতার নিকট কত মাথা কুটিলেন; তারাদাস আসিলে—ভগবানের ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন বলিয়া মানসিক করিলেন।

এমন সময় রামনিধি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মোক্ষদা! ভগবানের দয়ার কথা শুনিলে ত, এখন গুরুদেব অনাথকে সঙ্গে লইয়া ভবানীপুরে বেহানকে আনিতে যান, রামদীন তাঁহাদের সঙ্গে যাক্! আর শান্তিরামকে লইয়া আমি জামালপুরে তারাদাসের নিকট যাই, দুই চারি দিনের মধ্যে তাহাকে আনিয়া মায়ের পবিত্র চরিত্র নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিতে হইবে।" সকলে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শুভযাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ



কলঙ্কমোচন।

দুই তিন দিন পরেই সকলে আসিয়া মনোহরপুরে রামনিধির বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, আজ নিরানন্দময় গৃহে আনন্দের হাট বসিয়াছে। প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বিমলার সৌভাগ্যোদয়ে পরম আনন্দিত হইয়া, তাহার বর দেখিতে আসিয়াছে। শান্তিরামের স্ত্রীও আজ বন্ধুর আনন্দের ভাগ লইতে আসিয়াছেন; শান্তিরাম ত প্রথম হইতেই এ আনন্দের প্রধান অংশীদার হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। রামনিধিকে কেমন করিয়া সুখী করিবেন, কেমন করিয়া তাঁহার কলঙ্ক অপনোদিত হইবে, শান্তিরাম প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রামনিধির প্রতি তাঁহার কেমন একটা অন্তরের টান, একটা অপার্থিব ভালবাসা জন্মিয়াছে, যাহার জন্য তিনি প্রাণ দিয়াও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ মোচন করিতে প্রস্তুত।

প্রাতের গাড়ীতে জামাতার সহিত রামনিধি ও শান্তিরাম আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ষোড়শী পূর্ব্বদিন বৈকালে পূর্ণানন্দের সহিত বেহাই-বাটীতে আসিয়া বিমলাকে কোলে করিয়া তাহার বিশুদ্ধ অধরে আশার চুম্বন দিয়া সবল করিয়া তুলিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, —"ভগবান, তুমিই সত্য, তুমি সুখী না করিলে মানবের সাধ্য কোথায় যে তাহারা কাহারও তিলমাত্র সুখ বর্দ্ধন করিতে পারে?"

তারাদাস বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন—সমাজপতিগণ সেই সৌম্য মূর্ত্তি যুবককে ঘেরিয়া বসিয়া আছে—কত সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে। রমণীগণ এইবার গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিয়া বিমলার প্রাণের

ধনকে দেখিতে লাগিল—তাহারা প্রথম দর্শনেই চমকিত হইয়া বলিল,—"ওমা! একি গো, এ যে আমাদের মাষ্টারমশাই, এতদিন এত কাছে কাছে থাকিয়াও কিছু বুঝিতে পার নাই!" যোড়শী বলিলেন,—"মা! চিনিব কি ক'রে—বাছার কি আর সেরূপ আছে, তাহার উপর বসন্ত রোগে মা শীতলা একটী চক্ষু হরণ করিয়াছেন।" সকলেই যোড়শীর কথায় সায় দিয়া বলিল,—"তা হ'ক্ মা, তা হ'ক্, বেটাছেলের আবার রূপের দরকার কি? মা যে রক্ষা করিয়াছেন, এই যথেষ্ট, ছেলে ত এখনই কার্ত্তিক, না জানি ভাল অবস্থায় আরও কত সুন্দর ছিল। এখন মা দুর্গা চিরদুঃখিনী বিমলাকে সুখী করুন।"

এইবার তারাদাস বলিতে লাগিলেন,—"আমি বহুদিন মহাত্মা শান্তিরামের কৃপায় আপনাদের গ্রামে প্রতিপালিত হইয়াছি। বিমলা যে আমার স্ত্রী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় যে নবদ্বীপের বিষয়-আশয় নষ্ট করিয়া ভিন্ন নামে এখানে বাস করিতেছিলেন—তাহা আমি জানিতাম না; দুর্বৃত্ত রমজানের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পিসীমাতার সহিত বিমলাকে আমি লইয়া গিয়াছিলাম। বিমলা এতদূর লজ্জাবতী যে এ কয়মাস আমি তাহার পদ ব্যতীত মুখ দেখি নাই। পরস্ত্রী অনুমানে দেখিবার চেষ্টাও করি নাই। আমার সাতিশয় দৈহিক পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং অবস্থা বৈগুণ্যে স্থানচ্যুত হওয়ায়, তাঁহারাও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে এখানে আছেন, তাহা আমি জানিতাম না, তবে যে দিন সংবাদপত্রে আমার শ্বশুর মহাশয়ের অযথা বিপদের কথা পাঠ করিলাম এবং যে দিন তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন, সেই দিন আমার চমক ভাঙ্গিল। ভাল করিয়া পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম—ইনিই আমার শ্বশুর।"

"সংসারে নানা প্রকার অভাবনীয় গোলযোগ হইয়া নানাস্থানী

হইবার পর পূজ্যপাদ গুরুদেব আমার জীবনদাতা পূর্ণানন্দের কৃপায় দীক্ষিত হইয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম—আর সংসারী হইব না—তবে যতদিন জননী জীবিত আছেন, ততদিন তাঁহার সেবায় প্রাণপণ করিব, পরে সন্ন্যাসী হইব—তথাপি দ্বিতীয় স্ত্রীর মুখদর্শন করিব না, প্রথম স্ত্রীর দর্শন যদি ভাগ্যে ঘটে, তবে পুনরায় সংসারী হইতে চেষ্টা করিব। এখন আমার মনের ভাব অত্যন্ত খারাপ, পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিলে, পিতার জীবিতাবস্থার সুখস্বচ্ছন্দের কথা মনে পড়িলে, এ সামান্য আয় লইয়া আর সংসার করিতে প্রবৃত্তি নাই, তবে গুরুদেব ও জননীর আদেশ অমান্য করিতে পারিব না। আমি যতদূর জানি বিমলা সাক্ষাৎ সতী, সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পিসীমাতার সহিত আমারই আশ্রয়ে অতি পবিত্র ভাবে অবস্থান করিয়াছিল—আপনারা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিবেন না। আমি সংসারী হইলে বিমলাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিব।"

সমাজপতিগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—"যখন তোমার স্ত্রী তোমার কাছেই ছিল, তখন আর আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।" বিমলার কলঙ্কমোচন হইল, সকলেই রামনিধির সহিত মনোমালিন্য পরিহার করিয়া বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে মোক্ষদার আনন্দ, শ্যামার আনন্দ, বন্ধুবান্ধব সকলেরই পরম আনন্দ! আর আনন্দ অভাগিনী বিমলার! সে আনন্দের সীমা খুঁজিয়া পাইতেছে না, স্ত্রীচরিত্রে কলঙ্কলেপন করিলে সে দুঃখের সীমা নাই। আজ বিমলা তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি ত পাইলেনই উপরন্তু স্বামী সন্দর্শন, যে ধন স্ত্রীজাতির প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; যাহার দর্শন না পাইয়া বিমলা এতদিন জীবন্মৃত হইয়াছিল, আজ এতদিন পরে প্রাণের সেই একমাত্র দেবতা, নারী জীবনের সেই একমাত্র ধ্যেয় ধন বিধি মিলাইয়া

দিয়াছেন, এ আনন্দ কি আর বিমলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিতে পারে —উথলিয়া পড়িতেছে; তবে পাছে কেহ প্রগল্‌ভা বলিয়া নিন্দা করে, তাই সাধ্যানুসারে সংযত হইতে, প্রাণের আবেগ লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

তারাদাস বড় বিষম কথা বলিয়াছেন—মোক্ষদার প্রাণে তাহা এখন বিষম বাজিয়া আছে, তিনি সংসারী হইতে তত ইচ্ছুক নহেন, এ কথা প্রকারান্তরে নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষদা গুরুদেবকে সে কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন —"মা! আশাভঙ্গ হইলে মন ঐরূপ বিষাদগ্রস্ত হইয়াই থাকে, তুমি তাহার জন্য চিন্তা করিও না, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।"

আহারাদির পর বহির্বাটীতে সকলেই বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"বাবা তারাদাস! তুমি এখনও দুই একটী কথা নিতান্ত বালকের মত বলিয়া থাক—এখনকার ছেলেদের দোষই ঐ, তাহারা স্বভাবতঃই সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা করে, সংসার আশ্রমটাকে একেবারে বাদ দেয়। হাঁ বাবা! সন্ন্যাসী হওয়াটা কি বাহিরের জিনিস, প্রাণ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, কেবল গেরুয়াধারী হইয়া কর্ত্তব্যহীন জীবন বহনে ফল কি? সন্ন্যাসী কি ইচ্ছা করিয়া হওয়া যায়, না তাহা একটা মনের অবস্থা, মন যখন সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিবে —তখনই ত সে মানব সন্ন্যাসী! তখন তুমি সংসারেই থাক, আর বনেই থাক, গেরুয়াই পর, আর সাদা কাপড়ই পর বা উলঙ্গ থাক—সেত সমান অবস্থা, তোমার মনে সেইরূপ আসক্তির উচ্ছেদ হইয়াছে কি? প্রবৃত্তির হাত হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছ কি? যদি না পাইয়া থাক, তাহা হইলে জোর করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না, অবনতি ব্যতীত উন্নতির দ্বার

দিয়া যাইতে পারিবে না। আমাদের আর্য্যঋষিগণ পরমত্যাগী ছিলেন, সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারী ছিলেন, সংসারের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। তাঁহারা কি তবে আমা তোমা অপেক্ষা মূর্খ! বাবা! সংসারে পতনের সম্ভাবনা নাই—ভগবান সংসারের জীবকে অনেক প্রকারে অব্যাহতি দিয়াছেন, অনেক প্রকার অধিকারে অধিকারী করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সন্ন্যাসীর নিয়ম অতি কঠোর, একচুল তফাৎ হইলে একেবারে নীরয়ের অতি নিম্নে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে। কে বলিল—সংসারে সুখ নাই, সংসারে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না? বৎস! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি খুব ভাল করিয়া সংসার কর, ভগবানের যাবতীয় নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া সংসারে ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত কর—ইহাকে উপেক্ষা করিও না, ইহার ন্যায় আনন্দময়, শান্তিময়, পবিত্রস্থান আর নাই।"

কথাটী বলিয়া তারাদাস গুরুর নিকট একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞা এবং জননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসারী হইতে অঙ্গীকার করিলেন। মোক্ষদার মনের সন্দেহ বিদূরিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



শ্বশুরালয়ে।

সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবার পর যখন সমাজ রামনিধির সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইল, তখন শান্তিরাম বন্ধুর অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তের ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পাড়ার ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনব ভোজন ব্যাপারে উদর পুরিয়া

আহার করিলেন, দীনদরিদ্র কেহই বাদ পড়িল না। সকলেই বলিল—বহুদিনের পর একটা যথার্থ সামাজিক ভোজন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। ব্যাপার খুবই গুরুতর হইয়াছিল, বন্দোবস্তও খুব চমৎকার, না হইবে কেন, ইহার কর্ত্তা যে গুরুদেব। রামনিধির কার্য্যে যে দেবতার সংযোগ ছিল, আর নম্রতা, অহঙ্কার-শূন্যতা যে কার্য্যের গোড়া, আগা গোড়া তাহার সুযশ বিঘোষিত হইবে না কেন? এ সকল কার্য্যে রাগবিহীন হইয়া, অহঙ্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কার্য্য চালাইতে পারিলে যশোলক্ষ্মী যে অঙ্কগত হইবেন, তাহার বিচিত্রতা নাই। রামনিধি আজীবন গুরুর নিকট সেই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উপর তিনি স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত—ইহাতে যশোলাভ অনিবার্য্য।

যজ্ঞকার্য্য সমাধা হইবার পর ষোড়শী গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বগৃহে গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। গৃহ প্রাঙ্গন অর্গলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—রামদীন একাকী, ভিন্ন জাতি হইয়া সে কত করিবে, কাযেই আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মোক্ষদা ও রামনিধি হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন—কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের উজ্জ্বল ছবি নয়ন সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাদের প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিতেছে, সে আনন্দে তাঁহাদের চিরদৈন্য মন প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। বেহানের বাক্যে আর তাঁহারা দ্বিরুক্তি করিলেন না। মোক্ষদা করযোড়ে ষোড়শীকে বলিলেন,—"আশা ছিল না, যে তোমার পাদপদ্মে আমার এ স্নেহলতা আবার আশ্রয় পাইবে—ভগবান কিন্তু সে উন্মুলিতা আশালতা আবার পুনঃ জীবিত করিয়া দিলেন। কিন্তু বেহান"—বলিয়া, আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। ষোড়শী খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, তিনি বুঝিলেন—মোক্ষদা তারাদাসের দ্বিতীয় পত্নীর কথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, যদি সে আসে, তাহা হইলে এই দরিদ্রের কন্যা ত আবার

ভাসিয়া বেড়াইবে না। ষোড়শী বলিলেন,—"বেহান, কোন চিন্তা করিও না, তাহার আর আমাদের নিকট মুখ দেখাইবার পথ নাই, সে যাহা করিয়াছে, স্ত্রীলোকে তাহা করিতে পারে না, তাহার পিতা আমাদের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, অতি বড় শত্রু হইলেও কেহ সেরূপ আচরণ করিতে পারে না। আজ যে আমরা পথের ভিখারী সে কাহার জন্য ? ডেপুটী যদি রায়মহাশয়ের সহিত ষড়যন্ত্র না করিত—তাহা হইলে কি আমরা বাসচ্যুত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম,না তারার আমার এত দুর্গতি হইত ? ভগবান আছেন—তাই সে হতভাগারা একখাদে গিয়াছে, আমার আর কি হইবে, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—তারা আমার দীর্ঘজীবি হউক, সে ত আর মূর্খ নয়—যেমন করিয়া হউক পেট চালাইতে পারিবেই। তাহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না, সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

বিমলা আজ মনের আনন্দে শ্বশুরবাটী যাইবার সময় পিতামাতার পদধূলি লইলেন, সাক্ষাৎ দেবতা পূর্ণানন্দকে দণ্ডবৎ করিলেন। শান্তিরাম ও তাঁহার স্ত্রীর পদধূলি লইয়া পিতামাতাকে ভাল করিয়া দেখিবার অনুরোধ করিলেন, সহোদর অনাথ, সোদরপ্রতিম নিত্যানন্দের মুখ-চুম্বন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

এতদিন লোকের বিষনয়নে পড়িয়া, কত নির্যাতন সহ্য করিয়া, বিমলা আজ রূপের তরঙ্গ লইয়া স্বামী-সাগরে কুল পাইলেন। সংসারে যে নিতান্ত অভাগ্যবতীর ন্যায় মনমরা, দিশাহারা, মৃতপ্রায় রূপে একপ্রান্তে পড়িয়া অদৃষ্ট-চক্রে নিষ্পেষিতা হইতেছিল—আজ সঞ্জীবিত প্রাণে, আনন্দ উৎফুল্ল হৃদয়ে সে রাজরাণী হইল। আশা-উৎসাহ-আনন্দ ভরে সে রূপের বাহার এত খুলিল—যে তাহাকে দেবীর সম্মান না দিয়া কেহই থাকিতে পারিল না।

বিমলা এখন ভবানীপুরে মুখুয্যেদের ঘরের সর্ব্বেসর্ব্বা—কর্তৃত্বভার

গ্রহণ করিয়া সুখের সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন। ষোড়শী সমস্ত সংসার বধূমাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বিমলা যেরূপ ভাবে সংসার চালাইতেছেন—বোধ হয় একজন অতি সুনিপুণা গৃহকর্ত্রীও তাহা পারে কি না সন্দেহ। বিমলার সংসার কার্য্য দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে মনে মনে শত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যদি নিজ অহমিকার বশবর্ত্তিনী হইয়া এতদিন হেলায় না কাটাইতেন, তাহা হইলে এ লক্ষ্মী-স্বরূপা বধু দ্বারা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার সংসার শ্রীসম্পন্ন, ধনধান্য সমুজ্জ্বল হইত কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর উপায় নাই।

ষোড়শী এখন সুখে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবা পাইতে লাগিলেন। বিমলা বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে সকলপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে ত্রুটী করিলেন না, বোধ হয় নিজের পেটের মেয়ে হইলেও কোন না কোন প্রকার সেবার ত্রুটী করিয়া ফেলে কিন্তু বিমলার দ্বারা তাহার কিছু মাত্র হইল না। মোক্ষদার হাতে গড়া, মানুষ-করা, গৃহিণীপণা-শিক্ষা-করা বিমলার গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল।

বিমলা খরচ-পত্রের টাকাকড়ি সমস্ত ষোড়শীর হাতে রাখিতেন—নিজে কর্ত্তৃত্ব করিতেন বটে কিন্তু শ্বাশুড়ীর অনুমতি না লইয়া কিছু করিতেন না! আর রামদীন তাঁহার গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিত, বাজার হাট করিত, গরু বাছুর দেখিত—সে যৌনপুরে বিমলাকে একপ্রকার কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল—সেই বিমলাই এখন মুখুয্যে ঘরের গৃহিণী হইয়াছে, অতএব রামদীনের সুখের কি আর অন্ত আছে।

তারাদাস একমাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন। ছুটী ফুরাইতে আর বেশী দিন নাই—এইবার তাঁহাকে জামালপুর যাইতে হইবে; আবার কতদিনে গৃহে আসিবেন, সেরেস্তাদারী কাযে ত বেশী ছুটি পাওয়া যায় না। বহুদিনের দুইটী প্রাণ এক হইয়াছে; সাগর নদীর একত্র সম্মিলন; আশা-আকাঙ্ক্ষায় জীবনভরা, এখনও তাহার কিছুই

পূর্ণ হয় নাই। বিমলা নবীনা মাধবীলতা মুকুলোন্মুখী, তারাদাস নবীন রসাল ; সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিগুলি থরে থরে জীবনকুঞ্জে সাজান ; তবে দুইজনে দাসের মত, কেহই তাহাদের আয়ত্তাধীন নহেন।

এখন আর শীঘ্র কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিবেন না। তাই জননীর অনুমতিক্রমে সংসারের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, রামদীন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। তারাদাসের কার্য্যে খুব সুযশ, সরকার বাহাদুর তাই তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য তত সচেষ্ট ; এই অল্প দিনের মধ্যে তারাদাস একশত মুদ্রা বেতন পাইতেছেন। সেরেস্তাদারী চাকুরীতে বেশ দুপয়সা উপরি আয় থাকিলেও, তারাদাস সে অধর্ম্ম সঞ্চিত লাভের আশা করিতেন না—কাহার অনিষ্ট করিয়া, কাহাকেও কষ্ট দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ—নতুবা এ কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া এতদিন বড়লোক হইতে পারিতেন, কিন্তু তেমন বড়লোক হইতে তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন না। দশ অঙ্গুলীর উপার্জ্জনেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন, আর তাহাতেই তাঁহার সংসার বেশ সুখে চলিয়া যাইত।

বিমলাকে সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কারণ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে এখন তাঁহার বড় কষ্ট হয় এবং কার্য্যেরও অনেক সময় নষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞাত-কুলশীল ব্রাহ্মণের হস্তে অন্নভোজন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না, তাই অতি প্রাতঃকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও পূজাহ্নিক সমাপন করিয়া, যাহা পারিতেন স্বহস্তে তাহাই রাঁধিয়া খাইতেন। বিমলাকে লইয়া যাইলে তাঁহার এ কষ্টের লাঘব হয়—সময়ও অনেক পান, যাহার দ্বারা সৎ উপায়ে আরও কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন কিন্তু কেবল উপায়ের পন্থা দেখিলে জননীর কষ্টের যে একশেষ হয়, বৃদ্ধ বয়সে তিনি আর কত খাটিবেন। ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চাহিলেন ; তবে তাঁহারই সুখের মাত্রা পূর্ণ হউক।

১৯৩]

আজ ভোরের গাড়ীতে তারাদাস কর্ম্মস্থানে যাইবেন। বিমলা নানা প্রকার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন; বিদেশে স্বামীর খাওয়া ত ভাল হয় না, আর বেটাছেলে নানাপ্রকার আহারাদি ত প্রস্তুত করিতে জানেন না, অপরের হাতে খাওয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উচিত নয়। ষোড়শী বধূর কাছে বসিয়া তাঁহার প্রাণের তারা কি খাইতে ভালবাসে, কিরূপ খাইলে তাহার অসুখ করিবে না, তাহা শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। বিমলা শ্বাশুড়ীর নির্দ্দেশ অনুসারে সেই সমস্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আহারীয় দ্রব্য অনেক রকম হইল, তাই খাইতে অনেক রাত্রি হইল। পুত্রকে খাওয়াইয়া, বধূমাতা ও রামদীনকে পরিবেশন করিয়া ষোড়শী একটু জলযোগ করিলেন—সেদিন তাঁহার তত রুচি ছিল না, একে বেলায় আহার হইয়াছে, তার পর ছেলেটী এতদিন কাছে ছিল, সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে তাহাকে দেখিতে পাইতেন; কাল সে চলিয়া যাইবে, তাই মনটাও একটু খারাপ হইয়াছে।

কাল অতি প্রত্যূষে উঠিতে হইবে বলিয়া তারাদাস শয্যায় গিয়া ঘুমাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু নিদ্রা না হওয়ায় কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। বধূমাতা এতক্ষণ বসিয়া বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর গায়ে পায়ে হাত বুলাইতেছিলেন,বেশী রাত হইয়াছে দেখিয়া ষোড়শী বলিলেন, —"বউমা! শোওগে যাও, আবার ভোর বেলা উঠিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আপন কক্ষে অর্গল বন্ধ করিলেন। বিমলাও ধীরে ধীরে স্বামীসদনে গমন করিয়া স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন কিন্তু গাত্রে হস্ত প্রদান করিবামাত্র তারাদাস বলিলেন,—"বিমলা!"

বিমলা। হ্যাঁ, তুমি এখনও ঘুমাও নাই; রাত যে অনেক হইয়াছে, কাল যে খুব ভোরে উঠিতে হইবে?

তারাদাস। ঘুম হইতেছে না, নানাপ্রকার চিন্তা যেন জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

বিমলা। কেন, এত চিন্তা কিসের?

তারাদাস। বুঝিতে পার নাই কি বিমলা, এতদিন না দেখিয়া ছিলাম ভাল, এখন দেখিয়া যে আর প্রাণ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

বিমলা। আমিও যে কেমন করিয়া থাকিব, তাই ভাবিয়া পাইতেছি না, সকাল থেকেই প্রাণটা কেমন আনচান্ করিতেছে। মাকে লইয়া সেখানে গেলে হয় না?

তারাদাস। এবার ত নয়, সে সাহেব কোয়াটারে থাকি, সেখানে ত ভদ্রলোকের বউঝি লইয়া থাকিবার স্থান নয়। একান্ত যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে সহর থেকে একটু দূরে একটা বাসার চেষ্টা করিব, তারপর তোমাদের লইয়া যাইব।

বিমলা। কেন, পিসীমাতার সহিত আমরা যখন ছিলাম, তখন ত সে বাসাটী বেশ ভাল ছিল।

তারা। তোমাদের জন্য সে বাসা ক'রেছিলাম; এখন একলা, তাই সহরের মধ্যে একটা ঘরে থাকি, বেশী খরচ বাড়াই না। আচ্ছা বিমলা! তুমি ত খুব শক্ত মেয়ে, এতদিন ছিলে একদিনের জন্য আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নাই, আর পিসীমাকে ত চিন্‌তে পারিই নাই।

বিমলা। আমরাও তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তোমার চেহারার পরিবর্ত্তন খুব হ'য়েছে।

তারাদাস। আমার চেহারা ছেলেবেলার চেয়ে খুব খারাপ হ'য়েছে নয়, তোমার সঙ্গে আর আমার তুলনা হয় না?

বিমলা জিব কাটিয়া বলিলেন,—"ওকি কথা ব'ল্‌ছ। মা যে রক্ষা করিয়াছেন—এই যথেষ্ট; আমি তোমাকে ত চির-সুন্দর দেখ্‌ছি; আমি পদ-সেবার দাসী, তোমার রূপ দেখিবার আমার অধিকার কি; যেরূপ

আছে, উহাতেই-ত আমার হৃদয় সরোবর আলোকময়, এমনটী যে আর কোথাও আছে, তাহা ত আমার চক্ষে ঠেকে না।

তারা। বিমলা! হতভাগীর কুহকে পড়িয়া আমি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম; যখন আমাদের হুগলীর বাটী বিক্রয় হয়, তখন মায়ের কথায় একদিন তাহার নিকট গহনা চাহিতে গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম উহা বিক্রয় করিয়া পিতৃসম্পত্তি রক্ষা করিব। ডেপুটীর মেয়ে অহঙ্কারে ত সে বিষয়ের কথাই কহিল না, তারপর দুধের সহিত কি মিশাইয়াছিল, তাহা খাইয়া আমি পাগল হইয়াছিলাম, আনমনে একদিন বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া পড়ি, তিনি দয়া না করিলে এ যাত্রা আমাকে আর দেখিতে পাইতে না।

স্ত্রীলোকের নিন্দায় স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দমিয়া যায়, বিমলা দারুণ দুঃখের দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"দেখ, আর সে সকল পুরাতন স্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া দুঃখভোগের দরকার নাই। সে কি রকম স্ত্রীলোক বলিতে পারিনা, ওষুধে কি স্বামী বশ হয়---না গুণে হয়?"

তারাদাস। সে পোড়ারমুখী কি তা জানে—সে যে বড়লোকের মেয়ে, অহঙ্কারেই মত্ত, তুমি আছ জানিয়া একা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল—কিন্তু ভগবান সহ্য করিবেন কেন—পাপের প্রতিফল হাতে হাতে পাইল, একেবারে আমাদের বিষ নয়নে পড়িল।

বিমলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এইবার যদি সে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গরীবের মেয়ের ত আবার লাঞ্ছনার এক-শেষ হইবে?"

. "তুমি ক্ষেপেছ? সে আর এ মুখো হইতে পারিবে না, যে কার্য্য ক'রেছে, মা আর তার মুখ দর্শন করিবেন না, ইহা গুরুদেবের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। বিবাহতে কি আমি রাজী ছিলাম, চিরদিন তোমার স্মৃতি আমাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কেবল সারদাচরণ

নামক একজন আত্মীয়ের চক্রান্তে অনিচ্ছা সত্বেও লোভে পড়িয়া মা বিবাহ দিলেন, সেই পাপে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল, মাও তা বুঝিতে পারিয়া তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন; রামদীনকে খোঁজ লইবার জন্য কত যায়গায় পাঠাইতেন। কিন্তু তুমি যে আমার কাছে কাছে রহিয়াছ—তাহাত জানিতাম না।" এই বলিয়া তারাদাস হাসিয়া আকুল হইলেন।

বিমলা। ভগবান কি প্রভু ছাড়া দাসীকে অন্যস্থানে রাখিতে পারেন, তবে অলক্ষিতে—ইহা যে তাঁর পরীক্ষা।

তারাদাস। এখন ত লক্ষ্যের মধ্যে—শুধু তাই কেন, প্রাণের মধ্যে আসিয়াছ; এখন সুখে হৃদয়-রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়া এ সন্তাপিত রাজ্য সুশাসন কর।

কথা আর ফুরায় না, প্রণয়ী যুগলের প্রণয় সম্ভাষণ চিরদিন অবিতৃপ্ত—আশা মেটে না, আবেগ ছুটে না। দারুণ আবেগে মনের কথা কহিতে কহিতে গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র রজনী শেষ হইয়া গেল—টং টং করিয়া ঘড়িতে চারিটা বাজিল, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল না, বসিয়া বসিয়াই ভোর হইয়া গেল। প্রণয়ের রজনী এই রকমেই সকলের কাটিয়া থাকে। বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াও পতি-পত্নীর কোন কষ্ট হইল না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তারাদাস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। পূজাহ্নিক সম্পন্ন করিবার অবসরে বিমলা স্বামীর জলযোগের জন্য লুচী ও মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারাদাস আশ্চর্য্য হইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! এরই মধ্যে কখন কি করিলে, এত পরিশ্রম না করিলেই হইত, এত ভোরে খাওয়া আমার অভ্যাস নাই।"

ষোড়শী। বাবা! আমি কিছুই করি নাই, বউমা উঠিয়া সমস্ত করিয়াছেন।

তারাদাস অনিচ্ছা সত্বেও প্রিয়া-প্রদত্ত আহারে বসিলেন—যাহা পারি-

লেন আহার করিলেন, তারপর আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বিমলা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া ব্যাগের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, রামদীন তাহা গ্রহণ করিয়া তারাদাসের সহিত গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চলিল।

বিমলা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং মা দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন—যেন তাঁহার স্বামীর গমন শুভ হয়। তারাদাস গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমলার নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিমলার আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল। তারপর জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন। পুত্র বিদেশে যাইতেছে—জননীর প্রাণ কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারে, ষোড়শী সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিলেন। ষোড়শী বলিলেন,—"বাবা! খুব সাবধানে থাকিবে। প্রত্যহ একখানি পত্র দিবে, তা না হইলে আমি থাকিতে পারিব না।" পুনরায় পদধূলি লইয়া—"মা! আর এসনা, কষ্ট হবে—বাড়ী যাও, আমি প্রত্যহ চিঠি দিব" বলিয়া, তারাদাস দ্রুতগতি রামদীনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিমলা গবাক্ষে বসিয়া যতদূর দেখা যায়, অনিমিষ নয়নে দেখিলেন—তারপর শ্বাশুড়ীর অনুমতি লইয়া গৃহ-কর্ম্মে মন দিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



কাশী বাস।

এতদিন প্রাণের কন্যা বিমলার ভাগ্য-গগন নিবিড় কুয়াশাচ্ছন্ন দেখিয়া পতি-পত্নীতে বড়ই ম্রিয়মান হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে বিমলা স্বামী সুখে সুখিনী হইল, শ্বাশুড়ীর নয়নের মণি হইয়া এখন সে স্বামীর গৃহে কর্ত্রীরূপে সংসার উজ্জ্বল করিতেছে, ষোড়শী

এখন বৌমা বলিতে অজ্ঞান হন; বৌমার হাতের অন্নজল না খাইলে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হয় না; বৌমা না করিলে তাঁহার কোন কায মনে ধরে না, জন্ম-দুঃখিনী বিমলার অদৃষ্টে বহুদিন পরে যে এরূপ শুভ-সংযোগ হইবে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হায়! বিমলার নারী জীবন বোধ হয় চিরদিন এইরূপ কঠোর দুঃখে অতিবাহিত হইয়া এক-দিন হঠাৎ কাল-সাগরে অস্তিত্ব হারাইবে। এই মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও বাছাকে একদিনের জন্য সুখী করিতে পারিলাম না, এ কষ্ট কি রাখিবার স্থান আছে? পিতা মাতার সে মর্ম্মপীড়ার দারুন তপ্তশ্বাস গৃহের রুদ্ধ-বায়ুকে তাপিত করিয়া দর্শকের প্রাণে অসহ্য বেদনা প্রদান করিত, আজ তাহার শান্তি হইয়াছে। প্রতিদিন বিমলার সুখের সংবাদ, তাহার গৃহিণীপণার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া পিতা মাতার প্রাণ সুখ-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিল। গুরুদেব কোষ্ঠির বিচার করিয়া বলিয়াছেন—বিমলার অদৃষ্টের কুগ্রহ কাটিয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই। এইবার তাহাদের চরম উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে, দিন দিন সুখের মাত্রা বাড়িয়া উঠিবে, জীবনে আর অসুখের লেশমাত্র ভোগ করিতে হইবে না।

পূর্ণানন্দ এখন শিষ্য-গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। শান্তিরাম সপরি-বারে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন; সাধন-পথে বন্ধুর উন্নতি দেখিয়া যে মহাপুরুষের চরণ আশ্রয় লইয়া জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, আজ ঘরে বসিয়া সেই ধন লাভ হইল, শান্তিরাম মনের সুখে গুরুপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ইষ্ট মন্ত্র জপমালা করিয়া মনের অন্ধকার দূর করিতে যত্নবান হইলেন। মনে প্রাণে ধর্ম্মকার্য্য করিলে তাহাতে যে ফললাভ হইবেই হইবে, শান্তিরাম এই কয়দিনের কার্য্যে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ণানন্দ মনোহরপুরে আগমন করা অবধি প্রত্যহই তাঁহার শ্রীমুখের সরল ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ

করিবার জন্য গ্রামান্তর হইতে কত লোক আসিয়া তাহাদের মনের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া লইতেছে; যাহাদের গুরু মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল, সন্ধ্যা আহ্নিক করা যাহারা বৃথা মনে করিয়া অবহেলায় কাল কাটাইত, পূর্ণানন্দের সহজবোধ্য উপদেশে তাহাদের প্রাণের সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে; ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কাযে সকলে প্রাণ-পণ করিয়া খাটিতে লাগিল।

আর বেশীদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। পূর্ণানন্দ একদিন শাস্তিরামকে বলিলেন,—"বৎস! আমি এইবার কাশী যাইব, রামনিধি ও মোক্ষদা আমার সঙ্গে যাইবে, অনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতাম কিন্তু এক্ষণে সে আমাদের সঙ্গের সাথী হইলে, তাহার লেখাপড়ায় অনেক বিঘ্ন ঘটিবে, এমন কি হইবার সম্ভাবনাও অল্প। অতএব তুমি ইহাকে নিকটে রাখিয়া রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দাও, অনাথ বোধ হয় পিতামাতা ছাড়িয়া তোমার সংসারে, তোমার পুত্রের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে আপত্তি করিবে না। বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন; অনাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় প্রথমতঃ তাহার প্রাণ একটু খারাপ হইয়াছিল, পিতামাতাকে ছাড়িয়া কোন্ পুত্র পর-বাসে, পরের আশ্রয়ে থাকিতে চায়? কিন্তু যখন রামনিধি বলিলেন,— "বাবা! ভয় কি? লেখাপড়া শিখিবার জন্য কত বালক ত ভিন্ন স্থানে থাকিয়া স্কুল কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে, তুমি এফ, এ পড়িবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছ, তখন নিত্যানন্দের সহিত একত্র থাকাই বিধেয়, নতুবা সুদূর কাশীধামে পাঠের সুবিধা হইবে কেমন করিয়া; তোমার খুড়া মহাশয়ের আশ্রয়ে খুড়ীমার আদর যত্নে প্রতিপালিত হইতে কি তোমার কষ্ট?" পিতৃভক্ত অনাথ-নাথ সরল প্রাণে বলিলেন,— "না বাবা, যে খুড়া-খুড়ী আমাদের জন্য পাগল, আমাদের সুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছেন; দারুণ বিপদের সামান্য মাত্র উত্তাপ

আমাদের গায়ে লাগিতে দেন নাই ; এমন পরম দয়ালু খুড়া-খুড়ীর আশ্রয়ে থাকিতে আবার কষ্ট কি ? তবে আপনাদের সেবা করা হইবে না, প্রত্যহ দেবদেবীর পূজা করিতে পাইব না, এইজন্যই প্রাণে একটু আঘাত পাইতেছি।"

মোক্ষদা বলিলেন,—"বাবা ! একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারি না বটে, কিন্তু যখন তোকে ঠাকুরপোর আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি, তখন আর আমাদের ভাবনা নাই ; নিত্যানন্দের জননী তোমাকে আমাদের অপেক্ষাও ভালবাসিবেন, অসুখ বিসুখ হইলে আমার অপেক্ষাও প্রাণ দিয়া সেবা করিবেন। বাবা ! যাঁহাদের সেবায় আমরা বাঁচিয়া আছি, অপার দুঃখ-সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, আজ তাঁহারা তোমার সুখদুঃখ যে আমাপেক্ষা ভাল বুঝিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই সময় শান্তিরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের সহিত রামনিধির কাশীবাসের সঙ্কল্প, তিনি পূর্ব্বদিন হইতে শুনিয়াছিলেন ; তাঁহারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গুরুদেব বলিলেন,—"বৎস ! তুমি এই নূতন ব্রতী, সকল মায়া একেবারে ছাড়িয়া যাইলে, তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে পারে এবং তাহাতে কার্য্যের হানি হওয়া অসম্ভব নয়, কিছুদিন সংসারে থাকিয়া আমার প্রদর্শিত পথে চিত্ত সংযত কর, তারপর যাইও, কাশীত আর বেশী আয়াস সাধ্য নয় ? আশ্রিত গণকে কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিয়া, তাহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া যাইতে পারিলে, মনশ্চাঞ্চল্যের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, তখন পারত্রিক কার্য্য খুব ভালই হইবে।" গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শান্তিরাম আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। এক্ষণে অনাথকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন,—"বাবা ! তুমি কোথা যাবে, আর তোমার খুড়ীমা তোমাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন্ ! তিনি বলেন,—সকলে চলিয়া গেলে, আমি থাকিতে পারিব কেন ; আমি যে এক বই

তুই ভাবি না, গুরুদেবের সহিত সকলে যান, অনাথের যাওয়া হইবে না।"

পর যে কত আপনার হয় এবং কেমন করিয়া হয়, পাঠক এইখানে শান্তিরাম ও তদীয় পত্নীর প্রাণের টান দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্বার্থে যে সুখ নাই, পরার্থে যে তার পরাকাষ্ঠা, আত্মভোগে সুখ নাই, আত্মবিসর্জ্জনেই যে সুখ—তাহা এই আদর্শ পরিবারটীর ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপটী কি এখন আর কোথাও দেখিতে পাইয়াছেন?

অনাথনাথের যাওয়া হইল না, তিনি মনোহরপুরে শান্তিরামের আশ্রয়ে থাকিয়াই লেখা-পড়া করিবেন, অবকাশ সময়ে শান্তিরাম তাহাকে লইয়া কাশী যাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়া গেল। নিত্যানন্দ এতক্ষণ হতাশ হইয়া অনাথের বিচ্ছেদ ভাবনা ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল; যখন অনাথের এ বাটীতে অবস্থান করিয়া পাঠাভ্যাস করিবার বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন যুবক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; ভগবানকে তাহার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অনাথ না থাকিলে, তাহার সহিত একত্র আহার না করিলে, একত্র শয়ন উপবেশন না করিলে তাহার যে আদৌ সুখ হয় না, যে দেব-হৃদয় যুবক তাহার প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আপনার হইয়া গিয়াছে; তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইলে নিত্যানন্দ যে নিরানন্দ হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে? অনাথের যাওয়া হইল না দেখিয়া, সে প্রফুল্ল চিত্তে জননীকে সংবাদ দিতে গমন করিল।

সংসারের সকল বাসনার যখন শেষ হয়, হৃদয় যখন নির্ব্বেদ হয়, তীর্থবাস তখনই সকলের পক্ষে সমীচীন, তাহাতে তীর্থ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বসিয়া দেহমন পবিত্র করিতে পারা যায়। নতুবা প্রাণ-পোরা কামনা-বাসনার ভাণ্ডার লইয়া তীর্থবাসী হইলে

সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের মাত্রাই বাড়িয়া উঠে। মোক্ষদা রামনিধির সংসার বাসনার অন্ত হইয়াছে, পুত্রটী বড় হইয়াছে—সে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে, কন্যাটীরও আর কোন দুঃখ নাই, স্বামীর অতুল সুখের অধিকারিণী হইয়াছে; নিজেদের বিষয়-বৈভবের মায়াও কিছু নাই, তবে গুরুর সহিত ভূঃস্বর্গ কাশীধামে, তাঁহাদের প্রাণের দেবতার পদে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? আর ত বেশী দিন থাকিতে হইবে না; তবে কাশীতে শিবত্ব লাভের সাধ তাঁহাদের বৃথা যায় কেন? একদিন শুভদিনে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বন্ধু বান্ধবগণকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পূর্ণানন্দের সহিত মোক্ষদা ও রামনিধি কাশীবাসী হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।



প্রথম পরিচ্ছেদ।



পিতা-পুত্রী।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। ডেপুটী শ্যামাচরণকে রমজানের বিচার ব্যাপারে ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তিনি ঐ খুনী মামলার বিচার বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইয়া শেসন সোপর্দ্দ করিয়া নিজের দায়ীত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারপর ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

শ্যামাচরণের বয়স অনেক হইয়াছিল; এই ২৪ পরগণার কার্য্য হইতেই তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে; হঠাৎ স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে তিনি একান্ত শোকাতুর হইয়া হুগলীর বাটী চাবী বন্ধ করিয়া এক্ষণে একমাত্র কন্যা অপরাজিতা সহ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। গৃহ শূন্য হইয়াছে—শ্যামাচরণ বৃদ্ধ বয়সে বড়ই বিপন্ন; অর্থ যথেষ্ট আছে কিন্তু চারিটী অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য, সময়ে তাঁহার আহার হয় না; তিনি পাচক ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্নজল গ্রহণ করিতে কখন অভ্যস্থ নহেন, কাযেই স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছে। কন্যা অপরাজিতা এখন উপযুক্তা হইয়াছেন, যৌবনের শেষ সীমায় উপস্থিত তথাপি তিনি পিতাকে দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারেন না। চিরদিনের মত এখনও সেই হাবভাব লইয়া নিজের অঙ্গশোভা বর্দ্ধনে সতত বিব্রত; পিতার কি হইল না

হইল,—তাহা দেখিবার সময় তাঁহার নাই। শ্যামাচরণ চিরদিন স্বেচ্ছায় যে বিষতরু রোপণ করিয়া আসিয়াছেন—আজ তাহার ফলভোগ করিয়া জর জর হইয়াছেন। কন্যার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার ভবিষ্যত জীবনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কন্যার গতিবিধি, তাহার জীবনস্রোতের বক্রভাব দেখিয়া এক্ষণে তিনি বড়ই চিন্তান্বিত ; তারাদাসকে গৃহে আনিবার জন্য তিনি কত চেষ্টা করিয়াছেন; কতদিকে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বে তাহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমূল্যচরণ—কিন্তু সেত আর এখন নাই ; এখন তারাদাসকে না পাইলে এত কষ্টের বিষয় আশয় তাঁহার অবর্ত্তমানে যে কিরূপে নষ্ট হইবে, তাহা মানসচক্ষে দেখিয়া বৃদ্ধের নয়নে সময়ে সময়ে জল আসে, কিন্তু উপায় কি ? মঙ্গল-ঘট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া স্নেহের নিধিকে উপেক্ষায় হারাইয়া এখন ভাবিলে আর কি হইবে? তাঁহার অবর্ত্তমানে অপরাজিতার অবস্থা যে কি ভয়ানক হইবে; তাহা চিন্তা করিয়া শ্যামাচরণের আনন্দ-বর্দ্ধিত দেহ-তরু দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া এক্ষণে সে বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

যৌবনকালে মানবের সমস্ত প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে, নরনারীকে নাক-ফোঁড়া বলদের মত দৌড়াদৌড়ি করায়, এ সময় মানুষ যদি সংযমী হইতে না পারে, যদি আসক্তি-স্রোতে গা ভাসান দিয়া অহরহঃ বিলাস-বাসনায় ব্যাপৃত থাকে, কাম-কামনার ইন্ধন যদি তাহাতে অবিরত সংযুক্ত করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ভীষণতা যে কি বিভীষণ —কিরূপ মর্ম্মদাহী, কিরূপ চরিত্র নষ্টকারী—তাহা সহজেই বিবেচ্য। অপরাজিতা নিজদোষে বহুদিন স্বামী পরিত্যক্তা। স্বেচ্ছায়, নিজের ব্যবহার দোষে তিনি অমন দেবোপম স্বামীর সহবাস সুখে বঞ্চিতা

হইয়াও, একদিনের জন্য চিন্তিতা নহেন; সেই শিবতুল্য স্বামীর অভাব বোধ করিয়া একদিনের জন্যও দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হৃদয় বেদনার ভাব পরিব্যক্ত করা, তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। শ্যামাচরণ তারাদাসের অন্বেষণে কতবার চেষ্টা করিলে অপরাজিতা বলিতেন,—"সে চেষ্টা বৃথা, খুঁজিয়া পাইলেও আমাদের আচার-ব্যবহারে তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাহাদের সে পাড়া-গাঁয়ে গোঁড়া হিন্দুভাব—সন্ধ্যাহ্নিকের যোগাড়, পূজার অয়োজন এখানে কে করিবে বলুন?" অপরাজিতা চিরদিন বিবিয়ানা ভাবে লালিত পালিত, এখন সে ভাব ছাড়িয়া হিন্দুর ভাবে পূজা-পার্ব্বণে মন দিতে, স্বামীকে দেবতা ভাবিয়া সেবা করিতে পারিবেন কেন; তিনি ত প্রথম দিন দেখিয়া ছিলেন, অনেক বিবিয়ানা চালও চালিয়া ছিলেন কিন্তু তারাদাস তাহার ভাবে মজিয়া বিভোর হইতে রাজী নহেন; তবে তেমন অসভ্য স্বামীকে তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গী করিয়া লাভ কি? শ্যামাচরণ কন্যার মতিগতি দেখিয়া ভাবিয়া আকুল হইতেন, মনে মনে শত ধিক্কার দিয়া বলিতেন,—"হায়! কি কুক্ষণেই আমি অর্থের মোহে মত্ত হইয়া অপরাজিতাকে মেমসাহেব রাখিয়া লেখা-পড়া শিখিয়াইয়াছিলাম, বাল্যের এ বিজাতীয় শিক্ষাই এখন কাল হইয়াছে; তাহার সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া এ শিক্ষার মোহ ঘুচিবে না।"

শ্যামাচরণ আর ভাবিতে পারেন না, সুদূর ভবিষ্যতের অতল-স্পর্শ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া এখন লাভ কি? এখন বর্ত্তমান চিন্তাই যে বড় ভয়ানক, রন্ধন অভাবে আহার হয় না, দুই একদিন পিতার অতিরিক্ত তিরস্কারে অপরাজিতা রন্ধন-শালায় গিয়াছিলেন, পাকপ্রণালী পুস্তকখানি লইয়া উড়ে বেহারার সাহায্যে রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দু সাধারণের গৃহে পাকপ্রণালীর সাহায্যে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কোন পরিপক্ক গৃহিণীর নিকট হাতে

হাতে শিক্ষা না করিলে কেবল পুস্তকের সাহায্যে তাহা হয় না। দুই একদিন অপরাজিতা চতুর্গুণ খরচ করিয়া চোঁয়াপোড়া একপ্রকার রাঁধিয়া ছিলেন, দ্বিতীয় দিন দারুণ গ্রীষ্মে হাতে কালী লাগিবার ভয়ে, সাত পুরু কাপড় জড়াইয়া খুন্তীবেড়ী ধরিতে গিয়া চুল্লী হইতে গরম ঝোলের অগ্নিময় পাত্রটী ভূমিসাৎ হইয়া,—তাঁহাকেও ভূমিসাৎ করিল, ঝোল গায়ে পায়ে পড়িয়া তিনি পুড়িয়া গিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, শ্যামাচরণ ব্যাপার বুঝিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় আসিলেন, ডাক্তার ডাকিয়া তাঁহার সে যন্ত্রণার শান্তি করিলেন।

ইহার পর শ্যামাচরণ হুগলী হইতে কোন পরিচিত দুঃস্থ ভদ্রলোকের একটী বৃদ্ধা বিধবাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন; বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্রকে বাসায় রাখিয়া ভাল চাকুরী করিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া রন্ধনকার্য্যে ব্রতী করেন। সেই অবধি চারুচন্দ্র মাতার সহিত ডেপুটীর গৃহে স্থান পাইয়াছে। চারুচন্দ্র যুবা পুরুষ; দরিদ্রতা হেতু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই—অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিবাহ করিবে—ইহাই তাহার ইচ্ছা। যুবকটী অতি প্রিয়দর্শন, চরিত্রও বেশ নির্ম্মল, যৎসামান্য ইংরাজীও জানিত। শ্যামাচরণ কলিকাতার কোন আপিসে তাহাকে শিক্ষানবীশী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সকাল সন্ধ্যা আপনার তেজারতী কার্য্যে সুদের হিসাব ও তাগাদা ইত্যাদি বিষয়ে বাহাল করত মাসিক কিছু কিছু দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। বলা বাহুল্য যে শ্যামাচরণের আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার বদান্যতা দর্শনে অত্যন্ত প্রীতমনে তাহারা নিজের সংসারের মত কায চালাইতে লাগিল। শ্যামাচরণ সময়ে ক্ষুৎপিপাসায় অন্নজল পাইয়া এই বৃদ্ধ বয়স কিছু শান্তি-সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কারামুক্তি।

রমজান কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছে। মুসলমান সমাজে কারাদণ্ডে-দণ্ডিত রমজানকে আর কেহ স্থান দিল না; চরিত্রদোষে সে আজ নিজ সমাজ হইতে বিতাড়িত। শ্যামাচরণের সে অনেক টাকা ধারিত এবং অনেক টাকা অতিরিক্ত সুদে খাটাইয়া দিয়া এক সময়ে সে শ্যামাচরণের বড়ই প্রিয় পাত্র হইয়াছিল।

রমজান খালাস হইয়া আসিলে শ্যামাচরণ টাকার তাগাদা করিলেন এবং বলিলেন আর টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারিবেন না—তমস্থক তামাদি হইয়া গিয়াছে; হয় টাকা দাও, না হয় তোমার দেশের জমিজমা আমার নামে লিখিয়া দাও, নতুবা আমি এই আজুহাতে তোমার নামে নালিশ করিয়া পুনরায় শ্রীঘরে পুরিব। রমজান বিপদে পড়িল—শ্যামাচরণ অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী, মনে করিলে নিশ্চয়ই টাকার দায়ে তাহাকে পুনরায় জেলে পুরিতে পারেন। নিরুপায় রমজান শান্তিপুরের কতক জমি বিক্রয় করিয়া সমস্ত আসল টাকা পরিশোধ করিল এবং যোড়হাতে বলিল,—"বাবু! আমার আর কিছুই নাই, আমি পথের ভিখারী, সুদ দিতে পারিব না—আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

শ্যামাচরণ আসল পাইবার আশাই একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, টাকা না দিলেই বা কি হইত, এ বৃদ্ধ বয়সে নালিশ হাঙ্গামা করাত বড় সহজ নয়! যখন চক্ষু রাঙ্গাইয়া আসল টাকাগুলি আদায় হইল, তখন সুদের আশা করিয়া আর কায নাই। শ্যামাচরণ রমজানের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন,—"রমজান! তুমি বিষম বিপদে

পড়িয়াছ বুঝিতে পারিতেছি ; যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দালালী কর, লোক ভাল হইলে আমি তোমার মারফৎ টাকার আদান প্রদান করিব।" রমজান কাঁদিয়া কাটিয়া বাবুর আশ্রয় ভিক্ষা করিল—ডেপুটী তাহাকে অভয় দিয়া দালালী কার্য্যে পুনরায় অগ্রসর হইতে বলিলেন।

স্বজাতীর নিকট রমজানের আর যাইবার ক্ষমতা নাই। মুসলমান সমাজ আর তাহার ন্যায় নষ্ট-চরিত্র মদ্যপায়ীকে প্রশ্রয় দিতে চায়না, মুসলমান সমাজের আঁটাআঁটী এখন খুব বেশী ; আর হিন্দু সমাজ— যাহার বিধি-বিধান, সুশৃঙ্খলা সকল সমাজের অনুকরণীয়, তাহার দুরবস্থা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে ; বন্ধন ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, বিধিব্যবস্থাও আর নাই। নতুবা শ্যামাচরণ হেন শিক্ষিত হিন্দু আজ রমজানের ন্যায় দুর্বৃত্তকে আশ্রয় প্রদান করেন ! ডেপুটী সার্ব্বজনীন উদার-নীতির প্রভাবে দরিদ্র রমজানকে আশ্রয় দিলেন, সে একদিন একজন সাধু চরিত্র ব্রাহ্মণকে কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছিল, কিরূপ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহা জানিয়া শুনিয়াও তিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন না—কোলে টানিলেন। সময় পাইলে এই বিষধর যে তাঁহার শিরে আবার দংশন করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে।

রমজান এখন মুসলমানের বেশ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঠিক হিন্দুর মত পোষাক-পারিচ্ছদ পরিয়া, সে কলিকাতা সহরে ঘুরিয়া বেড়ায়। চেহারাটীও হিন্দুর মত ছিল, চিরদিন হিন্দুনিসেবিত গণ্ডগ্রাম শান্তিপুরে বাস করিয়া হিন্দুর ধরণ-ধারণ সে অনেক শিখিয়াছিল। তখন সময় ভাল ছিল বলিয়া হিন্দুত্বকে, মদ্য-মাংস বিহীন আহার ব্যবহারকে সে ঘৃণা করিত, এক্ষণে সেই ঘৃণিত ভাব তাহার পরম উপকার সাধন করিল। সে ভাবে তাহাকে কেহই অহিন্দু বলিয়া চিনিতে পারিল না। মানুষ কিছুতেই চিরাভ্যস্ত স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। রমজান হিন্দু স্ত্রীকে নিকা করিয়া মুসলমান সমাজের মান বাড়াইবার

চেষ্টা করিয়াছিল; এক্ষণে মেয়াদ-খালাসী বলিয়া মুসলমান সমাজ তাহাকে গ্রাহ্য করিল না, সে সমাজে বিবাহ করিয়া রমজান আর আপনার আশা মিটাইবার পন্থা দেখিতে পাইল না। এখনও তাহার দেহ সবল ও সুস্থ, হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি এখনও বিশেষ পরিপুষ্ট, বিবাহ না করিলে সে একাকী কেমন করিয়া থাকিবে! সে প্রত্যহ বাবুর বাটীতে যায়—কাহারও জমী-বন্ধকের সংবাদ, টাকা ধার লইবার সংবাদ দেয়। সময়ে সময়ে ঐরূপ দুই একটী কাযে সে মোটা দালালীও পাইতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় আবার তাহার সকল অভাব মোচন হইল, কেবল যাহা একটী রহিল, তাহা কি আর মোচন হইবে?

চেহারাটী ভাল হইলে, ভাল করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতে পারিলে দালালী কার্য্যে বিনা মূলধনে যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহা আর কোন ব্যবসায়েতে হয় কিনা সন্দেহ। বচন-পারিপাট্যই এ ব্যবসায়ের পুঁজি মূলধন; যে যত বাক্যবাগীশ হইতে পারিবে, এ ব্যবসায়ে তাহার তত উন্নতি। রমজান এ কার্য্যে পূর্ব্ব হইতে খুব পারদর্শী ছিল, কাযেই উন্নতি করিতে তাহার বেশীবিলম্ব হইল না; পশ্চাতে যখন ধনবান ডেপুটী শ্যামাচরণ রহিয়াছেন, তখন ভাবনা কিসের?

কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমজান কয়েকদিন স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া যেন শুখাইয়া গিয়াছিল, এখন আবার সে সরস সবল কান্তি বিশিষ্ট হইয়া বাঙ্গালী বাবুটীর মত পোষাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজব সহর কলিকাতায় তাহার বাবুয়ানার কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিল না, সে টাকার হিসাব পত্র করিতে শ্যামাচরণের বাটী যাইত; সময়ে সময়ে অপরাজিতার সহিত যে তাহার চক্ষোচক্ষী হইত না—তাহা নহে, তবে অপরাজিতা তাহাকে দেখিতে পারিত না; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত; তাহার এমন রূপের চটকে, পোষাকের ঠমকে অপরাজিতার

মন উঠিত না, তাহার উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা বহুদিন হইতে তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহাতে অপরাজিতার মন পাওয়া একান্ত দুষ্কর, কিন্তু অকৃতজ্ঞ রমজান এতদিন কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া এইবার অপরাজিতারই উপর ঢলিয়া পড়িল; কেহ কোথায়ও না থাকিলে সে দুই একবার চক্ষের ইঙ্গিত মারিতে ছাড়িত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রণয়-সঞ্চার।

অপরাজিতার প্রাণটা পড়িয়াছিল—পাড়াগাঁয়ের ভাল মানুষের ছেলে চারুচন্দ্রের উপর। চারুর সুগোল গঠন, নধর অধর, গৌরবর্ণ সুললিত কান্তি অপরাজিতাকে অধীরা করিয়াছিল, কিন্তু চারু এ সকল বিষয়ে নির্দ্দোষী, এ রসের ধার সে আজ পর্য্যন্ত ধারে না, রমণীপ্রণয়ের বিন্দুমাত্র সে বুঝে না, মায়ের আদুরে গোপাল, ভাল করিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই আনন্দ বোধ করিত, সুখের অবধি থাকিত না। সে বিবাহের নাম পর্য্যন্ত করে না, তার মাও সে বিষয়ে কোন কথা ঘুণাক্ষরে একদিনও প্রকাশ করে নাই। যে খাইতে পায় না, জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান যাহার নাই—যে নিরাশ্রয়, তাহার আবার এ বিপত্তি কেন, কাঙ্গালের ছেলের রঙ্গাইনাচ কি ভাল দেখায়! আগে চারুর চাকুরী বাকরী হউক, তারপর বিবাহের কথা। চারুকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে—বড়লোকের আশ্রয়ে সে কর্ম্মে বাহির হইতেছে, মাসিক কিছু মাহিনা হইলেই তাহার বিবাহ আপনিই হইবে, সে যে সোণার চাঁদ ছেলে, গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল চরিত্র, তার আবার বিবাহের ভাবনা কি?

চারুচন্দ্র বৈঠকখানায় বাবুর নিকট শুইত, তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি করিত; প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাবুর সুদ কসিত, তেজারতীর তাগাদা করিত, তার পর দশটা বাজিলেই সে বাটী আসিয়া কলের জলে স্নান করিয়া আহারান্তে অফিসে যাইত, সেই সময়ের মধ্যেই অপরাজিতা আসিয়া তাহার আহারাদির বিষয়ে একবার খবর লইতেন, তাহার হাতে কয়েকটা পানের খিলি দিয়া একবার চক্ষু বাঁকাইতে ছাড়িতেন না—হতভাগ্য যুবক কিন্তু ইহার বিন্দু বিসর্গও না বুঝিয়া হাত মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি অফিস ছুটিত।

যাহাদের আশ্রয়ে থাকা যায়, তাহারা যদি সকলে ভালবাসে, তাহা হইলে আশ্রিতের বুকটা পূর্ণ হইয়া উঠে; সে বুঝে যে তাহার কার্য্যে কোনও প্রকার ক্রটী হইতেছে না, সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট। চারুচন্দ্র ও তাহার মাতার সেই ভাবই মনে হইত। ডেপুটী শ্যামাচরণ ত তাহাদের খুব ভালবাসেন, মেয়েটীও তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অসন্তুষ্ট নয়, তিনি আমার চারুর খাওয়া-পরার কত সুখ্যাতি করেন, আপনি পান সাজিয়া আনিয়া দেন; কাপড়-জামা ময়লা হইলে ভাল কাপড়-জামা আনিয়া দিয়া নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসেন। আহা! মেয়েটীর খুব বাড় বাড়ন্ত হউক, স্বামী-পুত্র লইয়া সুখে থাকুক।

একদিন বৃদ্ধা কাযকর্ম্ম সারিয়া অপরাজিতার কক্ষে গিয়া বসিল। তখন অপরাজিতা বালিসে ঠেস্ দিয়া একখানি নভেল পড়িতেছিল; মনে কি ভাবের উদয় হইয়া চক্ষু একটু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"কি গো মা! বেলা যে অনেক হ'য়েছে, বাবুর খাওয়া হ'য়ে গেছে; তুমি খাওয়া দাওয়া কর না। তাহা হইলে যে আমি অন্য কায পাই। চারুর দুই একখানি কাপড় ও জামাতে সাবান দিতে হবে।" অপরাজিতা বলিলেন,—"কাপড়ে আবার সাবান দেওয়া কেন? সাবান দেওয়া জামা-কাপড় কি আবার ভদ্রলোকে

পরে? সেদিন যে জামা কাপড় দিয়াছিলাম, তাহা কি ময়লা হইয়া গিয়াছে?"

বৃদ্ধা। হাঁ মা! অত্যন্ত ময়লা হইয়াছে, তাই সাবান দিয়া এ কয় দিন চালাইব।

অপরাজিতা শয্যা হইতে নামিয়া কুঞ্জিকাগুচ্ছ সাহায্যে বড় একটী ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটী ভাল গরদের কোট ও একখানি ভাল দেশী কাপড় বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন,—"সাবান দিবার দরকার নাই, রজক আসিলে সে সব তাহাকে দিও, চারুকে এই কাপড়-জামা প'রতে ব'লো, বাড়ী থেকে সাবান লাগান কাপড় প'রে বেরুলে যে আমাদের বদনাম হবে।"

বৃদ্ধা থতমত খাইয়া কহিল, "হাঁ তা বটে মা—তা বটে; তবে কি জান, গরীবের ছেলের তাতে দোষ কি; এ সব কি আর এ জন্মে ও প'রতে পেতো?"

অপরাজিতা মনে মনে বলিলেন,—"তোমার ছেলেটা যে হত-ভাগা, আকার-ইঙ্গিত কিছুই বুঝে না, তাহা হইলে কি আর এত কষ্ট ক'রে শিক্ষানবীশি ক'র্ত্তে যেতে হ'তো!" তার পর তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘস্বরে বলিলেন,—"তা হ'লে কি হয়, বড়লোকের আশ্রয়ে যে আছে, এখন ওর জন্য আমাদের যে নিন্দে সইতে হবে?"

বৃদ্ধা। আহা মা, একথা কি আর সকলে বুঝে, সকলে কি আর আশ্রিতকে এরূপ জামাই-আদরে খেতে-প'রতে দেয়?

আর কোন কথা হইল না, বৃদ্ধা বলিল,—"মা! তুমি তবে কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস, আমি গদাধরকে বাজারে দই আনিতে পাঠাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধা মনে মনে শত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নীচে আসিয়া গদাধর বেহারাকে বাজারে পাঠাইয়া দিল।

শ্যামাচরণ প্রত্যহ চারুকে নূতন নূতন জামা-কাপড় পরিতে দেখিয়া

এবং তাঁহারই পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া মনে মনে করিতেন, গরীবের ছেলের ত কাপড়-জামা বেশী নাই, বোধ হয় বুড়ি অপরাজিতার কাছে ঐ সকল চাহিয়া লয়। আর লইলেই বা, আমার আর কে পরিবে, পড়িয়া পড়িয়া মাটী হইবে বইত নয়, যদি একটা গরীবের ছেলে মানুষ হয় হউক না; শ্যামাচরণের প্রাণটী এখন একটু একটু ধর্ম্মের দিকে যাইতেছিল। যখন প্রতিপালন করিবার লোক প্রচুর ছিল, তখন কিন্তু প্রাণটা এত উদার হয় নাই, এখন বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি যত্নটা হইয়াছে।

ভদ্রঘরের মেয়ে অপরাজিতা, বাপ যথেষ্ট বড়লোক, কিন্তু আমি এতদিন রহিয়াছি, কই অপরাজিতাকে ত শ্বশুর বাটী যাইতে দেখি নাই, জামাইবাবু কই আসে না, তবে কি অপরাজিতা বিধবা, না তাই বা কেমন করিয়া হইবে, আমাদের মত না হউক, সীমন্তে বড়লোকের মত একটী ছোট্ট সিন্দুর টীপ ত আছে। খুব বড়লোকের মেয়েরাও বিধবা হইলে ত অমন টীপ পরে না। তবে এ কিরূপ! বৃদ্ধা একদিন শ্যামাচরণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কিন্তু কোন সদুত্তর পায় নাই; আশপাশ কথা পাড়িয়া তিনি সে কথা চাপা দিয়াছিলেন। তারপর একদিন অপরাজিতাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে চোক মুখ লাল করিয়া নিজের দোষ ঢাকিয়া বলিয়াছিল,—"তারা অতি ছোট লোক, ঘটকের দ্বারা বাবা প্রতারিত হইয়া একটা অঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাই তাহারা আমাদের বাটী মাথা গলাইতে সাহস করে না, আমরাও তাহার কোন সন্ধান লইনা, মান-ইজ্জৎ ত আগে? আমি ত আর মূর্খ মেয়ে মানুষ নই যে, ইন্দ্রিয় দমন ক'র্ত্তে পার্‌বো না, আর স্বামী স্ত্রীতে একত্র থাক্‌লেই ত কতকগুলা ছেলে-পিলে হবে, শরীর মাটী হবে, তাতে কায কি মা?"

বৃদ্ধা পলকহীন চাহনীতে অপরাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া মনে

মনে বলিল,—"ওমা! এ আবার কি কথা, মেয়ে মানুষের মুখে ত এমন কথা কখন শুনিনি, ছেলে-পিলে হবে ব'লে স্বামীর ঘর করে না, এ কেমন মেয়ে মানুষ; বড়লোকের তবে বুঝি এই রকমই হয়। ঐ বেনেদের মেয়েটাও ত লেখা-পড়া শিখে ভাতারের ঘর করে না, থুব্‌ড়ী হ'য়ে ঘরে ব'সে রয়েছে, লেখাপড়া শিখিলে বুঝি প্রাণটা ঐরূপ কঠিন হ'য়ে যায়, নইলে স্বামী দেবতা, কোন্ মেয়ে মানুষ আর তাকে না দেখে থাকৃতে পারে, বিশেষতঃ এমন সোমত্ত বয়সে।" বৃদ্ধা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু পাইল না, আর চিন্তাই বা কিসের, যে যেমন কায ক'র্ব্বে, সে সেই রকম ফল পাবে, আমি দুঃখী হয়ে বড়লোকের ভাবনা ভাবি কেন? মুখ্যু মেয়ে মানুষেরাই বুঝি স্বামীকে দেবতাভাবে পূজা করে, লেখা-পড়া শিখ্‌লে বুঝি করেনা; কায নাই মা আমার লেখা-পড়ার জ্ঞান বুদ্ধিতে; মা বোন্ না ক'রে এসেছে তাই ভাল।" বলিয়া বৃদ্ধা একটু মন মরা হইয়া নিম্নতলে নামিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, চারু অফিস হইতে আসিয়া জামাটী খুলিয়াছে কিন্তু কি পরিবে ভাবিয়া মাকে ডাকিতেছিল। বৃদ্ধা নীচে গিয়া বলিল,—"বাবা! ঐ কাপড়খানিই পরিয়া থাক, তোমার দিদিমণি আফিসে যাইবার জন্য আজ আর একখানি ভাল কাপড় দিয়াছেন।" চারু হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিল। ডেপুটী তখন সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কাযেই কোন কাযকর্ম্ম নাই, বাবু না আসিলে ত কাহার হিসাব নিকাশ হইবে না, চারু নীচের বারান্দায় বসিয়া জননীর সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিল। বৃদ্ধা পুত্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে বরের কায কর্ম্ম করিতে লাগিল, গদাধর বেহারা দ্রব্যাদি খরিদের জন্য বাজারে গেল।

বাটীতে বেশী লোকজন নাই আর চারুও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, এমন সুযোগ ত আর হইবে না দেখিয়া অপরাজিতা হাবভাবে সজ্জিতা হইয়া, নানা প্রকার এসেন্সে দেহ চর্চ্চিত করিয়া

নামিয়া আসিল এবং চারুকে মৃদু হাসির লহরে কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—"কখন এলে চারু!"

"এই আস্‌ছি দিদিমণি" বলিয়া চারু শশব্যস্তে একটু সরিয়া বসিল। "আহা! ওকি, ঐখানেই ব'সো না; আমি কি আর এত বড় বারান্দাটা যুড়িয়া বেড়াইব।" চারু প্রত্যেক কার্য্যে প্রভু কন্যার মান রাখিতে যায় কিন্তু অপরাজিতা অমন মান পাওয়ার প্রত্যাশা তাহার নিকট করে না; তার ইচ্ছা চারুও তাহার মত হেসে হেসে তাহার সহিত কথা কয়; তাহার আকার-ইঙ্গিত শুনে। পাড়াগাঁয়ের যুবক চারু কিন্তু সে সব বুঝে না, সে রসে রসিক হইতে তাহার এখনও অনেক বাকী। অপরাজিতা তাহার ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিত এবং বলিত এটা কি বদরসিক। বুড়ো মিন্সে কিছুই কি বুঝে না গা। অপরাজিতা কিন্তু হাল ছাড়িল না, নেকামী করিয়া চারুর পীঠে একটী চাপড় মারিয়া বলিল,—"চারু! তুমি বড় নোঙরা, গায়ে এত ধুলা কেন?" অপরাজিতা মনে করিয়াছিল—যুবকের গাত্র স্পর্শে তাহার দেহ হয়ত কণ্টকিত হইবে! কিন্তু কই, সে ত অচল-অটল, বিন্দু-বিসর্গও বিচলিত হইল না। সে সরল হাসি হাসিয়া বলিল,—"দিদিমণি! দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলাম বলিয়া গায়ে ধূলা লাগিয়াছে।" অপরাজিতা একটী গোলাপী খিলি তাহার হাতে দিয়া বলিল,—"জল খাইয়া পান পাও নাই বুঝি—এই নাও।" চারু অকপট হৃদয়ে তাহা অপরাজিতার হাত হইতে লইল এবং হাসিতে হাসিতে বদনে ফেলিয়া দিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, শ্যামাচরণ বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলেন এবং বৈঠকখানায় আলো দিবার জন্য গদাকে ডাকিলেন, গদা তখনও বাজার হইতে গৃহাগত হয় নাই; কাজেই চারু তাড়াতাড়ি দেয়াশালাই হস্তে বৈঠকখানায় ছুটিল এবং ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ঘরের আলোটী জ্বালিয়া দিল। সেদিন রমজান সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার কি একটা হিসাব তুলিয়া

দিতে হইবে; আদেশ মাত্র চারু খাতা পত্র পড়িয়া হিসাব তুলিতে লাগিল। শ্যামাচরণ সমস্ত বলিয়া দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "রমজান! অত অল্প সুদে আর টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারা যাইবে না—তুমি টাকা আদায় না কর, আর তোমার যদি এত লজ্জাই হয়, তাহা হইলে বল, আমি চারুকে পাঠাই?"

"আজ্ঞে না, উহাকে আর পাঠাইতে হইবে না, আমি দুই একদিনের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করিয়া কড়া তাগাদা করিব—নালিশের ভয় দেখাইব, তাহা হইলে টাকা দিতে পথ পাইবে না।"

চারুচন্দ্রের কমনীয় দেহলতা, তাহার সরল হাস্য দেখিয়া অপরাজিতা তাহাকে একেবারে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, একেবারে তাহার হইয়া গিয়াছিল—তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, চারুর গলার আওয়াজ শুনিলে সে শত কর্ম্ম ফেলিয়া নীচে আসে, তাহার সহিত কথা কহে, কটাক্ষ শরাশনে বিদ্ধ করিতেও ক্রটী করে না কিন্তু সে যে পাষাণ, ফুলশর কি তাহাকে বিঁধিতে পারে? অপরাজিতা বুঝিল—এ যেরূপ বদ্‌রসিক, তাহাতে দুই চার দিনের কর্ম্ম নয়; কিছুবেশী দেরী লাগিবে, তবে এই চারুই উপযুক্ত পাত্র, ইহাকে বাগ মানাইতে পারিলে, যাহা বলিব সে তাই করিবে, যা শিখাইব তাই শিখিবে, আমার প্রণয় যখন সে বুঝিবে, তখন গোলাম হইয়া যাইবে। অপরাজিতা মাছ ধরিবার জন্য জাল পাতিয়া বসিল।

চারু শ্যামাচরণের সহিত হিসাব-নিকাশ করিতেছে, তিনি দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন; অপরাজিতা তাহার বিপরীত দিকের গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া চারুর রূপ-মাধুরী দেখিতে লাগিল। আহা! আলোর কাছে ও সুন্দর মুখখানির কেমন বাহার হয়। চারুচন্দ্রের রূপ দেখিতে দেখিতে রমজানের নজর তাহার উপর পড়িল; অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ বদন অবনত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রমজান সে ইন্দিবরশ্যাম রূপে অনেক দিন নিমজ্জিত হইয়াছিল, কতদিন চক্ষে চক্ষে চাহিয়া সে বিফল মনোরথ হইয়াছিল, তাহার আশা মিটিবার কোন পথ নাই, আকার ইঙ্গিতে তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহার প্রাণে হিংসা জাগিয়াছিল। অপরাজিতা চাকর রূপেই মজিয়াছে, তাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, বুড়া ডেপুটী মরিয়া গেলে, এই বেটাই মজা লুটিবে দেখিয়া হিংসানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। রমজান পূর্ব্বের ন্যায় ষড়যন্ত্র করিয়া অপরাজিতার সর্ব্বনাশ করিতে সাহস করিল না, এ ত আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ জ্ঞাননিধির কন্যা বিমলা নয়, এ যে অতুল ধনের অধীশ্বর, অবসর-প্রাপ্ত হাকিম শ্যামাচরণের কন্যা অপরাজিতা! তথাপি কুটিল-প্রাণ যবনাধম রমজান আশা ছাড়িতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—()—

চিত্তপরিবর্ত্তন।

পেন্‌সন লইয়া বেশী দিন ভোগ করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। শ্যামাচরণ এইমাত্র কয়েক বৎসর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কোথায় আজীবন কঠোর পরিশ্রমের পর কিছুদিন শান্তি সুখভোগ করিবেন, আনন্দে এ বৃদ্ধ বয়সটা কাটাইবেন, না ইহারই মধ্যে তাঁহার শরীর জরা-ব্যাধির আকর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের বহুমূত্ররোগ এত-দিন নীরবে থাকায় ধারণা হইয়াছিল, যে তাহা আরোগ্য হইয়াছে, এখন সময় পাইয়া সে মাথা তুলিয়া বসিল; তাহার সহ ছোট ছোট আরও অনেক ব্যাধি সঙ্গারম্ভ করিতে লাগিল। বহুমূত্র পীড়া সহ্য করিয়া দেহ নষ্ট হইতেছে, তাহার উপর নিত্য নূতন নূতন ফোঁড়া, পেঁচড়া, সর্দ্দী কাশীতে তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। শ্যামাচরণ কলিকাতার

বড় বড় কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বিবিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের এ রোগ কিছুতেই সাম্যভাব ধারণ করিল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, দেহ কঙ্কালসার হইয়া আসিল। তেমন যে ভোগপুষ্ট সবল দেহ—কয়েক মাসের মধ্যে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া গেল।

সচ্ছন্দতাই সকল রোগের পরম ঔষধ, তুমি যত ঔষধ খাও আর নাই খাও, মনকে সুস্থির করিতে পারিলে, জাগতিক সমস্ত চিন্তার হস্ত হইতে একে একে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিলে, তোমার রোগ আপনিই সারিয়া যাইবে, কোনও ঔষধাদি খাইতে হইবে না, এই জন্য সংসার বিরাগী বিবেকশালীদের পীড়ার আক্রমণ এত কম, তাঁহারা কখন ঔষধের বা চিকিৎসকের ব্যবস্থার ধার দিয়াও যান না। শ্যামাচরণ প্রৌঢ় বয়সে সরকারী কাযে ব্যাপৃত থাকিয়া বরং ছিলেন ভাল, এখন অবসর গ্রহণ তাঁহার কাল হইল, মনে করিয়াছিলেন—সুখে থাকিবেন, না অসুখের সমুদ্রে পড়িয়া জীবন জর জর হইয়া যাইতেছে। হায়! অভাগিনী অপরাজিতা, কেন তুমি কুলের কণ্টক হইয়া বৃদ্ধের এ বৃদ্ধ বয়সে উদ্বেগময় প্রাণঘাতী দারুণ চিন্তার অনল জ্বালিয়া দিলে—কিন্তু অপরাজিতার দোষ কি? শ্যামাচরণ যে নিজেই নালা কাটিয়া বন্যার জল গৃহে ঢুকাইয়াছেন, এখন ভাসিয়া যাইবার ভয় করিলে চলিবে কেন? হিন্দুর কুল-ললনাকে হিন্দুর আচার-বিচার বর্জ্জিত করিলে, বিজাতীয় ভাবে শিক্ষা দিলে তাহার পরিণাম ত এইরূপই হইবে। অপরাজিতা দিন দিন যেরূপ প্রগল্‌ভা হইতেছে; তিনি বর্ত্তমানেই যেরূপ লজ্জাহীনা হইয়া পর পুরুষ প্রসঙ্গ করিতেছে, অবর্ত্তমানে না জানি সে আরও কত হইবে, পরম পবিত্র বংশে কলঙ্ক লেপন করিতে সে কিছুতেই ছাড়িবে না। হায়! বাবা তারাদাস! তুমি কোথায়! অর্থের মোহে তোমার ন্যায় দরিদ্র জামাতার আবশ্যকতা তখন

বুঝি নাই, অবহেলায়-উপেক্ষার তাড়নায় তোমাকে হতশ্রদ্ধা করিয়া নিজের পরিণাম নিজে নষ্ট করিয়াছি। কন্যা যেমন বিদুষী হইয়াছিল, জামাতাও আমি অকাল-কুষ্মাণ্ড করি নাই, চূড়ান্ত শিক্ষিত জামাতার করেইত কন্যা অর্পণ করিয়াছিলাম। সে যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আর এ মুখ হইল না, সে দোষত আমাদেরই, আমরাই ত তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপহাস করিয়াছি। আমার মুখাপেক্ষী হইয়া গৃহ-জামাতা থাকিবে—অভাবে পড়িলে সে সমস্ত ছাড়িয়া আমার অন্নদাস হইবে, ধনের অহঙ্কারে যে তখন তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। সে সিংহের শিশু, না হয় কিছুদিন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পরম আত্মীয় হইয়া আমার এরূপ ববহার করা কি উচিত হইয়াছে? সে অধর্ম্মের প্রতিফল যে আমাকে ভুগিতে হইবে! শ্যামাচরণ আর ভাবিতে পারিলেন না—মাথা ধরিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে দিন রাত্রে শ্যামাচরণের জ্বর হইল—দারুণ গাত্র-দাহে বিকারের রোগীর মত কত ভুল বকিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল—এ বিপদের অবস্থায় বৃদ্ধাই এখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় স্থল; আর তিনি পর হইয়াও এখন যেরূপ আপনার মত করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে তিনি শ্যামাচরণের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, নতুবা শুধু বেতনভোগী কখন এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করিতে পারে না। অপরাজিতা পিতার অসুখ শুনিয়া রাত্রে একবার মাত্র আসিয়া তাপমান যন্ত্রে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়াছিল, তারপর বৃদ্ধা ও চারুচন্দ্র সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিল। চারুকে সে সমস্ত রাত্রি এরূপ ভাবে বসিয়া জাগিতে দুই একবার নিষেধ করিয়াছিল। প্রাণের চারুর আবার অসুখ করিলে দেখিবে কে, চারু যে এখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ধ্রুবতারা! চারু কিন্তু তাহার এ অযাচিত ভালবাসায় মনে মনে অত্যন্ত

বিরক্ত হইত, তবে প্রভু-কন্যা বলিয়া কিছু বলিতে পারিত না, মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিত। এত করিয়া, এত ভালবাসিয়াও অপরাজিতা নিরীহ পল্লীযুবক চারুচন্দ্রের চরিত্র কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। সে তাহার ইঙ্গিত মত কোন কার্য্যই করিত না, অপরাজিতার ন্যায় প্রেমিকার অভিনব প্রণয় সে উপেক্ষায় উড়াইয়া দিত, এইজন্য অপরাজিতা তাহার উপর সময় সময় বিরক্ত হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিত—বন্য-পশুকে কি সহজে বশ করা যায়? এ স্বর্গীয় প্রেমের রসাস্বাদন হইতে একেবারে বঞ্চিত, এরূপ পশুকে রসময় রসিক করিতে হইলে সময় সাপেক্ষ, তাই তিনি উপেক্ষিতা হইয়াও, চারুকে আরও প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন, কেহ না থাকিলে গায়ে গা দিয়া, নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিয়াও ইঙ্গিতে কত প্রাণের কথা বলিতেন, আশা আকাঙ্ক্ষায় আর কত কাল যাইবে বলিয়া হৃদয়ের আবেদন জানাইতেন—কিন্তু বৃথা। অকালকুষ্মাণ্ড চারু এ আবেদন-নিবেদন কিছু বুঝিত না, সে তাহার ধার দিয়াও যাইত না। দরিদ্র অন্নহীন বিধবার পুত্র চারু কি লক্ষপতি ডেপুটী শ্যামাচরণের বিদুষী-কন্যা অপরাজিতার অনুরাগী হইতে পারে? দরিদ্রের এ আশা হইবে কেন; বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার উচ্চাভিলাষ, নিভৃত-পল্লীর নিরীহ ধর্ম্মভীরু যুবক চারুচন্দ্রই বা, করিবে কেমন করিয়া? ধর্ম্মে গড়া প্রাণ যার, সে কি এত অধর্ম্ম করিতে পারে—এত অকৃতজ্ঞ হইতে পারে? নয়নাভিরাম চারুচন্দ্র কিন্তু অপরাজিতার নয়নের মণি হইয়াছে। এরূপ সুন্দর যুবকের প্রণয় তাহাকে লাভ করিতেই হইবে, ইহাকে করায়ত্ত করিতে পারিলে যেরূপ বশংবদ হইয়া থাকিবে, যেরূপ ভাবে তাহার প্রণয়বদ্ধ হইয়া উঠিবে-বসিবে—তাহার অনুগত হইয়া থাকিবে, সহরের কেহ সেরূপ হইবে না, এই জন্য আশার আশ্বাসে অপরাজিতা অনবরত তাহাকে চার খাওয়াইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে শ্যামাচরণের অসুখ বাড়িয়াছে শুনিয়া কবিরাজ

আসিলেন, নাড়ী দেখিলেন, জ্বরের প্রকোপ তখন খুব প্রবল দেখিয়া বলিলেন,—"শ্যামাচরণ বাবু! এই জ্বর সারিয়া গেলে, আপনি কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনে গমন করুন। আপনার যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে কাশীধামই আপনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, সেখানে সহরের মধ্যে না থাকিয়া কিছুদূরে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবেন। এ বয়সে রোগ আর একেবারে সারিবে না, তবে স্থান-মাহাত্ম্যে কতকটা মনের শান্তি আনয়ন করিতে পারিলে স্থগিত থাকিতে পারে। মনের প্রফুল্লতাই এখন আপনাকে জীবিত রাখিবার একমাত্র উপায়, ঔষধে তত কিছু ফল হইবে না তবে আংশিক উপসর্গগুলির উপকার হইতে পারে। প্রত্যহ নদী জলে স্নান, ক্ষমতানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মে, পূজা আহ্নিকে মনোনিবেশ করিতে পারিলে এ সময় চিত্তের প্রফুল্লতা সহজেই আসা সম্ভব; মুক্ত বাতাসে প্রাতঃ ভ্রমণ এখন আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে মহৌষধ, এইজন্য বলি যদি আরও কিছুদিন বাঁচিতে চাহেন—তাহা হইলে এই নরকার পূর্ণ কলিকাতার পূতিগন্ধময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভূঃস্বর্গ কাশীধামে গঙ্গা-নদীর পবিত্র ক্ষেত্রে গমন করিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করুন।

শ্যামাচরণ হতাশভাবে মনে মনে বলিলেন,—এ চিত্ত আর নিশ্চিন্ত হইবে না, মনে যে দারুণ দাবানল জ্বলিয়াছে, আমার প্রাণ না লইয়া তাহা আর নির্ব্বাপিত হইবে না, তথাপি কবিরাজের কথার উত্তরে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে উপস্থিত জ্বরের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন, তারপর কাশী যাইবার চেষ্টা করিব।" কবিরাজ সেই মত ব্যবস্থা করিলেন।

নিজের দেহের অবস্থা নিজে যেমন বুঝিতে পারা যায়, তেমন আর কেহই পারে না, তবে রোগ যন্ত্রণায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া শ্যামাচরণ কবিরাজ ডাকিয়াছেন—কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন, এ রোগে আর অব্যাহতি নাই, এ মানসিক চিন্তা রোগের ঔষধও চিকিৎসাশাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রাণ লইয়া তবে এ ব্যাধির অব-

সান হইবে। শ্যামাচরণ সেইদিন হইতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, মনে করিলেন—আর কাহার জন্য অর্থের এত আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরমার্থ নষ্ট করি. যাহা করিয়াছি, যে অর্থ আমার আছে, তাই বা কে ভোগ করিবে? বিচক্ষণ ডেপুটীর চিত্ত সেইদিন হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। তেজারতী কারবার তিনি সেই দিন হইতে তুলিয়া দিলেন। রমজান আসিলে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—যে তিনি আর কলিকাতায় থাকিবেন না, চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবেন, অতএব যাহার যাহার কাছে টাকা কড়ি পাওনা আছে—তাহা আদায় করিতে আরম্ভ করা হউক, তিনি বোধ হয় আর কলিকাতায় আসিবেন না। রমজান প্রথমতঃ একটু দুঃখিত হইয়াছিল। তার পর মনে করিল—এতে লাভ বই লোক্‌সান কই? অধমর্ণগণকে জোর জবরদস্তী করিলে ত তাহারই উপকার হইবে। রমজান সকলকে বাবুর অভিপ্রায় জানাইল এবং একমাস মধ্যে টাকা উশুলের কথা বলিল। বাড়ী ঘর বন্ধক দিয়া টাকা লওয়া হইয়াছে, দেনা পরিশোধের ভাবনা কি? অধমর্ণগণ কেহ বা ভিন্ন স্থানে কর্জ্জ করিয়া, কেহ বা সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া শ্যামাচরণের টাকা সুদে-আসলে মিটাইয়া দিল। অনেক দরিদ্র গৃহস্থের অলঙ্কারাদি শ্যামাচরণ দ্বিগুণ সুদে বন্ধক রাখিয়াছিলেন। যাহাদের একেবারে পরিশোধ করিবার অবস্থা নহে, সুদে-আসলে মূলের উপর উঠিয়াছে, শ্যামাচরণ তাহাদিগকে ডাকিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাহা ফিরাইয়া দিলেন। অর্থগৃধ্নু শ্যামাচরণের বদান্যতা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। দুই হাত তুলিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। আর যাহারা পারিল, তাহারা কিছু কিছু দিয়া আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া গেল, শ্যামাচরণ আনন্দের সহিত তাহা ফিরাইয়া দিলেন। সকলে অবাক হইয়া বলিতে লাগিল,—"মরি মরি! এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! যে শ্যামাচরণ এক পয়সায় মা বাপ ছিল, সুদের

সুদ ধরিয়া টাকা লইত—সে শ্যামাচরণের অন্তঃকরণ একি হইল—কঠিনে এমন কোমলতার সংমিশ্রণ কেমন করিয়া হইল? এ অপবিত্র নিষ্ঠুর হৃদয়ে এত পবিত্রতা কে ঢালিয়া দিল! ভগবান! এ মহানুভব শ্যামাচরণকে দীর্ঘজীবি কর।" বলিয়া সকলে একবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ সব বুঝিয়াছেন—টাকা কাহার জন্য, কি হইবে? যখন ভোগ করিবার লোক নাই, তখন আর বৃথা লোক পীড়ন করিয়া অভিশাপ অর্জ্জন করি কেন? নিজের পেন্‌সন্ আছে, জীবদ্দশায় তাহাই খরচ করিলে যথেষ্ট হইবে। একমাত্র কন্যার যাহা অলঙ্কার আছে, তাহার উপর আরও দুইচারি হাজার টাকা এবং দেশের বাটীখানি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে আর টাকার জন্য এত চিন্তা কেন, ইহাত আর সঙ্গে যাইবে না! এক মাস দুইমাসের মধ্যে সমস্ত টাকা সংগ্রহ হইলে শ্যামাচরণ দেখিলেন প্রায় ষাট হাজার টাকা তাঁহার হাতে আসিয়াছে, শ্যামাচরণ দেশীয় দুইটী অনাথ আশ্রমে দশ হাজার করিয়া বিশ হাজার টাকা দান করিলেন। কয়েকটী বিদ্যালয়ে দুই হাজার করিয়া দান করিলেন। আপনার আত্মীয় স্বজন যেথানে যাহারা দুঃস্থ ছিল, তাহাদের নাম করিয়া প্রত্যককে হাজার করিয়া টাকা দিতে ভুলিলেন না। হুগলীর বাটী নিজের কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন। কাশীনাথের বাটী যাহা সারদাচরণের নামে বেনামী করা হইয়াছিল—তাহা তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র সহায়, বৃদ্ধার পুত্র চারুচন্দ্রের নামে লিখিয়া দিলেন। আর বৃদ্ধাকে দুই হাজার টাকা বারব্রত করণের জন্য দান করিলেন। শ্যামাচরণ কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বে কল্পতরু হইয়া আপনার ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন; রমজান কাঁদিয়া দুঃখ জানাইলে, তাহাকেও পাঁচ শত মুদ্রা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলা-বাহুল্য এ সময় যে আসিয়া শ্যামাচরণের নিকট দুঃখ জানাইল, প্রকৃত পক্ষে

সকলেই কিছু কিছু পাইল, কাহাকেও বিফল মনোরথ হইয়া রিক্ত-হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল না। যে শ্যামাচরণ গুরু-পুরোহিত মানিতেন না; যাঁহারা এরূপ একজন ধনবান শিষ্য-যজমানের নিকট আজীবন এক পয়সা না পাইয়া কত মনঃদুঃখ করিতেন। আজ তাঁহাদের সন্ধান লইয়া, তাঁহাদের ডাকিয়া আনিয়া শ্যামাচরণ চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কত কাঁদিলেন, যোড়হস্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অজস্র অর্থদানে তাঁহাদের সন্তোষসাধন করিলেন। সকলেই আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটীংগমন করিল।

অপরাজিতার জন্য তিনি একদিনও ভাবেন নাই—তাহার জন্য যেটুক রাখা আবশ্যক, তদ্ব্যতীত আর বেশী কিছু না রাখিয়া তিনি সমস্ত টাকার সদ্ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। অপরাজিতা স্বধর্ম্মে থাকিয়া, নিজের স্বভাব বজায় রাখিলে যাহাতে তাহার অভাব না হয়, এরূপ অর্থ তাহার ভরণ-পোষণের জন্য রাখিলেন,হুগলীর বাটী তাহার বসবাসের জন্য রহিল, কিন্তু সে দান বিক্রয় করিতে পারিবে না; যদি স্বধর্ম্মে থাকে তবেই পাইবে, নতুবা সে কুলত্যাগিনী, বিপথগামিনী হইলে—কিছুই পাইবে না, গৃহ বহিষ্কৃত হইবে। তাঁহার পবিত্র বাস্তুতে কুলটার স্থান হইবে না। এই ভার গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া দিলেন।

কন্যা পিতার ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্টা হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া, আপনার পথ আপনি দেখিতে লাগিল। পিতার অজানিত অনেক টাকা সে অপলাপ করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিতে লাগিল; শ্যামাচরণ জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলিলেন না,—যাহা লইল, সে কত টাকা, তাহাতে কয়দিন চলিবে! সে যদি চরিত্র ঠিক রাখিয়া ধর্ম্মপথে থাকিতে পারে, তাহা হইলে আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে তাহার জীবনে কখন অভাব হইবে না—তবে সে কি ঠিক থাকিতে পারিবে—আমি মরিয়া গেলে সে আপন লালসা চরিতার্থ করিতে ছাড়িবে না; রক্ত মাংসের শরীরে কেহ কখন ছাড়িতে পারে না

তবে লেখাপড়া শিখিয়াছে, যদি তাহার জন্য কিছু সংযমী হইতে পারে, কিন্তু এখন হইতেই ত চরিত্র-হীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। কুলের বাহির হইলে চারি পোয়া হইয়া যায়। ভগবান! অপরাজিতাকে রক্ষা কর, তাহার হৃদয়ে বল দাও! শ্যামাচরণ কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অপরাজিতা, বৃদ্ধা ও চারু তাঁহার সঙ্গে যাইবে। চারু বড় ভাল ছেলে, এত প্রলোভনেও তাহার পদস্খলন হয় নাই—শ্যামাচরণ অলক্ষিতভাবে সে বিষয় অবলোকন করিয়াছেন। অপরাজিতা গুপ্তভাবে তাহাকে কলঙ্কিত করিবার ইচ্ছা করিলে—সে কাঁদে, যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে,—"দিদিমণি! তুমি প্রভু-কন্যা, আশ্রয়দাতা দেবতার পবিত্র বংশ, আমি কলঙ্কিত করিতে পারিব না। ইহাতে তুমি আমাকে মারিয়া ফেলিলেও নয়।" কাযেই অপরাজিতার আশা পূর্ণ হয় নাই। চারুচন্দ্রের ন্যায় পবিত্র যুবকের প্রতি অপরাজিতার আসক্তি না পড়িয়া অন্যের প্রতি পড়িলে বোধ হয়—এতদিন সে কলঙ্ক-সাগরে হাবুডুবু খাইত; চারু যেরূপ দৃঢ়চিত্ত, তাহাতে তাহার দ্বারা অপরাজিতার অভিষ্ট সিদ্ধি হইবার আশা নাই কিন্তু সে কয়দিন, যত-দিন আমি জীবিত, তারপর প্রাণের তীব্র আকাঙ্খা—যৌবনের ঘোর বৃশ্চিকদংশন কি সে সহ্য করিতে পারিবে? তবে যা করেন ভগবান!

শ্যামাচরণ আর ভবিষ্যৎ কিছু ভাবিলেন না। এই সকল দান কার্য্যে তাঁহার মন সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছিল—তিনি ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার টানিয়া আনিয়া হৃদয় অন্ধকারময় করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না—যাহা হইবার তাহা হইবে, ভগবানের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য তাঁহার কোথায়? এ আদালতের বিচারপতি ত আর তিনি নহেন। সামান্য পার্থিব আদালতের ডেপুটী শ্যামাচরণের ক্ষমতা কতটুকু যে সে পরম-বিচারী বিশ্বপতির আসন অধিকার করিবে!

যখন শ্যামাচরণের হৃদয় একটু একটু প্রফুল্লিত হইতে লাগিল; দুঃস্থ

দরিদ্রের সেবা করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের দ্রব্য, তাহাদের প্রত্যর্পণ করিয়া যখন হৃদয়ে প্রভূত আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার রোগ ক্রমশঃ সারিয়া যাইতে লাগিল। দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ সবল হইলে, তিনি কবিরাজের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনে শুভযাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি লইয়া কাশীতে পবিত্র ব্রাহ্মণগণের পুণ্য কার্য্যে ব্যয় করিবেন বলিয়া সঙ্গে লইলেন। শ্যামাচরণের প্রাণ এখন উদার, হৃদয় পবিত্র; পৃথিবী ত্যাগের জন্য পথের সম্বল সঞ্চয় করিতেছেন—ইহাতে বাধা দেয় কে? কাশী যাইবার দিন স্থির হইলে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য আসিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল—কিন্তু শ্যামাচরণ এখন এ সবের অতীত, তিনি সকলকে অভিবাদন করিয়া স্বজনগণ সহ কাশী যাত্রা করিলেন। সকলে এই দেব-হৃদয় ডেপুটীকে বিদায় দিয়া বিষাদিত চিত্তে বাটী গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাধু-সঙ্গ।

শ্যামাচরণ এখন আর সে শ্যামাচরণ নাই। ধনের অহঙ্কার, পদের মর্য্যাদা সমস্ত নষ্ট করিয়া কাশীবাসে জীবনের নূতনত্ব লাভ করিয়া এখন তিনি নূতন মানুষ হইয়াছেন। কাশীতে অনেক সাধু-সজ্জনের সঙ্গলাভ করিতে পারা যায়, তাঁহাদের সহবাসে, সদুপদেশে জীবের ত্রিতাপ-তপ্ত প্রাণ শীতল হয়; শ্যামাচরণ এখন সব ছাড়িয়া জীবনের সন্ধ্যা কালে এই সকল সাধু সহবাসের ইচ্ছায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আহারাদির পর কেবল এখানে-সেখানে যাতায়াত করেন—আশা

সাধু-সঙ্গ লাভ। গণেশমহল্লায় থাকিয়া তিনি প্রত্যহ দুই তিন মাইল ভ্রমণ করেন—যাহাকে তাহাকে সাধু-সঙ্গ লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন।

কাশী সাধু-সজ্জনেরও যেমন অবস্থান ক্ষেত্র, দুর্জ্জন বদমায়েসেরও তদ্রূপ থাকিবার স্থান, যে যে ভাবের লোক, সেই সেই লোক সহ সঙ্গ করিয়া একদিকে স্থানের মাহাত্ম্য পরিবর্দ্ধিত, অন্য দিকে স্থান-মাহাত্ম্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া কাল যাপন করিতেছে। শ্যামাচরণ আজ একমাস হইল—কাশীতে আসিয়াছেন এত অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার মনের মত লোক না পাইয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না।

একদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া শ্যামাচরণ পদব্রজে অনেক দূর গমন করিলেন; স্থানটী অতি নির্জ্জন গঙ্গার ধারে—একটী তপোবন বিশেষ। বহুদূরে লোকের বসতি আছে কিন্তু এই আশ্রমের সন্নিকটে কাহারও বসতি নাই। স্থানটী অতি পবিত্র মনোরম; শ্যামাচরণ প্রথম দিন তাহার চারিদিক পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন আবার গমন করিয়া সাহসে ভর করিয়া সেই তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন ভিতরে তিন খানি গৃহ,—একখানি রন্ধনশালা, পশ্চিমদিকে একখানি অতি মনোরম দেবগৃহ তাহাতে দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান। একজন ভৈরব আর একজন ভৈরবী এই দেবকার্য্যে নিযুক্ত; ইঁহাদের সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী বলিয়া ভ্রম হয়—যেমন দেহকান্তি তেমনি তপঃবীর্য্য সম্পন্ন। মস্তকে জটা-জুট, পরিধানে গৈরিকবসন, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত। স্ত্রী অঙ্গেও ঐরূপ চারিদিক রুদ্রাক্ষ অলঙ্কাররূপে সধবার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু। আশ্রমে অপর কেহ পুরপুরুষ নাই বলিয়া স্ত্রী কোন প্রকার আচরণ-যুক্তা নহেন। স্বামী পূজায় উপবিষ্ট—রমণী তাহার আয়োজনে বিব্রত।

আজ হঠাৎ শ্যামাচরণকে তথায় উপনীত হইতে দেখিয়া রমণী মস্তকের আবরণ একটু টানিয়া অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন,—"আপনি কে, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?"

শ্যামাচরণ। মা! আমার অভিপ্রায় কিছুই নাই; কাশী আসিয়া মনোমত সঙ্গ না পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম; আজ আপনাদের এই আশ্রম দেখিয়া আমার প্রাণের আশা নিবৃত্তি করিতে আসিয়াছি; আমাকে আপনাদের দাসানুদাস মনে করিয়া পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করুন।

রমণী আর কিছু বলিলেন না—ঠিক এই সময়ে একজন অতি বৃদ্ধ অথচ তেজস্বী মহাপুরুষ স্নানাদি করিয়া আশ্রম প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন,—"মা মোক্ষদা! আজ দুই দিন অন্নপূর্ণার মন্দিরে আবদ্ধ ছিলাম—আসিতে পারি নাই; তোমাদের কোন কষ্ট হয় নাই ত? রামনিধি কোথায়?"

রমণীর নাম মোক্ষদা—তিনি শশব্যস্তে বাহির হইয়া দাওয়ার উপর একখানি কুশাসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন,—"না বাবা! কষ্ট কিসের, তবে আপনি কাছে থাকিলে আমাদের মনের কোন চাঞ্চল্য থাকে না—ধর্ম্মকর্ম্মে মন বেশ মজে থাকে—তা না হইলে যেন একটু আবিলতা আসিয়া পড়ে। তিনি মা চামুণ্ডার পূজায় বসিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী আসনে উপবেশন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ, করিলে—শ্যামাচরণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি বলিলেন,—"এ লোকটা কে, অতিথি নাকি?"

শ্যামাচরণ মানব শরীরের এমন তেজোদৃপ্তি কখনও দেখেন নাই—আশ্চর্য্য হইয়া কেবল তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন, প্রশ্ন শুনিয়া অগ্রসর হইয়া সষ্টাঙ্গে প্রণাম করত বলিলেন,—"প্রভু! আমি অতিথিও বটে, দাসানুদাসও বটে, বড় আশা করিয়া চরণে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী শ্যামাচরণের নম্র প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া বলিলেন,—"ভালই ত বাবা! দয়া ক'রে এসেছো ত ব'স, মায়ের প্রসাদ পাও।"

শ্যামাচরণ। দয়া আমার না আপনাদের; আমাদের দয়ায় জগতের একটী সামান্য উপকারও হইতে পারে না, আপনাদের ন্যায় মহাত্মার দয়া হইলে জগতের অসংখ্য মহাপাপীও উদ্ধার হইতে পারে।

সন্ন্যাসী। কিছু নয় বাবা? মায়ের ইচ্ছায় জগতে সব হয়, কর্ত্তা তিনি ভিন্ন আর কেহ নহে; পাপী ও পুণ্যাত্মা সবই তার সৃষ্টি; তুমি পাপী বলিয়া ত বোধ হইতেছে না, পুণ্যাত্মার যাবতীয় লক্ষণ তোমাতে বর্ত্তমান দেখিতেছি; বাবা, অনুতাপে তোমার সব ক্ষয় হইয়াছে।

শ্যামাচরণ সাধুর অভয়বাণী শুনিয়া যোড়-হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ আশ্রমের কর্ত্তা রামনিধি ও তদীয় পত্নী মোক্ষদা, কাশীতে আসিয়া গুরু পূর্ণানন্দের আদেশে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য এই নিভৃত নিবাসে আসিয়া ইষ্টমূর্ত্তি নির্ম্মাণে সাকারভাবে তাঁহার সাধনায় রত হইয়াছেন। পূর্ণানন্দ কখন্ কোথায় থাকেন, তাঁহার স্থিরতা নাই—তবে মাঝে মাঝে আসিয়া শিষ্য ও শিষ্য-পত্নীর অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে—তাঁহাদের পারত্রিক উন্নতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া যান। রামনিধি পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছিলেন—এখানে আসিয়া তাঁহার উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে—সংসারী জীবের এরূপ উন্নতি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়াছেন। রামনিধির শক্তিস্বরূপা মোক্ষদা যোগযাগ কিছু জানেন না—বা করেন না, তাঁহার পতিই ধ্যান-জ্ঞান, যোগযাগ যাহা কিছু সমস্তই ঐ দেবতার চরণে সমর্পিত, তাই দেবী চামুণ্ডা তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধি প্রদান করিয়াছেন।

সংসারে তাঁহারা প্রথমাবস্থায় যেমন কষ্ট পাইয়াছিলেন—এক্ষণে সেই-রূপ সুখী হইয়াছেন—প্রাণের পুত্র অনাথনাথ সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় মন দিয়াছে—শান্তিরাম তাহার উদ্‌যোগী, বিবাহ করিয়া সে কখন ভবানীপুরে কখন মনোহরপুরে অবস্থান করিতেছে। জামাতা তারাদাস জামালপুরে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া মনের সুখে বাস করিতেছে। যোড়শী এক্ষণে স্বর্গগতা হইয়াছেন বলিয়া, তারাদাস প্রাণের শ্যালককে ভবানী-

পুরের বাটী লিখিয়া দিয়া জামালপুরেই অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের একটী পুত্র হইয়াছে।

সময়ে সময়ে আত্মীয়বর্গ সকলেই কাশীতে আসিয়া এই দেব-দম্পতীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া যান, শান্তিরাম কখন কখন দুই তিন মাস এখানে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে কালাতিপাত করিয়া আবার স্বদেশে নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। পূর্ণানন্দ তাঁহাকে এ পথের পথিক হইতে নিষেধ করিয়াছেন—সংসারেই তিনি জীবনের সকল প্রকার উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়াছেন।

পুত্র অনাথনাথ, কন্যা বিমলা ইচ্ছা হইলে কাশীতে আসিয়া পিতা-মাতার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তারাদাস আর পরের দাসত্ব করিতে রাজী নহেন—একথা তিনি গুরু পূর্ণানন্দকে কতবার বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের দাসত্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; তবে জীবন-সংগ্রামে পড়িলে বৈশ্য-বৃত্তি, অভাবে দাস্যবৃত্তি না করিলে উপায় নাই—এই জন্য জননীর অনুরোধে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত দিন দাসত্ব করিয়া পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে আর কেন; গুরুদেবের অনুমতি পাইলেই দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লইবেন—অথবা সরকারী কার্য্যে অবসর লইয়া পেন্‌সন্ ভোগী হইবেন—নতুবা জীবনের কায, ধর্ম্মকর্ম্ম আর কবে হইবে—বেলা যে বাড়িয়া যাইতেছে—সন্ধ্যা উপস্থিত হইবার যে আর বেশী বাকী নাই।

রামনিধি ও মোক্ষদার জীবনের সমস্ত আশা মিটিয়াছে—তাঁহারা স্বস্থানে যাইবার জন্য, মাতৃচরণে লীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পূর্ণানন্দ দুই চারিদিন অন্তর আশ্রমে আসেন, তাঁহাদের ভাবগতিক দেখেন—তারপর উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া যান—কিছুদিন আর দেখা পাওয়া যায় না। আজ কয়েকদিনের পর আসিয়াছেন—রামনিধি ও মোক্ষ-দার আনন্দের সীমা নাই—দেবতার দর্শনে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। রামনিধি পূজাদি শেষ করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া পদধূলি লইলেন।

শ্যামাচরণ আশ্রমের একধারে বসিয়াছিলেন—এই তেজপুঞ্জ কলেবর মূর্ত্তি সম্মুখস্থ হইবামাত্র চরণপ্রান্তে প্রণত হইলেন এবং বদনের প্রতি চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ মূর্ত্তি যেন কোথাও দেখিয়াছেন! বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! আজ কি তোমার এস্থানে আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা আছে?" শ্যামাচরণ অতীব বিনীত ভাবে করযোড়ে বলিলেন,—"দেবতার প্রসাদে অনিচ্ছা কার. তবে আমি গৃহী, সময়ে গৃহে না যাইলে সকলে চঞ্চল হইবে—আমার জন্য তাহাদের আহারাদি হইবে না; অতএব অদ্য বিদায় হই, এইবার প্রত্যহ আসিয়া আপনাদের বিরক্ত করিব!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বাবা! বিরক্ত কিসের, লোক সমাগম সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় দাতা অতি দুর্লভ; তুমি জীবনের শেষ দশায় যেরূপ বদান্যতা দেখাইয়াছ, যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছ—তাহা মানুষ ক্ষমতার অতীত। তুমি সাধু, কাশীতেও তোমার কীর্ত্তি অতুলনীয়।"

কাশীতে আসিয়া শ্যামাচরণ ধনের অনেক সদ্ব্যয় করিতেছেন—পূর্ণানন্দ সে সকল বিদিত ছিলেন। শ্যামাচরণ আত্মপ্রশংসা আর শুনিলেন না; মহাত্মাগণের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সমস্ত রাস্তা মনে করিয়া আসিতে লাগিলেন,—"কে ঐ দ্বিতীয় সন্ন্যাসী! কখনও কি উঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—মুখ যেন চেনা বলিয়া বোধ হইতেছে,—না না আমার মত পাপীর কি ও রূপ দর্শন কখন সম্ভবপর, তাহা হইলে আমার পরিণাম এত বেদনাসঙ্কুল হইবে কেন?" কোথায় দেখিয়াছেন; কি করিয়াছেন—শ্যামাচরণ বিশেষ চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না—মস্তিষ্ক যে বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, অথবা সে বিচার কার্য্যের চিন্তা এখন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলে ঘৃণা উপস্থিত হয়, বলেন—"আমার মত একজন অধার্ম্মিক কখনও ভগবানের রাজত্বে

কাহারও বিচার করিতে পারে না। যে নিজে আচার-বিচার-বিহীন; স্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়া বিদেশীর ভাবে বিভোর—তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়, সে নিতান্তই অপদার্থ। হায়! নিজের অপটুতাহেতু কার্য্যকালে যে কত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। শ্যামাচরণ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



স্বর্গ-গমন।

শরীর ধারণ করিলেই পীড়িত হইতে হয়—তবে যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে—তাঁহারা তাহার জন্য মুহ্যমান হন না; দেহনাশকে একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হন। আর যাহারা দেহসর্ব্বস্ব, তাহাদের দেহের কষ্ট হইলে ভাবিয়া আকুল হয়—তাহার প্রতিকারার্থে কত ছুটাছুটী, কত অর্থ নষ্ট, কত ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভে যত্নবান হইয়া থাকে।

মোক্ষদা আজ কয়েক দিন হইতে পীড়িত হইলেও ভ্রূক্ষেপ নাই—কোনপ্রকার অস্থিরতা প্রকাশ না করিয়া সমভাবেই দেবকার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। রামনিধি শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"হাঁ একটু অসুস্থ হইয়াছে বটে, তবে তাহার জন্য চিন্তার কারণ নাই; মা চামুণ্ডার চরণামৃতই মহৌষধ;—আপনি প্রত্যহ আমার মস্তকে পদধূলি দিন—আর ঐ মহৌষধ পান করান; সমস্ত রোগ নিরাময় হইবে, আর যদি নাই হয়—সংসার-লীলার এই যদি শেষ হয়—তাহাতেই বা ক্ষতি কি,—স্বামীপদ বক্ষে ধারণ করিয়া ইহার অবসান করাই ত নারী জীবনের প্রার্থনীয়।" রামনিধি পত্নীর মনের তেজ দেখিয়া আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

শ্যামাচরণ এখন প্রত্যহই আশ্রমে আসেন, প্রত্যহই তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া চিরদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। এক সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করিলে স্বভাবতই একটা আত্মভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়—ইহা সাধারণ সত্য। এই দেবদম্পতীর সহিত শ্যামাচরণের তাহাই হইয়াছিল। দেবী মোক্ষদার অসুস্থতায় শ্যামাচরণও একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সংসারী জীবের মত একদিন চিকিৎসার কথা—কোন ঔষধাদি সেবনের কথা পাড়িলেন।

মোক্ষদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাবা! ঔষধে কি মৃত্যুরোগ আরোগ্য হইতে পারে? আমার যদি যাইবার সময় হইয়া থাকে, কাল যদি পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঔষধে কিছু হইবে না; আর যদি কাল পূর্ণ না হইয়া থাকে—তাহা হইলে বিনা ঔষধেই সারিয়া যাইবে—আমরা আবার কাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইব? সকল রোগের একমাত্র নিদান যে আমাদের ঘরের কোণে বাবা রহিয়াছেন—তাঁহার চরণামৃত খাইতেছি; সর্ব্বব্যাধি বিনাশন স্বামীদেবতার পদধূলি নিত্য সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছি; ইহকালের রোগ যদি ভাল হইবার হয়, ইহাতে নিশ্চয়ই ভাল হইবে, না হয় ভবরোগেরও ত উপকার হইবে?"

শ্যামাচরণ মোক্ষদার প্রাণের তেজ, ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং রোগ বিনাশের অকাট্য যুক্তি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কতদিনে প্রাণকে এমন ধর্ম্ম ভাবে বিভোর করিতে পারিবেন—কতদিনে ধর্ম্ম বিশ্বাসে মনকে এমন সুদৃঢ় করিয়া পরলোক প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন—তাহাই ভাবিলেন, কিন্তু এ ভাব যে সহজে আসে না। সাধনপথে অগ্রসর হইয়া হৃদয় ধর্ম্মময় করিতে না পারিলে জীবের এভাব যে লাভ হইতে পারে না, শ্যামাচরণ তাহা বুঝিতেন, এজন্য এখন তিনি শ্যামার চরণপ্রান্তে পৌঁছিবার জন্য সব ত্যাগ করিয়া অনন্যশরণে সাধুসঙ্গ করিতেছেন।

দেহ নষ্ট হইতেছে, তথাপি মোক্ষদার ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই পুষ্পচয়ন,

নৈবেদ্যকরণ, ভোগরন্ধন প্রভৃতি কার্য্যে একদিনের জন্য অবহেলা করেন না। কিছুদিন হইতে শ্যামাচরণ প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে আগমন করিয়া মোক্ষদার এ কার্য্যে অনেকটা সহায়তা করিতেছেন। পোষাক পরিচ্ছদে এখন আর তাঁহার তত ভ্রূক্ষেপ নাই; নগ্নপদে—মাত্র একখানি উত্তরীয় ও একগাছি যষ্টি লইয়া প্রত্যহ প্রায় দুই মাইল পথ যাতায়াত করেন। আশ্রমেই স্নানাহার করিয়া সমস্ত দিবস ধর্ম্মালোচনায় কাল কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে গমন করিতেন। এইরূপ কিছুদিন যাতায়াতের পর যখন খুব মেশামেশী হইল—সন্ন্যাসী দম্পতীর প্রাণের টান যখন তাঁহার প্রতি একটু গাঢ় হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন; তখন তাঁহার প্রাণের অভিপ্রায় জানাইতে আর বিলম্ব করিলেন না—অভিপ্রায় মন্ত্রগ্রহণ।

রামনিধি শ্যামাচরণের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"বৎস! শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিলে, দীক্ষা লইলে কোন ফল হইবে না, ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্ধ্যা-আহ্নিকের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্রে দেহশুদ্ধি কর, এতদিন সন্ধ্যাহ্নিক বর্জ্জিত হইয়া, অনাচার-অত্যাচারে যে পাতিত্য দোষ দুষ্ট হইয়াছ,অগ্রে তাহার প্রশমনে বিধিমতে অভ্যস্থ হও,তারপর মন্ত্রগ্রহণ। ব্রাহ্মণের উহার তুল্য পুণ্যকার্য্য, আত্মোন্নতির প্রভূত শক্তিসমন্বিত উপায় আর নাই। সন্ধ্যাহ্নিক প্রকৃতরূপে আচারিত হইলে অন্য কোন যোগযাগের আবশ্যক হয় না।"

শ্যামাচরণ। গায়ত্রী জপ করিলে কি হইবে না?

রামনিধি। উহার সহিত গায়ত্রীর উপাসনা আছে; ব্রাহ্মণের গায়ত্রীই জীবন, গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য। তাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিবে।

শ্যামাচরণ। তবে সন্ধ্যা-আহ্নিক আমার একমাত্র করণীয় কার্য্য?

রামনিধি। হাঁ, ত্রি-সন্ধ্যা মনে প্রাণে উহার আচরণ করগে, তাহা

হইলে আর কোন চিন্তা থাকিবে না—চতুর্বর্গ ইহার মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

রামনিধি তাঁহাকে আশ্রমেই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপন করিতে বলিলেন। কিন্তু শ্যামাচরণ বলিলেন,—"আমার সে সমস্ত কিছুই মনে নাই ; বহুদিন অবহেলা করিয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিরূপ নিয়মে উহা করিতে হয়—আমাকে শিক্ষা দিন।"

রামনিধি ঠিক প্রক্রিয়া অনুসারে শ্যামাচরণকে সমস্ত শিখাইয়া দিলেন। আজীবন বিজাতীয় শিক্ষার মোহে মোহিত হইয়া শ্যামাচরণ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকলে জলাঞ্জলী দিয়াছিলেন, এখন জীবনের শেষ সময়ে সংসারের আশীবিষে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইয়া ধর্ম্মের দিকে মন টানিয়াছে, এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম প্রতিপালনে তাঁহার আস্থা জন্মিয়াছে—তাই এত আগ্রহে, প্রাণের এত ঐকান্তিকতার সহিত অদ্য সে সমস্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন এবং গৃহে গমন করিয়া প্রাণের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন রামনিধির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া শ্যামাচরণের মনের গতি ফিরিয়া গেল ; ইহার মধ্যে যে একটা অমোঘ শক্তি বিরাজ করিতেছে—তাহা বুঝিতে পারিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার মানস-গগন ধীরে ধীরে পাপ-মলিনতা বিমুক্ত হইয়া সরলভাবে গঠিত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ এখন আর সে শ্যামাচরণ নাই—যেন মেঘনির্মুক্ত হইয়া নবজ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়াছেন। বৃদ্ধা তাঁহার এসকল কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন- অল্প দিনের মধ্যে শরীরের যাবতীয় গ্লানি সারিয়া গেল, আর কোন অসুখ বা ব্যাধি তাঁহার দেহে রহিল না।

বৃদ্ধ বয়সে পিতার সন্ধ্যা-আহ্নিকে এরূপ রতিমতি দেখিয়া অপরাজিতা অবাক হইয়া গেলেন। যে সন্ধ্যা-আহ্নিকের বিষম আড়ম্বর জন্য

তিনি স্বামীর প্রণয়ে জলাঞ্জলী দিয়াছেন; তারাদাসের ন্যায় নিষ্ঠাবান বিপ্রকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিয়াছেন, আর আজ এ কি হইল—তাঁহার পিতাই যে আবার শেষ দশায় সেই নিষ্কর্ম্মার আচরণ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিদুষী অপরাজিতা মনে মনে যারপরনাই রুষ্ট হইলেও পিতার মুখের উপর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। দুঃখে ঘৃণায় কেবল মনের আগুণে পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন!

শ্যামাচরণ প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করত, শঙ্কর-শঙ্করীর পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে দেব দর্শন করিয়া আসেন, গৃহে আসিয়া বেলা দ্বিতীয় প্রহর অবধি পূজা-আহ্নিকে, সন্ধ্যা-বন্দনায় অতিবাহিত করেন, তারপর জীবনধারণের মত স্বপাকে চারিটী হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া একটু রৌদ্র পড়িলে সেই নিভৃত নিবাসে, সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ দম্পতীর চরণাশ্রয়ে গমন করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। বাটীতে আসিতে কোন দিন অতিরিক্ত রাত্রি হয়, বেশী মাতিয়া উঠিলে কোন কোন দিন বাটীতে আসেন না—শ্যামাচরণের এখনকার এইরূপ অবস্থা পাষাণে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে।

সংসারে পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অপরাজিতা প্রথম প্রথম সামান্য ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা নাই, তিনি এখন আর পিতার তত ভয়-ভীতি রাখেন না; নিজের কক্ষে বসিয়া অনবরত হারমোনিয়ম সাহায্যে সঙ্গীতের অবতারণা করেন। অপরাজিতার সঙ্গীত আলাপে বেশ শক্তি জন্মিয়াছে—একে বামাকণ্ঠ, তাহার উপর উচ্চ শিক্ষায় সে সঙ্গীত গুলি এত স্পষ্ট উচ্চারিত হয়,—যাহা শুনিলে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের প্রাণ ত মুগ্ধ হইবেই

থাকে, সামান্য শ্রোতাগণও সে স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া সে অট্টালিকা তলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

কাশী স্থানটী ভাল লোকের পক্ষেও যেমি ধর্ম্মকর্ম্মের আলয়, মন্দ লোকের পক্ষেও তেমি উন্মাদকর। ধার্ম্মিক লোক চক্ষের গোচরে খুব কমই আসেন, মন্দ লোকের কিন্তু এখানে ছড়াছড়ি, চতুর্দ্দিকে তাহারা জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে সুবিধা পাইলে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। দুই চারিদিন হারমোনিয়মের ধ্বণীসহ বামাকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়া অনেকে এই বাটীর মালিকের অন্বেষণে তৎপর হইল, গুপ্তভাবে সন্ধান লইতে লাগিল। যখন শ্যামাচরণ বাটীতে থাকিতেন না, তখন দুই একজন বন্ধু হিসাবে অপরাজিতার গান শুনিতে আসিত, চারুচন্দ্র এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দিদিমণীকে কত নিষেধ করিত কিন্তু তাহার কথা শুনে কে, নদী বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—চারুর সামান্য আপত্তি-বাধা কি মানিবে?

চারুর প্রতি অপরাজিতার আর তত আসক্তি নাই। তাহাকে এত সাধ্যসাধনা করিয়া যখন বশে আনিতে পারিল না, যখন সে পল্লীর ভুতের মত নিমকহারামের কায করিল তখন অপরাজিতা তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল, কিন্তু পিতার প্রিয় সে, তাহাকে একেবারে বাটী হইতে তাড়াইতে পারিল না। চারু এখন কাশীতে চাউলের দোকান খুলিয়াছে, লাভ মন্দ হইতেছে না—পরের দাসত্ব অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল।

শ্যামাচরণ আজ দুই দিন বাসায় আসেন নাই। আশ্রমে মোক্ষদা দেবীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রামনিধি একাকী সমস্ত কার্য্য কেমন করিয়া সমাধা করিবেন—রোগীর সেবা ও মায়ের পূজার আয়োজন, একাকী হওয়া সম্ভবপর নহে, কাযেই শ্যামাচরণকে সাহায্য করিতে হইতেছে। ব্রাহ্মণ দম্পতীর এরূপ কার্য্য সম্পাদনে তিনি আপনাকে

ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। মোক্ষদা আজ দুই দিন পেটের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, ভুক্তদ্রব্য কিছুই পরিপাক হয় না বলিয়া তিনি এক প্রকার আহার ত্যাগ করিয়াছেন, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। রামনিধি পূজাদি শেষ করিয়া পত্নীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, শ্যামাচরণ রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মোক্ষদা বলিলেন,—"গুরুদেব কই, এবার যে তিনি অনেকদিন হইল—আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন, তবে কি আমার মৃত্যু সময়ে তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে না ?"

রামনিধি পত্নীর অবস্থা এবং চিত্তের চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিলেন—"চিন্তা কি, এমন অভাগ্য হইবে না, যদি তোমার যাইবার সময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন; অন্তর্যামী তিনি, অন্তরের বেদনা কি তাঁহার বুঝিতে বাকী আছে ?"

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখনও স্বামীর আহারাদি হয় নাই দেখিয়া মোক্ষদা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিবেন না, এখন আমার কোন প্রকার কষ্ট নাই, আপনি রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি করুন, একজন ভদ্রলোকের ছেলে আশ্রমে অতিথি, সেও এখন অভুক্ত, যান আর বিলম্ব করিবেন না।"

মোক্ষদার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে দেখিয়া রামনিধির কোন প্রকার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইল না। যখন হউক, দেহীর দেহ ত নাশ হইবেই, তাহার জন্য আর চিন্তা কি ? তিনি উঠিলেন—আহারাদি প্রস্তুত করিলেন—তারপর দুই জনে আহার করিলেন। রোগিনীর জন্য কিঞ্চিৎ জলসাগু প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন—যদি খাইতে চায়। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মোক্ষদার রোগ-যন্ত্রণা বারপর নাই বৃদ্ধি হইয়াছে, মুখের আকৃতি দেখিয়া যন্ত্রণার মাত্রা বুঝিতে পারা যাইতেছে, তথাপি এমনি সহ্যগুণ যে বাক্যে তাহার কিছু

মাত্র প্রকাশ নাই, কেবল বলিতেছেন,—"হায় গুরুদেব! এ সময় তুমি কোথায় রহিলে, দেখা কি হইবে না?"

রামনিধি বলিলেন,—"মোক্ষদা! চিন্তা করিও না, প্রাণ যদি একান্ত অধীর হইয়া থাকে—তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ইচ্ছা যদি একান্ত বলবতী করিয়া থাকে—তাহা হইলে তিনি এখনি আসিবেন।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই বাহির হইতে গম্ভীর স্বরে শব্দ হইল—"মোক্ষদা মা, এই যে আমি আসিয়াছি, চিন্তা কি, মহাগুরু স্বামীত তোমার নিকটে রহিয়াছেন, গৃহে বিশ্বজননীও আবির্ভূতা, আমি নিমিত্ত মাত্র ছিলাম, এই যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি" বলিয়া, এক দীর্ঘ, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীমূর্ত্তি গৃহে আবির্ভূত হইলেন। সকলে প্রণত হইলেন। পূর্ণানন্দ এতদিন গৃহী ছিলেন—এখন সন্ন্যাসী, ত্যাগের আদর্শ মূর্ত্তিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান, আর একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার প্রাণ চায় না, এ কয়দিন কোন দূরদেশে যাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই আসিতে এত বিলম্ব!'

পূর্ণানন্দ মোক্ষদার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—"মা! স্মরণ মাত্রেই ত আসিয়াছি, প্রাতঃকাল হইতে তুমি বড়ই চঞ্চলা হইয়াছিলে, সেই জন্য আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া এই যে আসিয়াছি মা! বুঝিয়াছি—আর তোমাদের এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই—সময় সংকীর্ণ হইয়াছে। তোমরা লোকান্তরিত হইলে চামুণ্ডার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমিও লীলা শেষ করিব।" সাধকের সিদ্ধবাক্য ফলিতে আরম্ভ হইল। মোক্ষদা যেন প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, গুরুদেব আসিবামাত্র, চামুণ্ডের গৃহের সান্নিধ্যে শয্যা প্রস্তুত হইল, সতী স্বামীপদ বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ণানন্দকে পরকাল সম্বল তারক ব্রহ্মনাম শুনাইতে বলিলেন। পূর্ণানন্দ উচ্চৈঃস্বরে নামগান করিতে লাগিলেন—সতী মর্ত্তের শোক তাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া

হাসিতে হাসিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্যামাচরণ অবাক—এরূপ ইচ্ছা মৃত্যু, তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

তারপর শব স্থানান্তরিত করিবার সময় আবার এ কি, এ? দেবকল্প রামনিধিরও যে সাড়াশব্দ নাই, পূর্ণানন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—পত্নীপ্রিয় স্বামীও আর ইহলোকে নাই। শ্যামাচরণ বলিলেন,—"পত্নীই পতির সহিত চিতারোহণ করে, পতি আবার কোন্ কালে সহমৃত হয়, এ কাহিনী ত এই নূতন!" পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"বাবা! যেখানে পতি পত্নী ঠিক হইয়াছে, প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে, সেখানে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রামনিধি-মোক্ষদা যে আদর্শ দম্পতী, খুনের বিচারের সময় মোক্ষদারও এই ভাব হইয়াছিল। এখন চল, এই পবিত্র দেব-দম্পতীর সংকার করিয়া আমরাও ধন্য হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

নানা কথা।

দেবগৃহ আজ অন্ধকারময়। যাঁহাদের অমায়িকতায় সোণারপুরার চামুণ্ডা মন্দিরের এত খ্যাতি প্রতিপত্তি, যাঁহাদের অদ্ভুত তপঃপ্রভায় দেবী চামুণ্ডা জাগ্রত-রূপে এতদিন এ পুরে অবস্থিতা, প্রাণ দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যে সাধক-দম্পতী এতদিন মায়ের পূজায় ব্রতী ছিলেন, আজ তাঁহারা আর নাই—ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—তাই দেবী-মন্দির আজ অন্ধকারময়। সব আছে—সেই উদ্যান, সেই পুষ্পবাটিকা, সেই গৃহ-প্রাঙ্গন, সেই অতিথিশালা; কিন্তু মোক্ষদা ও রামনিধি বিহনে এ সকলের আর সে শ্রী-সৌন্দর্য্য নাই, যেন কি এক প্রকার বিসদৃশভাবে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ—দেখিলে

চক্ষের সে তৃপ্তি হয় না—মনে সে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া দর্শকের আর সেরূপ চিত্তবিনোদন করে না। শান্তির আগার যেন অশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে—মাতৃমূর্ত্তি যেন কতই ম্রিয়মানা—বিষাদময়ী!

শ্যামাচরণের প্রাণে বড় লাগিয়াছে। এ সাধক-দম্পতীর—অকস্মাৎ তিরোধানে তিনি যে বাস্তবিক দিশাহারা হইয়াছেন। ইহাঁদের সহিত তাঁহার এই সামান্য দিনের মাখামাখিতে এতদূর আত্মীয়তা, এতদূর ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল, যে অতিশয় নিকট কুটুম্বের সহিতও এত মনের মিলন হয় না। তিনি যে ইহাঁদের পদাশ্রয়ে আসিয়া নব-জীবন লাভ করিয়াছিলেন, মানব জীবনের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের শেষ দশায় মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই হাসি হাসি মুখের অভয়বাণী—তাঁহার মৃতপ্রায় দেহে, আশাহীন জীবনে প্রভূত শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। যখন পাপের তীব্র তাড়নায় দিশাহারা হইয়া সহস্র বিষের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া কাতর প্রাণে এই শান্তি-নিকেতনে আসিয়া পড়িতেন, তখন এই সাধক-দম্পতী পিতা-মাতার মত ক্রোড়ে করিয়া শান্তিবারি প্রদানে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার জীবনে কি যে এক শান্তিসুধা ঢালিয়া দিতেন—যাহা অন্য কাহারও প্রদান করিবার সাধ্য ছিল না, সে কোমলতাপূর্ণ মুখ, সে বাৎসল্যভাবের অভয়-দান, শ্যামচরণ কি আর এ জীবনে কাহারও নিকট পাইবেন! শ্যামাচরণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পূর্ণানন্দ মায়ামোহের অতীত হইয়াছেন—শোক দুঃখ তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না; জীব জগতে আসিলেই যাওয়ার পক্ষে সুনিশ্চয়, মরধাম কাহারও চিরবাসস্থান নহে; দুই দিন পূর্ব্বে বা পরে সকলকেই ইহার লীলা খেলা শেষ করিতে হইবে—আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিষয়, আমার বৈভব—ইহাত মায়ার টান, সামান্য জীব—ইহাতে মুগ্ধ হইবে; আত্মজ্ঞানী পূর্ণানন্দের ইহাতে

শোক দুঃখ হইবে কেন? নশ্বর জগতের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি বলিলেন,—"বৎস! ধৈর্য্য ধর, যদি তাহাদের প্রতি তোমার এতই প্রাণের টান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, এই আদর্শ-দম্পতীর পারত্রিক ক্রিয়ার জন্য লৌকিক একটা মহোৎসবের ব্যবস্থা করি এস। ইহাদের অপূর্ব্ব মৃত্যু দেখিয়াছ ত, সামান্য মানবে কি কখন এরূপ সম্ভব?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "প্রভু! আজীবন যাঁহারা মাকে লইয়া মাতৃ-অঙ্কে শায়িত হইয়া ঠিক বালক-বালিকার ন্যায় কাল কাটাইতেন—ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উপাস্য ছিল—তাঁহাদের মৃত্যু এরূপ লোভনীয় হইবে না ত কি? আমি এই দেব-দম্পতীকে গুরু বলিয়া মানিয়াছিলাম, জীবদ্দশায় গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু ত্যাগী ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এক্ষণে আমার যাহা কিছু আছে—আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি, আপনি তাঁহাদের পারত্রিক কর্ম্মে ব্যয় করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে এই দেবালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করুন।" পূর্ণানন্দ ভিন্নমত করিলেন না। শ্যামাচরণের অন্তরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, পৃথিবীর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রাণে বিবেক ভাব জাগরিত হইয়াছে। সংসারে কে কাহার—কাহার স্ত্রী, কার পুত্র-কন্যা? সকলেই ত আপনাপন সুখ, আপনাপন স্বার্থের জন্য ব্যস্ত—পরকে ত কেহ দেখেনা! এই অপরাজিতাকে এত করিয়া মানুষ করিলাম—সে এখন কোন্ দিকে যাইতেছে; নরকের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে—কুলে কালী দিতেছে, আমি এ সকল বসিয়া বসিয়া দেখিয়া আর চক্ষু কলুষিত করি কেন? অপরাজিতাকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করিবার একমাত্র কারণই ত আমি, তখন বুঝিতে না পারিয়া বিদুষী করিয়াই ত আমি তাহার মাথা খাইয়াছি। একদিনের জন্যও তাহাকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষা দিই নাই, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে একদিনের

জন্যও উপদেশ দিই নাই, কেবল বিদূষী রমণীদের মত বিদেশীয় হাবভাবে তাহাকে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষা দিয়া তাহার পরকাল নষ্ট করিয়াছি, দোষ ত আমি নিজেই করিয়াছি, এক্ষণে তাহার জন্য অনুশোচনা করিলে, তাহার ফলভোগে ভীত হইলে চলিবে কেন? এক্ষণে কলুষ-কালিমায় কুলকলঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে পারি, আশু তাহার চেষ্টা করা উচিত। পাপিনী যেরূপ তীব্র গতিতে কলঙ্কের পথে চলিয়াছে, তাহাতে কূলভাঙ্গিয়া অকূলে পড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। গুরুদেবের কৃপায় আমি এখন নিরোগী, নববলে বলীয়ান—অন্যস্থানে গমন করিতে আর কোন কষ্ট হইবে না। এক্ষণে শুভযোগ সমাগত, গুরুর গুরু পূর্ণানন্দের পাদপদ্মে আমার যা কিছু আছে, উৎসর্গ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিব, পাপিনী কন্যাকে আর এ সকল ধনের অপব্যয় করিতে দিব না।"

আশাহীন উদাস প্রাণে শ্যামাচরণ পূর্ণানন্দের পদে প্রণাম করিয়া রজনীযোগে তাঁহার যাবতীয় অর্থাদি আহরণ করিতে বাসায় গমন করিলেন। বৃদ্ধা, পর হইলেও, এখনও শ্যামাচরণের আগমন প্রতীক্ষায় দরজার নিকট বিনিদ্র চক্ষে বসিয়া আছেন, পুত্র চারুচন্দ্র আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে। আজ অপরাজিতার সহিত বৃদ্ধার বচসা হওয়ায় প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, তাই তাহার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই, বিশেষতঃ অপরাজিতা লজ্জাহীনা হইয়া গান বাজনায় যেরূপ মত্ত হইয়াছে, পরপুরুষের সহিত যেরূপ মেশামেশি করিতেছে—তাহাতে তাহার মনে বড়ই ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে; কর্ত্তা আসিলে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিবে, এই আশায় পথ চাহিয়া আছে।

শ্যামাচরণ গৃহে আসিলে, বৃদ্ধা আহারাদি আনিয়া দিল। শ্যামা-চরণের প্রাণ সেদিন অত্যন্ত উদাস হইয়াছিল, আহারে রুচি হইল না, যৎসামান্য জলযোগ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা

আপন মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। শ্যামাচরণ সমস্তই বুঝিয়া বলিলেন,—"একান্তই অসহ্য হয়, দেশে যাইতে পার, আমি ত অবস্থানুসারে তোমাদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, তবে চারুর কাযকর্ম্মের কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিলাম না, তাহার জন্য কিছু টাকা দিতেছি, দেশে গিয়া কোন ব্যবসা করিলে তোমাদের দুই প্রাণীর এক প্রকার চলিয়া যাইবে। চারু যেরূপ ধর্ম্মভীরু—এতদিন নাড়িয়া চাড়িয়া আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি—তাহাতে সে অল্পবিদ্যাসম্পন্ন হইলেও কখন কষ্ট পাইবে না। তোমরা চলিয়া গেলে, আমিও এস্থান ত্যাগ করিব। হতভাগিনীর মুখ আর দেখিব না, যখন এত করিয়া বুঝাইয়া, সৎ উপদেশ দিয়া তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলাম না, তখন ও কালামুখীর সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল, ও বিদ্যার অহঙ্কার লইয়া অকূলে ডুবিয়া মরুক।"

সমস্ত রাত্রি শ্যামাচরণের নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে বৃদ্ধার হস্তে কিছু টাকা দিয়া এবং আপনার যাবতীয় নগদ সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন, এক বৃদ্ধা ভিন্ন আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না। প্রাতঃকালে জননী পুত্রকে সমস্ত বলিলেন, চারুচন্দ্র বহুদিন হইতে স্বদেশ গমনের জন্য ছট্‌ফট করিতেছিল, এ রাক্ষসী-পুরীতে তাহার আর তিলমাত্র থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, জননীকে আগ্রহান্বিত দেখিয়া চারুচন্দ্র সমস্ত ঠিক করিয়া সেইদিনই গাড়ীতে উঠিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এমন সময় অপরাজিতা শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মাতা-পুত্রের ব্যস্ততা দেখিয়া তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, পূর্ব্বদিনের মনোমালিন্যেই বৃদ্ধা স্বদেশমুখী হইয়াছে, সে আর কাহারও কথা শুনিবে না।

অপরাজিতা কাহাকেও তোষামদ করিতে জানিত না, এতাবৎকাল অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়াই নিজের পরকাল নষ্ট করিয়াছে, গুরুজনের

উপদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী আর কেহ নাই।

বৃদ্ধা সেদিনকার মত রন্ধনাদি করিয়া অপরাজিতার জন্য রাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইলেন এবং নিজেও আহার করিলেন। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানের সময় বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার চরণামৃত পান করিয়াছেন, এক্ষণে স্বদেশগামী হইবার সময় উদ্দেশে তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। অপরাজিতা কোন কথা না কহিলেও, তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য একবার তাহার গৃহ-দ্বারদেশে গমন করিয়া বলিলেন,—"মা! কর্ত্তা কাল রাত্রে আসিয়াছিলেন, তিনি অদ্য কাশী ছাড়িয়া অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও দেশে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন—আমরা চলিলাম, তোমার দেশে যাইবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদের সঙ্গে এস।"

বৃদ্ধা দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন কিন্তু অপরাজিতা কোন কথা কহিল না, পিতা চলিয়া গিয়াছেন—তাহারাও চলিয়া যাইতেছে তজ্জন্য যে স্ত্রীলোকের মনের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হওয়া, তাহাও হইল না। বৃদ্ধা আর কি করিবেন—অগত্যা মনে মনে "এ মেয়ে পুরুষের বাবা" বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া প্রথমে অপরাজিতা একটু স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল, তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—"তাতে আর ক্ষতি কি, আমার ত অর্থাদি যথেষ্ট আছে, উদরান্নের ভাবনা হইবে না, তবে তিনি চলিয়া গেলেনই বা, যদি তাঁহার মৃত্যুই হইত—তাহা হইলেও ত আমাকে একাকিনী থাকিতে হইত, তাহার জন্য আর ভাবনা কি? বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আহারাদি করিয়া অপরাজিতা নিজের কক্ষে আসিয়া বেশবিন্যাস করিল। দাসী গৃহকর্ম্ম করিতে আসিলে তাহাকে একজন পাচিকার কথা বলিয়া দিল। অর্থ থাকিলে লোকের অভাব হয় না,—সেইদিনই

একজন ব্রাহ্মণী পাচিকা আসিয়া কাযে লাগিল—সান্ধ্য-ভোজের আহারাদি প্রস্তুত হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া জুটিল, আবার আমোদের হল্লা চলিতে লাগিল।

পার্শ্ববর্ত্তী সকলেই অনুমান করিল—এ গৃহে কোন বাইজী আসিয়াছে, তাই প্রত্যহ রজনীতে নৃত্যগীত-বাদ্যের এত ধূমধাম হয়। সৎকর্ম্মে লোক পাওয়া দুষ্কর কিন্তু অসৎ কার্য্যের ব্যবস্থা করিলে, যাত্রা, নাচ, থিয়েটারের আয়োজন করিলে,—লোকের অভাব হয় না। সকল স্থানেই এ দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান - ইহাতে কলিকাতাই কি, আর পুণ্যতীর্থ কাশীধামই কি। যাহারা নাচগান প্রিয়, বেশ্যাশক্ত, মদিরামোদী তাহারা এই নবাগত বাই-জীর ভবনে পদার্পণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। আমোদ-আহ্লাদ এখানে জমে ভাল, স্ত্রীলোকটীর অর্থের তত আকাঙ্খা নাই, ভাল গান বাজনা জানিলেই তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারা যায়, বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় এখানে নাই—কেবল আমোদ-প্রমোদ, গীত-বাদ্যের আলোচনা, সময়ে সময়ে বিদ্যার আলোচনাও হইয়া থাকে। যাহারা বিদ্যার ধার দিয়াও যান না—তাঁহারা রসভঙ্গ হয় বলিয়া রণে ভঙ্গ দেন, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন—বলেন, —"বেশ্যাবাড়ীতে আবার এত লেখা পড়ার চর্চ্চা কেন বাবা, ঐ জ্বালা-তেই ত বাড়ী ছেড়েছি, এখানেও আবার ঐ কচকচানী।" শ্যামাচরণ গৃহ-ত্যাগ করিলে অপরাজিতা স্বাধীনভাবে আপনার গন্তব্যপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এতদিন বাঁধাবাধির ভিতর ছিল, এখন আর তাহা রহিল না।

বৃদ্ধার নিকট বিদায় হইয়া শ্যামাচরণ আশ্রমে আসিলেন এবং পূর্ণা-নন্দকে সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"এই অর্থাদিতে যাহা আবশ্যক হয় করুন, আমি কিয়দ্দিন কাশী ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণ করিব—আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে।" পূর্ণানন্দ শ্যামাচরণের প্রাণের জ্বালা বুঝিয়াছিলেন; তিনি অনেক নিষেধ করিলেন—বলিলেন, "অন্ততঃ তোমার গুরুদেবের পারত্রিক ক্রিয়া শেষ করিয়া যাও।"

শ্যামাচরণ বলিলেন,—"যখন আপনি আছেন—তখন সে সকল কার্য্য আর আমাকে দেখিতে হইবে না, জীবের জীবন-পথ যিনি সুশৃঙ্খলায় চালাইয়া দিতে পারেন—এ সামান্য কার্য্য আর তাঁহার দ্বারা সুশৃঙ্খলায় চলিবে না? প্রভু! আপনি সমস্ত বন্দোবস্ত করুন, আমি দেশ ভ্রমণ করিয়া সত্বর পুনরায় চরণ দর্শন করিব।" পাপিনী কন্যা সন্ধান পাইয়া পাছে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করে, পুনরায় তাঁহাকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন করে—এই ভয়ে শ্যামাচরণ কাশী পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ণানন্দ কি করিবেন—শ্যামাচরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মণিপুরাভিমুখে গমন করিতে আদেশ দিলেন এবং প্রিয়শিষ্য রামনিধি ও তদীয় পত্নী মোক্ষদার পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য তারাদাসকে পত্র লিখিলেন। তারাদাস কিছুদিন হইল চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন, পুত্র-বিয়োগ-শোকই এই বিরাগের কারণ; যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছে—তাহাতে স্বামীস্ত্রীর এক প্রকার চলিয়া যাইবে, তবে আর কেন জীবনের পথ কণ্টকময় করিতে বৃথা কাযে আবদ্ধ থাকা! বিমলা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। আজ হঠাৎ গুরুদেবের পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন, শোকের উপর শোক; বিমলা কি সহ্য করিতে পারিবে? কিন্তু আর দিন নাই, না বলিলেও নয়—তারাদাস সেই নির্ঘাত বাক্য, গুরুদেবের সেই আদেশ বিমলাকে জ্ঞাপন করিলেন। পিতামাতার সহিত শেষ দেখা হইল না বলিয়া, বিমলা সমস্ত দিন নয়নের জলে বুক ভাসাইলেন—কিন্তু কর্ত্তব্যকার্য্য নিকটবর্ত্তী; গুরুদেব পত্রপাঠমাত্র যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এখন আর শোকের সময় নয় ভাবিয়া অনাথনাথ ও বন্ধুবান্ধবসহ তাঁহারা বারাণসী উপনীত হইলেন। শান্তিরাম আর ইহজগতে নাই, নতুবা এ শোক যে তাঁহাকে কিরূপ ব্যথা প্রদান করিত—তাহা বলাই বাহুল্য। শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে পতি পত্নীতে স্বামীজীর চরণ বন্দনা করিলেন। পূর্ণানন্দ নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"বৎসে! সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, যাওয়া-আসাই ইহার

বিধান ; যাহারা সৎকার্য্য করিয়া ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে—মানব জন্ম তাহাদেরই সার্থক। তোমার পিতামাতা সে হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন ; জঠর যাতনা ও যমযাতনা ভোগ করিয়া জগতে আর তাঁহাদের যাতায়াত করিতে হইবে না, তাঁহাদের পারত্রিক কার্য্য না করিলেও তাঁহারা মুক্ত হইবেন ; তবে যখন তোমরা উপযুক্তপাত্র রহিয়াছ, তখন শাস্ত্রের এ সকল ক্রিয়া করিতে দোষ নাই। তাঁহাদের পরমভক্ত শ্যামাচরণ অযাচিতভাবে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছেন—অতএব শ্রাদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের নামে দরিদ্রগণকে অন্ন বিতরণ কর।” শ্যামাচরণের নাম শুনিয়া তারাদাস প্রথমে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন—সে শ্যামাচরণের কি এত সৌভাগ্য হইবে—আর সে পুণ্যধাম কাশীতেই বা কি করিতে আসিবে—ইহাঁদের সহিত তাহার আলাপই বা কেমন করিয়া হইবে? তারাদাস মনে কোনও সন্দেহ না করিয়া গুরুর আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধের মহতী ঘটা হইল—বহু দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা, অধ্যাপক বিদায় প্রভৃতি কার্য্য পূর্ণানন্দ বিশেষ ব্যবস্থার সহিত সমাধা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে সোণারপুরার চামুণ্ডা মন্দির খুব বিখ্যাত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে স্নানার্থিণী কয়েকটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাত্র পূজার জন্য সময়ে সময়ে এখানে গঙ্গাবারি প্রদান করিয়া যাইত,তাহারাই নিভৃতনিবাসের এই শক্তিমন্দিরের কথা জানিত,এখন জনসাধারণের নিকট ইহা বিশেষ বিখ্যাতি লাভ করিল। শ্রাদ্ধাদির পর অনাথনাথ স্বজনগণসহ স্বদেশ আগমন করিলেন। গুরুর আদেশে তারাদাস ও বিমলা পিতা-মাতার স্থানাভিষিক্ত হইয়া দেবী চামুণ্ডার সেবায় ব্রতী হইলেন। প্রাণ যে কার্য্যে নিয়োজিত হইবার জন্য এতদিন পিপাসিত ছিল, পূর্ণানন্দ তাহাকে সেই কার্য্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।



পরিণাম।

কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে কতদিন থাকে? অপরাজিতার সঞ্চিত অর্থ পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে শেষ হইয়া গেল, পেটের জন্য এইবার অলঙ্কারাদি বিক্রয় আরম্ভ হইল। গহনা যাহা আছে—তাহাতে বুঝিয়া চলিতে পারিলে তাহার জীবন এক প্রকার কাটিতে পারে, কিন্তু খরচ করিতে যে চিরাভ্যস্ত—সে কি এত টানাটানির উপর চলিতে পারিবে?

অপরাজিতার হাতে যে এত অর্থ সঞ্চিত ছিল—তাহা কেহ জানিত না, তাহা হইলে এতদিন তাহার ভয়ানক দুর্দ্দশা হইত, কাশীর মত স্থানে স্ত্রীলোকের হাতে এত পয়সা, গুণ্ডার নজর পড়িলে কি রক্ষা থাকিত? তবে অপরাজিতার বাড়ীওয়ালা খুব ভাল লোক—তাহারই কৃপায় এখনও অপরাজিতার অস্তিত্ব বজায় আছে, বাজারে নাম হইয়াছে যে, সে একজন ভাল বাইজী। অন্যান্য ভাড়াটীয়া অপেক্ষা অপরাজিতার নিকট তাহার পাওনা-গণ্ডা বেশী হইত, তাই হিন্দুস্থানী বাড়ীওয়ালা বাইজীকে খুব তারিফ করিত। কলিকাতার যে সকল বাবুগণ কাশীতে ভাল বেশ্যাবাড়ী অন্বেষণ করিত, দুই দণ্ড কেবল নাচ গান শুনিয়া আমোদ করিতে চাহিত, বাড়ীওয়ালা তাহাদিগকে অপরাজিতার কক্ষে পাঠাইয়া দিত।

আজ কলিকাতা হইতে একজন খুব ধনী যুবক কাশীতে আসিয়াছেন; তিনি সন্ধ্যাকালে অপরাজিতার ভবনে প্রবেশের জন্য বাড়ীওয়ালাকে বলিলেন, বাড়ীওয়ালা নিজের গণ্ডা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া চাকরের দ্বারা তাহাকে অপরাজিতার ভবনে পাঠাইয়া দিল।

অপরাজিতার শরীর সেদিন ভাল ছিল না; তাই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও এখন শয়ন কক্ষে অবস্থান করিতেছে। চাকর বাবুটীকে বিলাস

ভবনে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিবিজানকে সংবাদ দিল। অনেকক্ষণ পরে অপরাজিতা শরীরকে তাজা করিবার জন্য ঔষধের পরিমাণ একটু সুরা সেবন করিয়া সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া নাচ ঘরে আসিয়া দেখিল—বাবুটী একটী তাকিয়া ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে—নেশায় সে একেবারে হত-চেতন।

অপরাজিতা সেদিকে তত লক্ষ্য না করিয়া বহুদূরে কক্ষের অপর পার্শ্বে বসিয়া হারমোনিয়ম টিপিয়া পূরবী আলাপ করিতে লাগিল—কোকিল-কণ্ঠের সহিত হারমোনিয়মের সুর পঞ্চমে উঠিল। বাবুটী এইবার উঠিয়া বসিয়া মাতালের মত বেতালা ভাবে সম্মুখস্থিত বাদ্যযন্ত্রে চাঁটী মারিতে লাগিল ও হল্লা করিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল—ইহা সাধারণ বেশ্যাভবন, যখন অর্থ দিয়াছি, তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। অপরাজিতা দুই একবার নিষেধ করিল কিন্তু কে কার কথা শুনে? মাতাল বলিল,—"বিবিজান! আর গানে কায নাই, আমি তোমার জন্য পাগল হইয়াছি, এস কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আমোদ করা যাক। আমি কলিকাতা হইতে খুব ভাল শ্যামপেন আনিয়াছি; আমি ত ভাই তোমার অপরিচিত নই—তবে কেন কাছে আসিতে লজ্জাবোধ ক'র্‌ছো।"

অপরাজিতার বড়ই অসহ্য হইল, সমস্ত দিনের পর কোথায় সঙ্গীতে একটু তন্ময় হইবে, না কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। বাড়ীওয়ালার যেমন কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই ভাবিয়া দ্বারবানকে বলিল,—"বাবুকে এখনি উঠিয়া যাইতে বল—আমার এখানে ঐরূপ মাতালের স্থান নাই।" দ্বারবান বাবুকে বুঝাইয়া বলিল।

বাবু মাতালের সুরে বলিলেন,—"কেন বাবা! অমৃতে অরুচি কেন, আমি আজ আর কোথাও যাইতে পারিব না—বহুদিন পরে অপরাজিতা তোমায় পেয়েছি, আর ফাঁকী দিতে পার্‌বে না? আজ বহুদিনের আশা পূর্ণ ক'র্‌তেই হবে।"

কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, তথাপি কথাগুলো যেন তাহার কর্ণে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, অপরাজিতা নিকটে আসিয়া, "এঁ্যা এ কে" ! বলিয়া, চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বাবুটী নেশার ঝোঁকে একটী বিকট শব্দ করিয়া বলিল,—"বাইজী ! বহুদিনের আশা, অতৃপ্ত রেখো না,অনেক সন্ধান ক'রে—আজ তোমাকে পেয়েছি, টেনে ফেলে দিও না," বলিয়া যেমন ধরিতে অগ্রসর হইবে অমনি অপরাজিতা অপরদিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিল,—"পাষণ্ড যবনাধম, তোর এই প্রবৃত্তি ? আমার পিতার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আমারই সর্ব্বনাশ আশা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রয়াস ! রমজান্ ! এখনও প্রাণ লইয়া পলায়ন কর্; নতুবা তোর দুর্দ্দশার একশেষ হইবে, হিন্দুগৃহে যবনের প্রবেশ, যদি বেশ্যাও হই, তথাপি হিন্দু-বারবণিতা কখনও যবনকে স্পর্শ করে না, তুই কোন্ সাহসে আসিয়াছিস্ পাষণ্ড ? হিন্দুরমত পোষক পরিচ্ছদ করিয়া, মনে করিয়াছিস্ বুঝি চিনিতে পারিব না ? অপরাজিতার চক্ষু এখনও সে বিষয়ে খুব তীক্ষ্ণ, সে স্বাধীনা রমণী, সে বারবণিতা নহে—আজীবন সে চরিত্র দৃঢ় রাখিয়াছে,এখনি তুই দূর হ দুরাত্মন !"

রমজান আজীবন কলুষিত চরিত্র, হিন্দুস্ত্রীর সর্ব্বনাশ করাই তাহার জীবনের ব্রত, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, উন্মত্তের ন্যায় যেমন উঠিয়া ধরিতে যাইবে—অপরাজিতা সজোরে তাহার বক্ষে একটী পদাঘাত করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল, দ্বারবান পদাহত রমজানকে ধরাধরি করিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিল—সে চিৎকার করিয়া বলিল,—"এতদূর স্পর্দ্ধা ! প্রতিশোধ ! ভীষণ প্রতিশোধ ! রমজান ছাড়িবার পাত্র নহে।" তারপর টলিতে টলিতে সে গলির রাস্তায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

একে শরীরের অসুস্থতা, তায় আকস্মিক এই ঘটনায় অপরাজিতার

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, সে মনে মনে বলিল,—"ওঃ আমি কি নিঃসহায়! আমি এত বড়-বংশের কন্যা, শিক্ষিতা, কিন্তু আজ আমার অবস্থা কি নীচ, কি ঘৃণ্য! দুরাত্মা রমজান আমার প্রণয় পিপাসু হইয়া আমার গৃহে আগমন করে, বেশ্যা বলিয়া আমাকে প্রলুব্ধ করিতে চায়! হায়! অতবড় মানসম্ভ্রমশালী পিতার কন্যা হইয়া, এত দিন এত লেখাপড়া শিখিয়া কি আমার পরিণাম এই হইল, তুচ্ছ অস্পৃশ্যীয় রমজান আমাকে ধরিতে আসে, আজ আমি এত নিরাশ্রয়!" আজ অপরাজিতার সমস্ত কথা, বাল্যের সেই সব স্মৃতি, তাহার পরম পূজনীয় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য স্বামীর স্মৃতি, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃপূর্ণ অতুলনীয় বদনমণ্ডল মনে পড়িল! "হায়! অহঙ্কারে কত কথা বলিয়াছি—কত অবহেলা করিয়াছি কিন্তু একটীবারও তাঁহার নিকট তিরস্কৃত বা উপেক্ষিত হই নাই—কি কমনীয়, কি উদার ভাব, সুশিক্ষার কি মহান আদর্শ, জগতে বুঝি তাঁহার তুলনা নাই, এ হেন দেবতাকে আমি বিদ্যার অহঙ্কারে একেবারে হতজ্ঞান করিয়াছি, তখন বুঝিতে পারি নাই যে তাঁহার শিক্ষায় আর আমার শিক্ষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তিনি শিক্ষায় জ্ঞানলাভ করিয়া দেবত্ব পাইয়াছেন, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য সে দেবহৃদয়ে স্থান পায় না, আর আমি শিক্ষার সোপানে উঠিতে না উঠিতেই নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া অহংভাবে মুগ্ধ হইয়া, কাহাকেও দৃকপাত না করিয়া নরকার্ণবে ডুবিয়া পড়িতেছি। হায় কি করিতে কি করিয়াছি।" অপরাজিতা কাঁদিয়া ফেলিল। যে কঠিন হৃদয় মাতার মৃত্যুতে, ভ্রাতার মৃত্যুতে দ্রবীভূত হয় নাই, পিতার গৃহত্যাগেও যে হৃদয় অচল অটল ছিল—আজ সেই পাষাণ-হৃদয় গলিয়া চক্ষু ফাটিয়া বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিল! অপরাজিতা কাঁদিতে কাঁদিতে নতজানু হইয়া বলিল,—"প্রাণের দেবতা! আজ তুমি কোথায়! জীবনে কি আর

সে সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন জুড়াইতে পারিব না?" তারপর প্রবুদ্ধ হইয়া বলিল,—"ছি ছি! আমি করিতেছি কি? এ কলুষিত হৃদয় কি সে পবিত্র দেবতার আসন হইতে পারে? ইহা যে আচার ভ্রষ্ট, হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত কাযে পতিত, তবে আশা এই যে এ দেহ এখনও কলঙ্কিত হয় নাই—আসঙ্গলিপ্সা আমাকে অপবিত্র করিতে পারে নাই, আমার মনের বল এই যে, আমি এখনও কুলটা নহি, আচার-ব্যবহারে লোকে আমায় বেশ্যা বলে বলুক' কিন্তু ভগবান জানেন, কাম-মোহে মত্ত হইয়া আমি সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি কি না! উচ্চ শিক্ষা আমার কালস্বরূপ হইলেও আমাকে এ পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। আমার সব গিয়াছে কেবল এই টুকুর জন্যই আমি আশা করিতে পারি, নারী জীবনের সার সে পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।" তারপর উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"ভগবান! আর কিছু চাই না—কেবল দেখা, রমণী জীবনের দুর্ল্লভ রত্ন, দেবতার সেই পদযুগল একবার কেবল দেখিবার সাধ হয়, স্পর্শ করিব না, কলঙ্কিত করিব না, কেবল দেখিব, সাধ মিটাইয়া কেবল দেখিব। জগদীশ! দাও, দাও, ব'লে দাও, আমার সে দেবতা কোথায়!" অপরাজিতা জ্ঞানহীনা হইয়া শয্যাতলে কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। তারপর চৈতন্য হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"চারুচন্দ্র! তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ঋষিবংশ সম্ভূত, কেবল তোমার উপরই আমার মন পড়িয়াছিল, সেই জন্য তোমাকে কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলাম, কপট ভালবাসায় মুগ্ধ করিবার জন্য কত ছলনা-জাল বিস্তার করিয়া গৃহ বহির্গমনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি এমনি দৃঢ়, সুমেরুবৎ এমনি অচল অটল যে কিছুতেই বিচলিত হও নাই, দেবচরিত্র যাহা পারে নাই—রমণী মোহে মোহিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, মানুষ হইয়া তাহা তুমি

পারিয়াছ, অর্থলোভ তুচ্ছ করিয়াছ, উন্নতির আশা পদদলিত করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছ। তখন আমার অঙ্গুলি হেলনে তুমি একটু টলিলেই আমার যে কি সর্ব্বনাশ হইত—তাহা বলিতে পারি না, তাই এখন করযোড়ে উদ্দেশে তোমায় নমস্কার করিতেছি, তোমার চরিত্র দেবতার অপেক্ষাও উচ্চ—মহান আদর্শে গঠিত, না হইবে কেন, দেবী সদৃশ্যা বৃদ্ধা যে তোমার গর্ভধারিণী, মা যে আমার সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, আমি এত তিরস্কার করিলেও কন্যা ভ্রমে একদিনের জন্যও তিনি তাহাতে রাগ করেন নাই। আমি পতিতা হইলেও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা আজীবন অতুল সুখসম্ভোগ কর।"

অপরাজিতা উঠিল—নিরাশায় বুক বাঁধিল, অবসাদগ্রস্ত অশেষ বেদনাযুক্ত প্রাণ আশ্বস্ত করিয়া নিজের অলঙ্কারাদি সমস্ত খুলিল, পোষক-পরিচ্ছদ সমস্ত ছাড়িয়া ঠিক বিধবার মত না হউক, সামান্য একখানি ধুতি পরিধান করিল, সুগন্ধি-তৈল-সিক্ত সুবিন্যস্ত কেশ রাশি অবিন্যস্ত করিয়া দিল, সধবার চিহ্ন স্বরূপ সীমন্তে যে ক্ষুদ্র সিন্দুর বিন্দু ছিল, কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া তাহা আরও খুব বড় করিয়া দিয়া বলিল, "আজ হইতে এই আমার সুবেশ, পতি আমার নিরুদ্দেশ, আর আমি বিবি সাজিয়া সুখে লালিত পালিত হইব? কিছুতেই নহে।" পরদিন সৎব্রাহ্মণ ডাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করিল—গোময় ভক্ষণে মনের পবিত্রতা সাধন করিল। অলঙ্কারাদি এবং গৃহের আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিল। বাড়ীওয়ালা অপরাজিতার ভাব গতিক দেখিয়া বলিল,—"মা! এ কি করিতেছ?" অপরাজিতা বলিল,—"শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এইবার মনের ও প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।"

বাড়ীওয়ালা প্রমাদ গণিল—অতিরিক্ত মদ্যপানে ছুঁড়ী পাগল হইয়া

গিয়াছে মনে করিয়া সে কিছু কিছু ফাঁকি দিতে ছাড়িল না। অপরাজিতা জানিয়া এবং বুঝিয়াও কিছু বলিল না—এরূপ পাগলের ভান না করিলে সে তাহার বাটী হইতে উঠিয়া যাইতে পারিবে না, তাহার দ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতেছিল—এখনও ঠিক আছে জানিতে পারিলে সে, কাশীর পাণ্ডা—অসীম গুণ্ডা—ছাড়িয়া দিবে কেন? বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, —"তুমি এখন কোথায় যাবে?" সে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,— "যাব আর কোথায়? যমের বাড়ী!"—তাহার ফেল্ ফেল্ দৃষ্টি দেখিয়া বাড়ীওয়ালা আর কোন আপত্তি করিল না; ভাবিল, বোধ হয় কাল সে বাবুটা এসেছিল—সে মদের সহিত কিছু খাওয়াইয়া ইহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে—আহা! ছুঁড়ির দ্বারা বেশ দু-পয়সা পাওনা হ'চ্ছিল, বেটা সব নষ্ট ক'র্‌লে! কিন্তু আর ভাবিয়া কি হইবে, এখন এ পাগলকে যত শীঘ্র বাড়ী ছাড়া ক'র্ত্তে পারা যায়—ততই মঙ্গল। স্বার্থপর জগতের কার্য্যই এইরূপ!

অপরাজিতা ব্রাহ্মণীকে দিয়া গঙ্গার ধারে অতি নির্জ্জন স্থানে একটী ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়াছিল, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় ব্রাহ্মণীর সঙ্গে একখানি গাড়ী করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি সহ তথায় উপস্থিত হইল। পাচিকা ব্রাহ্মণীকে সে মা বলিয়াছিল—আজ হইতে তিনি অপরাজিতার অভিভাবিকা হইলেন। ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা, এখন ত চরিত্র খুব ভাল, তবে পূর্ব্বে কিরূপ ছিল—তাহা আমরা বলিতে পারি না।

নবম পরিচ্ছেদ।



পথে পথে।

আষাঢ় মাস—বর্ষাকাল; টীপ টীপ করিয়া সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতেছে। আসামের পথে লোকজন নাই। দিবাভাগ হইলেও যেন অন্ধকারে চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে মেঘ গর্জ্জন হইতেছে। আকাশের কড় কড় শব্দসহ মিশিয়া চঞ্চলা চপলা অট্টহাসি করত কত রঙ্গ করিতেছে। হিন্দুর মহাপর্ব্ব অম্বুবাচী আরম্ভ হইয়াছে, ধরিত্রীর রজস্বলা অবস্থা—তাই শস্য-ক্ষেত্রের কর্ষণ কার্য্য একপ্রকার বন্ধ, তবে মাঠের স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক ক্ষেত্রে জল সঞ্চয়ের ব্যবহার জন্য এদিক ওদিক করিতেছে। দুইধারে ধান্যক্ষেত্র মধ্যস্থলে রাজবর্ত্ম—লোকজন অভাবে খাঁ খাঁ করিতেছে; এ দুর্য্যোগে কেহই বাটীর বাহির হয় নাই। বাটীর বাহির হওয়া দায় বলিয়া পূর্ব্বে লোকে বর্ষাকালের জন্য যাবতীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত; দারুণ বৃষ্টি বাদলে গৃহস্থ প্রায়ই বাটীর বাহির হইত না। এখন সেরূপ বর্ষার প্রকোপ নাই, পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেরূপ নিয়মিত বারিপাত এখন আর হয় না, কাযেই গৃহস্থ আর সেরূপ সঞ্চয়ের ধার ধারে না, সেরূপ উদ্যোগ অনুষ্ঠানও আর করে না।

আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন—কয়েক দিন কেহ সূর্য্যের বদন অবলোকন করে নাই—তবে বর্ষা তত জোর হয় নাই, মাত্র বিগত রজনী হইতে পর্য্যন্য দেবের প্রকোপ দৃষ্টি কিছু বেশী হইয়াছে—কিন্তু কর্ষণ ত হইবে না, অম্বুবাচীতে ত হিন্দু কর্ষণ কার্য্য করে না; তাই মাঠে এবং রাজপথে লোকজন নাই; কেবল মাত্র একজন বিদেশী পথিক গন্তব্য

স্থানে যাইবার জন্ত এ দুর্য্যোগেও পথ অতিবাহিত করিতেছেন। এ সময় কামরূপ কামাখ্যায় ভগবতীর যোনীপীঠে মহাধূম হয়, ধরিত্রীর রজস্বলা অবস্থা এখানে নাকি প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়, তাই পথিক প্রাণের উৎসাহে চলিয়াছেন—প্রথমে কামাখ্যায় মাতৃমন্দিরে এই ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া দেবীদর্শনে প্রাণের আগ্রহ নিবৃত্তি করিবেন, তারপর মণিপুরে যাইবেন—এই উদ্দেশ্য। অম্বুবাচী নিবৃত্তি হইলে ত আর কামাখ্যা যাওয়ায় তত ফল হইবে না; এই জন্য উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছেন। পথিক যুবক নহেন—বার্দ্ধক্যের প্রথম সীমায় উপনীত; তথাপি আগ্রহ তাঁহাকে ঠিক যুবকের ন্যায় মহোৎসাহে পথ অতিবাহিত করাইতেছে, দারুণ বর্ষাতেও কোন কষ্ট অনুভূত হইতেছে না। প্রাণের ইচ্ছা বলবতী হইলে বৃদ্ধও যুবার মত কর্ম্মক্ষম হইতে পারে।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল, রজনী যোগে অজানা পথ ত অতিবাহিত করা উচিত নয়—পথিক মাঠ অতিক্রম করিয়া এক গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! কামাখ্যার মাতৃমন্দির আর কতদূর; আমি কোথায় আসিয়াছি?" বৃদ্ধ গৃহস্বামী বহির্ব্বাটীর চালায় বসিয়া পাঠ কাটিতেছিল; সহসা একজন ভদ্রবেশধারী বিদেশী পথিককে দেখিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে বসিতে বলিল এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিল,"ঠাকুর কর্ত্তা! আপনি কামরূপের কাছে আসিয়াছেন; আর এক দিন খাণিকক্ষণ চলিলেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।"

পথিক সেদিনকার মত থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে, গৃহস্বামী আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন। গৃহস্বামী আসামবাসী হইলেও কিঞ্চিৎ শিক্ষিত,ভদ্রবংশ সম্ভূত—কথাবার্ত্তায় অনেক গোলমাল থাকিলেও একপ্রকার বুঝিতে পারা যায়। পথিকের গলদেশে যজ্ঞোপবীত দেখিয়া গৃহস্বামী পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরকর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন

করিয়াছিল—ইহাতেই বোধ হয় গৃহস্বামী পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের লোক-জনের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিল। তাহার সরল ও ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া পথিক কোন দ্বিধা না করিয়া সেদিনকার মত সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। রাত্রিযোগে সেই দরিদ্র গৃহস্থ এই দারুণ বর্ষাকালেও যেরূপ ভাবে আতিথ্য সৎকার করিল, বোধ হয় সহরে বড়লোকও সেরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ। সহরে কাহার বাটীতে কোন অতিথি আসিলে, প্রথমত তাহাকে চোর বদমাস বলিয়া আমলই দেওয়া হয় না—আতিথ্য সৎকার ত পরের কথা। পল্লীগ্রামে কিন্তু এ ভাব নাই; এই দারুণ দুর্ম্মূল্যের দিনেও তাহারা অতিথিকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করে; অবস্থায় না কুলাইলেও বৃথা চোর বদমাস অপবাদ দিয়া তাড়াইয়া দেয় না।

গৃহস্বামী সহরবাসী ধনী না হইলেও তথাকার মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—চাষ আবাদ আছে, গৃহে কয়েকটী পয়স্বিনী গাভী কামধেনুর মত দুগ্ধ প্রদানে শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে—পুকুরের মাছ, গোলার ধান ত আছেই। পথিক রাত্রে একসের পরিমিত খাঁটী দুগ্ধ, গৃহে প্রস্তুত ঘৃতপক্ক "টানা মেঠাই" নামক একপ্রকার মিষ্টান্নে উদর পূর্ণ করিলেন। "টানা মেটাই" সহরের মিঠাই অপেক্ষা কোন অংশেই মন্দ নহে—বরং উৎকৃষ্ট।

আহারাদির পর বাহিরের সেই চালা ঘরে শয়নের ব্যবস্থা হইল; স্থান অজানিত, রাত্রি কাল, ভীষণ দুর্য্যোগ—যদি রাত্রে ভদ্রলোকের কিছু আবশ্যক হয়, তজ্জন্য গৃহস্বামীও সেদিন সেই ঘরে অতিথির সহিত অবস্থান করিলেন। রাত্রে পরিচয় হইল—গৃহস্বামীর অবস্থা যে খুব ভাল, তাহা বেশ বুঝা গেল। তাঁহার দুইটী পুত্র কলিকাতায় ব্যবসা করে—দেশেও এই অবস্থা—কোন অভাব নাই। গৃহস্বামী অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"বাবা! আমি এখন পথ

পর্য্যটক, আমার পরিচয় তাদৃশ কিছু নাই—তবে এক সময় ছিল, কলিকাতার নিকট হুগলী জেলায় বাটী ছিল—কাষকর্ম্মও ভাল করিতাম; স্ত্রী-পুত্র বিয়োগ হওয়ায় কিছুদিন কলিকাতা, তারপর কাশীতে অবস্থান করিয়া কোন মহাপুরুষের আদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি—আমার আত্মীয় স্বজন এখন বড় কেহ নাই। এক্ষণে ৺কামাখ্যাধাম হইয়া মণিপুর যাইব। শুনিয়াছি আমার গুরুর গুরু একজন মহাপুরুষ তথায় আছেন, তাঁহারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি।"

গৃহস্বামী। দেখিতেছি—আপনার বয়স হইয়াছে; এত বয়সে এরূপ পথশ্রম, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। কেন আপনি এরূপ কষ্ট করিতেছেন?

পথিক। হাঁ বাবা! কথা ঠিক কিন্তু শরীরকে যত বিনা পরিশ্রমে রাখিবে—ততই সে নষ্ট হইয়া যাইবে; তবে অধিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর সত্য, কিন্তু আমি ত কাহারও হুকুমে কায করিতেছি না; যতটুকু পারিব—ততটুকু করিব—তারপর বিশ্রাম করিব। আমার নিজের কিছু না থাকিলেও—সৎস্বভাব সম্পন্ন হইলে ভগবানের রাজত্বে ত খাইবার অভাব হয় না।

গৃহস্বামী। ঠাকুর কর্ত্তা! আপনি কাশী ছাড়িয়া মণিপুরে কতদিন থাকিবেন; সে স্থান ত আপনার স্বাস্থ্যের উপযোগী হইবে না।

পথিক। বেশীদিন থাকিব না, গুরু অন্বেষণে যাইতেছি; তাঁহার দর্শন পাইলেই ফিরিয়া আসিব; আর যদি নাই ফিরি, যদি দেহ রাখিতে হয়—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমার জন্য কাঁদিবার ত কেহ নাই। আচ্ছা বাবা! তোমাকে ঠিক বাঙ্গালীর মত কথা কহিতে শুনিতেছি—আসামী-ভাষার জড়তা কিছু মাত্র নাই—তুমি কি বাঙ্গালা দেশে কখন ছিলে?

গৃহস্বামী। হাঁ কর্ত্তা! আমি শ্যামনগরের হাটে কিছুদিন কাপড়ের দোকান করিয়াছিলাম, একজন মুসলমান আমার অনেক টাকার

কাপড় ফাঁকি দিয়াছিল—তাহার নামে, আদালতে নালিশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি জানি হাকিম বেটা তাহার নিকট কোন ঘুস খাইয়াছিল কি না; আমার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিল। সেই থেকেই আমি বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে আসিয়াছি; আমার মূল ধন সমস্ত নষ্ট হওয়ায় চাষ-বাস করিতেছি; এখন আপনার আশীর্ব্বাদে ছেলে দুইটী মানুষ হইয়াছে, আর আমার কোন কষ্ট নাই।

পথিক কথা শুনিয়া যেন কথঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল, একি তবে সেই শ্রীমন্ত সর্দ্দার; রমজান যাহার কাপড়ের দোকান লুট করিয়াছিল। হায়! রমজানের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া আমিত ইহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম; ওঃ অর্থের জন্য জীবনে না করিয়াছি কি—হাঃ ভগবান! এরূপ দুরাত্মারও কি সদ্গতি হয়—জীবনে শান্তি লাভের জন্য গুরু অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু তাহা পাওয়া কি সম্ভব? তবে আশা আছে—সে সকল ধন-রত্ন, আমি এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য খরচ করি নাই. আসিবার সময় সাধ্য মত সৎকার্য্যে খরচ করিয়া আসিয়াছি; যৌবনের মোহে পড়িয়া—যাহা করিয়াছি, ভগবান কি তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন না; ক্ষমাময় তিনি, অধমের এ অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন! পথিক আর ভাবিতে পারিল না;—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল; গৃহস্বামীও অতিথিকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া আর কোনরূপ বিরক্ত না করিয়া—পার্শ্বে নিদ্রাভিভূত হইল।

ইনিই আমাদের কাশীর শ্যামাচরণ! কন্যা অপরাজিতার উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র দর্শনে দুর্ব্বিসহ মানসিক চিন্তায় কাতর হইয়া এবং তথায় কোন গুরু মিলিল না—যিনি তাঁহার এই জীবনের দুঃসহ কষ্ট লাঘব করিতে পারেন। যাঁহারই কাছে মন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তিনিই বলেন—এখন সময় হয় নাই। একদিন চামুণ্ডা আশ্রমে পূর্ণানন্দের নিকট শুনিয়াছিলেন—যে মণিপুরে তাঁহার ইষ্টদেব

আছেন—তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি মণিপুরে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাই শ্যামাচরণ এই দূরদেশে আসিয়াছেন। এখন তাঁহার প্রাণে এতদূর অনুতাপ আসিয়াছে, যে শ্যামাচরণকে অসাধ্য সাধন করিতে বলিলেও কৃত পাপের জন্য তাহা তিনি করিতে পারেন এবং এই আগ্রহবশেই বোধ হয়, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখকর হইবার সম্ভাবনা।

পরদিন প্রত্যুষে শ্যামাচরণ গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া কামাখ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অম্বুবাচী নিবৃত্তি অবধি তথায় অবস্থান করিয়া দেবীচরণে মনোভীষ্ট সিদ্ধির বর প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।

পূর্ণানন্দের গুরুদেব মণিপুরে বাস করেন—তাঁহার কৃপা হইলে শ্যামাচরণের সদ্য মুক্তি লাভ হইতে পারে শুনিয়া, আজ তিনি মণিপুরের পথে একাকী চলিয়াছেন। পথের ভীষণতা—তাহার অত্যধিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি আসামপ্রান্ত দিয়া কিছুদিন পরে মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মণিপুর রাজবাটীর পান্থশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন তথায় পথ-ক্লান্তি দূর করিয়া একদিন আহারাদির পর অরণ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া দেখিলেন—তথায় লোক-জনের বসতি নাই। রাস্তার দুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি মস্তক উত্তোলন করিয়া বিধাতার পদস্পর্শ করিবার মানসে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে, বায়ুভরে ইতস্তত: সঞ্চালিত হইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া বলিতেছে বড় হইলেই কি, বিধাতার চরণ স্পর্শ করা যায়? এখানে বড় অপেক্ষা ছোটর আদর, ধনী অপেক্ষা নির্ধনের আদর, পণ্ডিত অপেক্ষা মূর্খের আদর বেশী; পুণ্যাত্মা অপেক্ষা পতিতের আশা শীঘ্র পরিপূর্ণ হয়। লীলাময় পতিত-পাবনের দয়ার সীমা নাই।

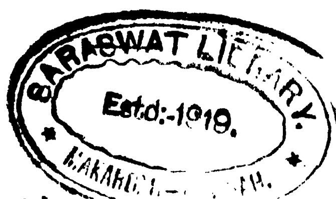
শ্যামাচরণ সাহসে ভর করিয়া পর্ব্বত সানুদেশে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র তটিনী তন্মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া তীব্র-বেগে কুল কুলস্বরে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহার ধারে ধারে ছোট ছোট হরিণ শিশু কেমন নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, শাখী শাখে পাখীগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে, স্থানটী যেন প্রকৃতির লীলা নিকেতন। সহরের লোক স্বভাবের এমন মনোহর শোভা আর কখন দেখে নাই। শ্যামাচরণ বিস্মিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া প্রকৃতির বক্ষে ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি শ্যামাচণের জ্ঞান নাই, মোহিত চিত্তে চলিয়াছেন ; কোথায় যাইবেন—কি করিবেন, তাঁহার মনে তখনও সে চিন্তা আদৌ নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মন কেবল ভাগবৎ পাদপদ্ম শরণ করিয়া ঈপ্সিত লাভে তন্ময় হইয়া কোথায় ছুটিয়াছে—কে জানে ?

যাইতে যাইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনমানবহীন রাস্তার উপর হঠাৎ একজন অপূর্ব্ব প্রভাজাল মণ্ডিত, সুদীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত বাহু, জটাভার সমন্বিত সন্ন্যাসীমূর্ত্তি শ্যামাচরণের সম্মুখে উদয় হইলেন। একটী ব্যতীত পথ নাই, তথাপি সন্ন্যাসী কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিলেন, শ্যামাচরণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামাচরণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি তিরোহিত হইয়া-ছিল, কিন্তু হৃদয়ে কোনরূপ ভয়ের উদয় হয় নাই। এই সৌম্যমূর্ত্তির মধ্যে চোর, ডাকাত কিম্বা অনিষ্টকারীর কোন চিহ্ন ছিল না ; সে মূর্ত্তিতে তেমন কোন তীব্রতা ছিল না, যাহাতে মনে কোন ভীতির সঞ্চার হইবে —বরং দর্শনমাত্রে অসীম শান্তির উদয়ে তাঁহাকে এক প্রকার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে

তিনি জাগ্রত কি স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। সন্ন্যাসী ক্ষণকাল তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্যামাচরণ যখন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর মণিপুরের জঙ্গলে আসিয়াছেন, তখন প্রাণ তাঁহার কত দৃঢ়, মন কত শক্তি সম্পন্ন—তাহা সহজেই বিবেচনা করা যায়।

শ্যামাচরণ সাধু সন্দর্শনে প্রলুব্ধ সহৃদয় হইয়াছেন, প্রাণ যাক্ আর থাক মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎধাবন করিলেন। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই—বনের একটী সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য প্রদেশের অনতিদূরে দেখা গেল—একটী বন্য হস্তী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে, অন্য সময় হইলে চিৎকার করিয়া হয়ত তিনি বনভূমি কম্পিত করিতেন কিন্তু অদূরে সন্ন্যাসী চলিয়াছেন—ভয় কি? দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী হস্তোত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবামাত্র বন্যজন্তু কি বুঝিয়া মস্তক অবনত করত অন্যদিকে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে একটী নরমাংস লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত, শ্যামাচরণের অন্তঃকরণে এবার ভয়ের লেশ মাত্র রহিল না; যিনি হস্তীকে হাত বাড়াইয়া সরাইতে পারেন, ব্যাঘ্রও তাঁহার ইঙ্গিতে সরিয়া যাইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল, হর্য্যক্ষ অবনত মস্তকে যেন তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে চলিতে চলিতে রজনীযোগে বনের অন্তরালে আসিলে সন্ন্যাসী ও ব্যাঘ্র আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। শ্যামাচরণ এতক্ষণ পরম উৎসাহের সহিত পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিলেন; মনের আশা সফল হইবে, এইবার তাঁহার শরণাগত হইবেন ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অদর্শনে প্রাণে দারুণ আঘাত

পাইয়া বসিয়া পড়িলেন, প্রাণে একটু একটু ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে বনভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। ভয় চকিত নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপন করিতে লাগিলেন, সাহসে ভর করিয়া এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনের পথ ত লোকালয়বাসী শ্যামাচরণের জানা নাই, তিনি জীবনে কখন এরূপ নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করেন নাই। চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, সুখে সহরের আলোকোজ্জ্বল রাজবর্ত্মে অথবা আলোকাধার হঁস্তে দাস দাসী পরিবৃত হইয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত, যিনি আজীবন উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই সরকারী কর্ম্মপ্রিয় ডেপুটী শ্যামাচরণ আজ নিবিড় বনপথে পতিত, উদভ্রান্তচিত্তে কতদূর চলিয়া আসিয়াছেন, এখন রাজবাটীর পান্থশালায় ফিরিয়া যাওয়াও দুষ্কর, অথচ এখানে এইরূপভাবে আর কিছুকাল থাকিলে তাঁহার প্রাণ সহিত দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে, নিশ্চয়ই হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। গুরুর গুরুর দর্শন তবে কি পাইবেন না, তবে কি তাঁহার উদ্ধার হইবে না, এত সাধের মনুষ্য জীবন কি এইরূপ ভাবে হেলায় নষ্ট হইবে, তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হাঃ সন্ন্যাসী, তুমি আমার অভীষ্ট দেবরূপে সম্মুখে উদয় হইয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইলে প্রভু!" এমন সময় বনমধ্যে ব্যাঘ্রের ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর হইল, শ্যামাচরণ বিজাতীয় ভয়ে চীৎকার করিয়া জ্ঞানশূন্য দেহে ভূমিতে লুটিয়া পড়িলেন।



দশম পরিচ্ছেদ।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ যখন জগৎচক্ষু দিনদেবের অসীম শক্তি রক্ষিত কিরণজাল দেবতার অমৃতময় করকমল স্পর্শের ন্যায় শ্যামাচরণকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিল, তখন তিনি দেখিলেন, পর্ব্বতের সুউচ্চ চুড়ায় একটী শোভনসুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। প্রথমে মণিপুরের পান্থশালা পরে তথাকার রাজপ্রাসাদ তাঁহার মনে হইল, গবাক্ষ পার্শ্বে দাড়াইয়া দেখিলেন--এ তাহা নহে; নরকলকণ্ঠ শব্দায়মান রাজপুরীর কোন সংস্রব এখানে নাই, ইহা যে অতি নির্জ্জন, মনুষ্য বসতির অতিদূরে, পর্ব্বত গৃহচূড়ে এ অট্টালিকা অবস্থিত, নীচে অতিদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী বিরাজিত, মনুষ্য কণ্ঠস্বর আবহাওয়ার ন্যায় অতিকষ্টেও এখানে পৌছায় না। তখন গত রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে শ্যামাচরণ একপ্রকার বিহ্বল হইয়া কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ভাবিলেন—তবে কি আমি কোন বন্যজাতি কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া এই নিভৃত-গৃহে আবদ্ধ হইয়াছি! যাহা হউক, প্রাণের ত মমতা নাই, যখন অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া এই অজানা প্রদেশে আসিয়াছি, তখন একেবারে আশা ত্যাগ করিলে চলিবে কেন, এত আর রজনী নয়, দেখিনা ভগবান কি করেন। গৃহের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ত যে এ দস্যু কারাগার নয়, সকলই সাত্বিক ভাবে বিশিষ্টরূপে সজ্জিত। অনতিদূরে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া একটী ঝরণা নামিয়া

যাইতেছে, শ্যামাচরণ সাহসে ভর করিয়া তথায় প্রাতঃকৃত্যাদি এবং প্রাতঃসন্ধ্যা ও গায়ত্রী পাঠ সমাপন করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন—গৃহের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর ফল ও এক কমণ্ডলু জল রহিয়াছে—ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শ্যামাচরণ তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রাণ পুরিয়া অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির সহিত তাহা উদরস্থ করিলেন, জনমানবের সমাগম নাই, অথচ এ সকল কোথা হইতে আসিল! তবে কি কোন দস্যু প্রতারণা করিয়া এ সকল রাখিয়া গিয়াছে! প্রত্যেক মুহূর্ত্তে শ্যামাচরণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিতেছেন—এ সামান্য ফল জল ভক্ষণ রূপ ক্রটীতে তাঁর বেশী ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। শ্যামাচরণ ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া পাহাড়ের উপর গৃহের বাহিরে ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে কিছুদূরে একটী বিল্ববৃক্ষ মূলে পূর্ব্বদিনের সেই সন্ন্যাসীমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন গোচর হইল—মনের দারুণ সন্দেহ—প্রাণের প্রাণ-হারাণ ভয় তিরোহিত হইল। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্যামাচরণ দেখিলেন—সন্ন্যাসী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট. কোন সাড়াশব্দ নাই। তপঃপ্রভায় তাঁহার দৈহিক জ্যোতিঃ সে স্থান যেন কেমন এক বিমল শোভাসম্পদ সম্পন্ন করিয়াছে। শ্যামাচরণ নিকটস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি শ্যামাচরণের মন একেবারে মজিয়া গিয়াছে—মন যেন বলিতেছে,—"শ্যামাচরণ! ইনিই তোমার অভীষ্ট দেবতা, বহু কষ্টে লাভ হইয়াছে, মোহের বশীভূত হইয়া ছাড়িও না—পদতলে লুটাইয়া পড়, জীবনের প্রতিকার হইবে। মনের সঙ্গে কথা কহিয়া শ্যামাচরণ স্থির করিয়াছেন—ইনি আর কেহই নহেন—পূর্ণানন্দের আনন্দবর্দ্ধন গুরুদেবই এই মহাপুরুষ, ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি না হইলে—এমন মনমোহন রূপছটা, এমন দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ দেহ—এমন সৌম্যভাব কি সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব!

শ্যামাচরণ আশ্বস্ত হৃদয়ে সেই ধ্যান-নিরত যোগীবরের চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার বিমল রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল—তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া, ভালবাসা মাখান একটু মৃদু হাসি হাসিয়া শ্যামাচরণকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আকাশের চাঁদ হাতে পাইলে মানুষের যেরূপ আনন্দ হয়—শ্যামাচরণ ততোধিক আনন্দে করযোড়ে তাঁহার সহিত সেই গিরি-গৃহের দ্বিতলে একটী কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মে ও শ্যামাচরণ অদূরে বিস্তৃত একখানি মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিলেন। গৃহীর পক্ষে মৃগ-চর্ম্মাসন ও সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন। ইহার পার্থক্য এই—মৃগ চঞ্চলদৃষ্টি, আর ব্যাঘ্র স্থিরদৃষ্টি। গৃহীর মন স্বভাবত চঞ্চল, তাই মৃগাসন তাহাদের উপযুক্ত; সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ব্যাঘ্রের মত স্থির—মন কেন্দ্রীকৃত, শ্রীভগবানে সমর্পিত —স্বভাবতঃ নিশ্চল—তাই তাঁহাদের পক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্মই উপযুক্ত আসন।

শ্যামাচরণকে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া যোগীবর বলিলেন,—"বৎস! তুমি কি কাশীর পূর্ণানন্দের নিকট হইতে আসিতেছ?"

শ্যামাচরণ আশ্চর্য্য হইলেন—কোন পরিচয় উভয়ের হয় নাই—তথাপি ইনি আমার আগমন বার্ত্তা জানিলেন কেমন করিয়া; অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের অজানিত কি আছে! তিনি বিস্মিত না হইয়া যুক্তকরে বলিলেন,—"হাঁ প্রভু! তাঁহারই আদেশে!"

যোগীবর বলিলেন,—"এতদূর না আসিলেও হইত; তিনি উপযুক্ত চিকিৎসক, তোমার ভবরোগ দূরীকরণ করিতে তিনিও সমর্থ ছিলেন; তবে পরীক্ষার জন্য এতদূর পাঠাইবার কারণ তোমার মনে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে—তন্ত্রের উপদেশ তুমি মানিতে চাও না।"

শ্যামাচরণ। প্রভু! আমি মহাপাতকী; তন্ত্র শাস্ত্রের উপদেশ আমি

কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা ব্যাভিচারে পূর্ণ, তাই নানা-প্রকার সন্দেহ হয়।

সন্ন্যাসী। বৎস! ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। যাঁহারা ঘোরতর দুঃখের মূলীভূত কারণ বাসনাকে জয় করিয়াছেন, এই অনিত্য সংসারকে যাঁহারা কাকবিষ্ঠাবৎ ঘৃণ্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন—পরম করুণাময় দেবাদিদেব ভগবান সদাশিব তাঁহাদের জন্য নিবৃত্তিমার্গের প্রচলন করিয়াছেন—এপথের প্রধান অবলম্বন—জ্ঞান ও ভক্তি। দ্বৈত ভাবে ভক্তি করিতে করিতে অদ্বৈত জ্ঞানের সঞ্চার হয়—ভক্তি গাঢ়তর হইলে প্রেম এবং গাঢ়তর প্রেমের পরিণতি জ্ঞানেই হইয়া থাকে। জ্ঞান যখন পূর্ণ মাত্রায় উপচিত হয়—তখন মানুষ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে থাকে—ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রুতির এই উদ্দেশেই উপস্থিত হইবার জন্য সদাশিব এইরূপ ভাবে জীবকে উপদেশ দিতে-ছেন—কারণ সকল লোকের প্রকৃতি ত এক নহে—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবে প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সাত্বিক স্বভাবের লোক পাওয়া এখন দুষ্কর—নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা আছেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা সাধক, সাধ্য ও সাধনা এই তিনের সমন্বয় করিয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। যতদিন এই তিনের তত্ত্ব সম্যক-রূপে নিরুপিত না হয়, তত দিন জীব শিব হইতে পারে না।

শ্যামাচরণ। ঠাকুর! কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার মত, প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি দিয়া উচ্ছেদ করত নিবৃত্তি মার্গে যাওয়াই ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে কেমন কেমন মনে হয়। অগ্নিতে ইন্ধন দিলে সে ত বাড়িয়াই যাইবে।

সন্ন্যাসী। সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে প্রথমে না আনিয়া ফেলিলে, উন্মার্গগামী মনকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় কই? প্রথমে দেবদেবীকে উৎসর্গ করিয়া ঐ সকল করিতে আরম্ভ কর—তাহা হইলে যথেচ্ছাচারের

নিবৃত্তি হইবে—তারপর তুমি মানুষ—বিবেক বুদ্ধি ত তোমার একটু না একটু আছেই, তখন ঐ বুদ্ধিবলে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, একটুও ত বুঝিতে পারিবে—তখন নিবৃত্তি করিতে আর বিলম্ব হইবে না—তখন ধর্ম্ম করিব বলিয়া কর্ম্মে মতি হইবে, ঐ সকল উৎপাত আপনাপনি কমিয়া আসিবে। বাবা! ধর্ম্ম এমন জিনিষ নয়, শাস্ত্র বলিতেছেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ধর্ম্মের নাম মনে উদয় হইলে প্রবৃত্তিকে কেমন করিয়া নিবৃত্তি করিব, তখন আপনিই তাহার পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিবে—কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যাহারা ঘোর তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি, তাহাদিগকে নিয়ম ও ক্রিয়ার অধীনে আনিয়া ক্রমশঃ সত্বগুণে গুণবান করিবার ক্ষমতা কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে। অন্য শাস্ত্র উহাদের বাদ দেয়, পতিত বলিয়া দল ছাড়া করে। সার্ব্বজনীন তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু ঐরূপ পতিতজনকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ। ভগবান সদাশিব মনুষ্যের প্রকৃতিভেদে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রজ ও তম প্রকৃতির জন্য একরূপ, সত্ব প্রকৃতির জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা।

শ্যামাচরণের মনে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা ছিল—সন্ন্যাসীর কথায় ক্রমশঃ যেন একটু একটু শ্রদ্ধা আসিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর! যে যে প্রকৃতির লোক, তবে তাহাকে সেই প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করা উচিত?"

সন্ন্যাসী। নয় কি? তাহা তুমি একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ, তবে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারিলে ক্রমশঃ সে প্রকৃতিরও ব্যতিক্রম হইতে পারে। যে মদ্য, মাংস এবং স্ত্রী বশীভূত, তাহাকে একেবারে নিরামিষাসী এবং কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিলে হিতে বিপরীত হইবে না কি? হঠাৎ একথা বলিলে—তাহারা হয়ত ধর্ম্ম করিতেই চাহিবে না—এই জন্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর—তারপর বিবেক তোমাকে আপনিই বাধা দিবে। অন্য

পথে টানিয়া লইবে। আজকাল অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা জীব হিংসায় ঘৃণা করে কিন্তু স্বজাতীয় দুস্থ লোকের বিষয় আশয় ক্রুরের মত ফাঁকি দিয়া গ্রহণ করিতে ত দ্বিধা বোধ করে না? প্রবৃত্তি মার্গে চালিত না হইয়া বিবেক বুদ্ধি বলে উহার একেবারে নিবৃত্তি করা মনুষ্য স্বভাব বিরুদ্ধ; কারণ আহার, পান, মৈথুন মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একেবারে উহার দ্বার রুদ্ধ করিলে—অন্য দিক দিয়া প্রবলবেগে বাহির হইলে—তখন সামলান দায় হইবে। এইজন্য আর্য্যশাস্ত্রে যাগযজ্ঞ ও বিবাহের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞে পশুবধ করিলে এবং শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিলে যেমন বিষে বিষের নাশ হয়—সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা ভোগবাসনা সংকীর্ণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যাহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া, তন্ত্রের দোহাই দিয়া অন্যায় কর্ম্ম করে, যোগ বিভুতি লাভের জন্য অযথা দেবদেবীর উপাসনা করে, তাহারা ভ্রান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্ম তাহারা বুঝে না। অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক দমন করিতে শিক্ষা দেয়, তন্ত্রশাস্ত্র কলেকৌশলে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া একেবারে প্রবৃত্তির হ্রাস ও ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা প্রদান করে। এই কার্য্য-কৌশলকে যোগ-শাস্ত্রের হাতেখড়ি বলে। যাঁহারা ইহা অভ্যাস না করিয়া একেবারে যোগ-নিরত হন—হাম্‌বড়া হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা নিজের পদে ত নিজে কুঠারাঘাত করেনই পরন্তু সমাজেরও বিশেষ অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণ। তন্ত্রশাস্ত্র কথিত যোগ-সাধনা কেবল উপলব্ধি করিবার জিনিস নহে; হাতে হাতে কার্য্য না করিলে, ইহার বিষয় কিছু উপলব্ধি করিতে পারা যায় না?

সন্ন্যাসী।—নিশ্চয়ই নয়—কার্য্য না করিলে ইহার গূঢ়ত্ব বুঝা যায়

না, যাহারা কার্য্য না করিয়া কেবল গুরুগিরি করিয়া লোকশিক্ষা দেন, তাহাদের দ্বারা বিপরীত ফল হয়। পাত্র বিবেচনা না করিয়া দীক্ষা দিলে শিষ্যের কোন ফল হয় না। যে যতটুকু ভার সহিতে পারে— তাহাকে তদপেক্ষা বেশী ভার প্রদান করিলে, সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? বিবেচনা কর, তুমি একজন লোক, তোমার প্রকৃতি কি সম্যক-ভাবে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছে, তুমি দায় পড়িয়া না হয় অনেক বিষয় ছাড়িয়াছ, কিন্তু প্রাণটা কি ঠিক সেইভাবে গঠিত করিতে পারিয়াছ?

শ্যামাচরণ। না প্রভু তা নয়, যৌবনের অনেক কামনা এখনও থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের মধ্যে উঁকি মারে, আক্রমণও করে—কিন্তু ততটা তীব্রভাবে নয়, তাই একপ্রকার সহ্য করিতে পারি।

সন্ন্যাসী। তবে জগতের অনেক দেখিয়া শুনিয়া, পোড় খাইয়া তোমার প্রকৃতি এখন বেশ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মে তোমার সুকৃতি মন্দ ছিল না।

শ্যামাচরণ এইবার সন্ন্যাসীকে করযোড়ে বলিলেন,—"প্রভু! আমি অনেক স্থানেই বিফলমনোরথ হইয়াছি—কেহই আমাকে দয়া করেন নাই। আপনি দয়া করিয়া এই পাতকীকে পরিত্রাণ করুন, প্রাণের মধ্যে যে বৃশ্চিক দংশন করিতেছে—পরকাল নিস্তারের জন্য যে বিষম ভাবনা আমার প্রাণের মধ্যে উদিত হইয়াছে—ঠাকুর! আপনি দয়া করিয়া তাহার শান্তি না করিলে, আমি এইস্থানে আপনার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব, বৃথা আর এ জীবনভার বহন করিব না।"

সন্ন্যাসী বহুপূর্ব্ব হইতেই শ্যামাচরণের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিয়াছিলেন— যোগবলে তাঁহার অসীম ত্যাগ স্বীকারের বিষয় অবগত হইয়া, মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস! চিন্তা নাই, আমি তোমার প্রকৃতি অনুসারে তোমাকে দীক্ষিত করিতেছি—ইহাতে তোমার

মঙ্গল হইবে, অচিরে তুমি তোমার জীবনের পথ আলোকিত করিয়া ভগবৎভাবে বিভোর হইতে পারিবে।"

শ্যামাচরণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। জীবনে তাঁহার কিছুমাত্র সুখ নাই, সংসারের কুটিলতা, তাহার অন্যায়াচরণে শ্যামাচরণকে প্রাণে দগ্ধ করিতেছিল; একদিনের জন্যও তিলমাত্র আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিষয়মদে যত দিন মত্ত ছিলেন, ভালমন্দ বিচারহীন হইয়া যত দিন সংসারের কুটিল পথে চলিয়াছিলেন, ততদিন প্রাণে কোনরূপ দুঃখ অনুভব করেন নাই, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন, যে দিন হইতে পেন্সন লইয়া গৃহে বসিয়া আছেন—একটু একটু করিয়া হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—সেইদিন হইতে বিবেকের তাড়নায় ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি এতদিন কি করিয়া আসিয়াছি; এখনই বা কি করিতেছি—সময় ত হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে এত বিষয়বৈভবের মধ্যে এত শীঘ্র চৈতন্য লাভ হয় না। চৈতন্য ঠিক বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়া শ্যামাচরণ এত শীঘ্র এরূপ একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন—যাঁহাদের কৃপালাভ করিতে পারিলে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবন অচিরে শান্তি-সলিলে অবগাহন করে।

পরদিন প্রাতঃকালে যোগীবর শ্যামাচরণকে তন্ত্র মতে দীক্ষিত করিলেন। তন্ত্রের বিধি বিধানানুসারে তাঁহার কর্ণে সজীব বীজ মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র শ্যামাচরণ কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন—যোগীবর ঠিক পিতার মত তাঁহাকে কোলে তুলিয়া মাতৃনামামৃত পান করাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন। তারপর শ্যামাচরণের আকৃতি-প্রকৃতি, মতিগতি মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া গেল, নবজীবন লাভ করিয়া শ্যামাচরণ গুরু পদে প্রণাম করিলেন। যোগীবর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বৎস! এই নিভৃতনিবাসে বসিয়া তুমি ক্রমাগত ছয়মাস সাধন ভজন কর;

এস্থান অতি নিরাপদ এবং শান্তিময়—এ স্থানের হিংস্র জন্তুও যে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া সাত্ত্বিক ভাবে বিচরণ করে—তাহা বোধ হয় সেদিন ব্যাঘ্র ও হস্তির ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছ। এখানে তপঃবিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এখানে বেশ দৃঢ়চিত্তে, মনে প্রাণে মায়ের ছেলে মায়ের সাধনায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ কর। বৎস! মায়ের স্নেহ লাভ করা ভক্তিপ্রবণ-হৃদয় সাধকের পক্ষে বেশী শক্ত কথা নহে। দুই চারিবার মা অন্তরীক্ষে থাকিয়া সন্তানের ভাবভক্তি অবলোকন করেন—তারপর বাৎসল্য প্রতিমা মায়ের আমার দয়ার উৎস খুলিয়া যায়, তখন কোলের ছেলে ফেলিয়া তাঁহার থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে, উধাও হইয়া আসিয়া পুত্রের তৃষিত প্রাণে শান্তির সুধাধারা ঢালিয়া অমর করিয়া দেন; কোলে লইয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করেন।" এই সকল কথা বলিয়া সন্ন্যাসী শ্যামাচরণের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ভ্রু মধ্যস্থ স্থান টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"দেখ! বৎস! তোমার পিতামাতা তোমাকে ধর্ম্মপথগামী দেখিয়া, এ পথে তুমি দ্রুত অগ্রসর হইতেছ দেখিয়া তাঁহারা কিরূপ আনন্দবিহ্বল হইয়াছেন। শ্যামাচরণের জীবনে যে ভাব উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা ছিল না—আজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই সকল অদ্ভুত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া সন্ন্যাসীর চরণে বারবার প্রণত হইতে লাগিলেন। তখন ডেপুটী শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিলেন—যোগশক্তির ক্ষমতা কতদূর। এ ক্ষমতা যাঁহার লাভ হইয়াছে—ত্রিজগতে তাঁহার আর অভাব কি আছে।

ধর্ম্মবলের তুল্য বল আর নাই। এই বলে বলীয়ান হইতে পারিলে মানবের অসাধ্য কিছুই থাকে না। যে শ্যামাচরণ কিছুদিন পূর্ব্বে ভোগবিলাসের বশীভূত হইয়া বেলা একপ্রহর অবধি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতেন। শয্যা হইতে চা পান করিয়া তবে দেহের জড়তা অপনোদন করিতেন, আজ সেই শ্যামাচরণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান

করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে পুষ্পাদি সংগ্রহ করেন, ঝরণার জলে স্নান করিয়া পূজায় বসেন, ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে বেলা দুইটা বাজিয়া যায়—তারপর গুরুদেবের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করেন, গুরুর আহারাদি হইলে দেবতার প্রসাদরূপে পাত্রাবশিষ্ট আহার করিয়া তাঁহার দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট হইয়াছে, হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চার হইয়াছে, বৃদ্ধ শ্যামাচরণ পুনরায় যেন যৌবনতেজো-দৃপ্ত হইয়া মণিপুরে সন্ন্যাসীর তপোবনে বিরাজ করিতেছেন।

সন্ন্যাসী এখানে চিরকাল অবস্থান করেন না। যোগীবরের কিছুদিন পরে স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইলে শ্যামাচরণকে বলিলেন,—"বৎস! আমি কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাইব। তোমার এখন যে অবস্থা হইয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে আর পতনের সম্ভাবনা নাই; যতদিন ইচ্ছা তুমি এখানেই থাক; শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধি ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া চল—সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছি মনে করিয়া ঐ সকল ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিও না—সংসারীর পক্ষে, শুধু সংসারীর পক্ষে কেন—শাস্ত্রবিধি না মানিয়া চলিলে—সকলের পক্ষেই সে নিতান্তই অপরাধ এবং জগতের নিকট হেয়—বিশ্বজননী সেরূপ সন্তানের প্রতি কখন প্রীত নহেন। অতএব শাস্ত্রবিধি অবহেলা করিও না।"

যোগীবরের স্থানান্তরে যাইবার কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ কথঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! চিন্তা করিও না—সময়ান্তরে আবার দেখা হইবে, এক্ষণে যতদিন পার, এস্থানে থাকিয়া কাশীতে ফিরিয়া যাইও; সেখানে এখনও তোমার অনেক কায বাকী আছে। এই সময় তথায় যাইলে পূর্ণানন্দ তোমাকে যোগসাধন বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিবে—তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও, তাহার শিষ্য-পুত্র তারাদাস ও বিমলাকেও জানাইতে ভুলিবে না, পূর্ণানন্দ আমার আদেশে সংসারের অনেক কার্য্য সাধন করিতেছে। রামনিধি ও মোক্ষদা

এবং তাহাদের পুত্র ও পুত্রবধূকে যেরূপ ভাবে উন্নত করিয়াছে, সংসারীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। যেখানে থাক আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য স্থির থাকিবে; মায়ের কৃপায় অচিরে তুমি শান্তি লাভে চিত্তস্থির করিতে পারিবে। প্রতিদিন সহস্রবার জপ করিবে—জপেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, মানব জন্মের সার্থকতা লাভের এমন সহজ উপায় আর নাই।"

সন্ন্যাসী শ্যামাচরণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ্ হইল—তিনি সেই শীলাতলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন—গুরুদেব আশ্রমে নাই; তিনি পূর্ব্বদিনের কথামত দেশ-ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন। মন বড়ই খারাপ হইল—পিতৃমাতৃ হারা হইলে মন যেমন উদাস হয়—কি হারাইয়াছি বলিয়া, যেমন প্রাণ সদাই কাঁদিয়া উঠে; প্রথম কয়েকদিন শ্যামাচরণের সেইরূপ হইতে লাগিল। তিনি আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। পুনরায় কাশী প্রত্যাগত হইবার জন্য আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আসিবার সময় আর শ্যামাচরণকে পথে কোন প্রকার ভয়ে অভিভূত হইতে হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।



চৈতন্য লাভ।

সকলে একে একে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় এতদিন পরে অপরাজিতা বুঝিয়াছে যে, সে জগতের চক্ষে কত ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত লোক থাকিতে পাচিকা ব্রাহ্মণীই এখন অপরাজিতার অভিভাবিকা। তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া পিতা অনেক দিন হইল, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অপরাজিতা অনেক অনুসন্ধান করিলেও তাঁহার দেখা না

পাইয়া হতাশ হইয়াছে। "নিজের কর্ম্মদোষে বৃদ্ধ পিতাকে দেশত্যাগী করিলাম; তিনি আমার কলঙ্ক রটনার ভয়ে সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবেন না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—এ বৃদ্ধাবস্থায় কোথায় যাইবেন কি করিবেন, কে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবে"—অপরাজিতার মনে এতদিন পরে এই অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে সকল দিক বজায় থাকিত, কিন্তু ভগবান্‌ যাহা করেন—তাহার মর্ম্মাবগত হওয়া কি ক্ষুদ্রচেতা মানবের সাধ্য? তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হয়—তৎসমস্তই মঙ্গলের জন্য, ইহা বুঝিবার শক্তি থাকিলে বিদুষী অপরাজিতার এমন পতন হইবে কেন?

জগতে চরিত্রবানের আদর সকলেই করে—হীন চরিত্রের বা সন্দেহযুক্ত—অসৎ চরিত্রের লোককে কেহ দেখিতে পারে না। সৎচরিত্র দরিদ্রের নিকট ধনবান নষ্ট চরিত্রের আদর নাই—নতুবা চারু চন্দ্রের নিকট ধনী কন্যা অপরাজিতা এত উপেক্ষিতা হইল কেন? এত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সে তাহাকে অনায়াসে ফেলিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার বৃদ্ধা মাতাও ত যাইবার সময় তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না, একটী কথাও বলিল না, এতদিন তাহার পিতার অন্নে জীবন ধরিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়া যাইবার সময় তাহার প্রতি তিলমাত্রও কৃতজ্ঞতা দেখাইল না। অপরাজিতা চারুকে কত ভালবাসিত, ভাল খাওয়াইত, ভাল পরাইত; অভাব অভিযোগে যথেষ্ট সাহায্য করিত—পরিশেষে ইহাই তাহার প্রতিদান? তাহাকে কুলটা বুঝিয়া সকলে যে তাহাকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিত—অপরাজিতা এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। চরিত্রের তুল্য আদরণীয় পদার্থ মানবের যে আর নাই—সে বিষয়ে এখন তাহার বিশেষ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হইয়াছে যে এতদিন সে কি করিয়াছে; জগতের নিকট নিন্দনীয় হইতেই কি

সে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সামান্য মোহের বশে সে কি করিতে কি করিয়াছে। দুই এক দিনের সামান্য উত্তেজনায় এত নিন্দা এত ঘৃণা, না জানি একেবারে নষ্ট হইলে তাহাকে জগতের কোন্ নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িতে হইত। সন্দেহে এত নিন্দা, বাস্তবিক হইলে যে কি দুর্গতি—তাহা ত ভাবিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। এই জন্য হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা নিষেধ; হিন্দু-স্ত্রী পরাধীনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বাধীনা হইতে চেষ্টা করিলে পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছনা—গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি যতই লেখাপড়া শিক্ষাকরুক—তাহা-দিগকে পরাধীনা থাকিয়া সমাজের মধ্যে সংসারের আবিলতার মাঝখানে স্বামীপুত্র লইয়া ধর্ম্মভাবে জীবন কাটাইতে হইবে—এবং এইরূপ ভাবে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করাই হিন্দুস্ত্রীর শ্লাঘার বিষয়: অপরাজিতা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে—যে সে বিপথে চলিয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছে; জগতের নিকট তাহার মান সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, সে পতিতা হইয়াছে, কার্য্যগুণে হিন্দুর সংসারে আর তাহার স্থান নাই।

রক্তমাংসের শরীরে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে কেহ কখনও নিষ্কৃতি পায় নাই। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখিবার জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে এত অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে—স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ তাই তাহাদের মধ্যে এত পবিত্র। অপরাজিতা ভাবিল "হায়! আমি স্বইচ্ছায় সেই পবিত্র সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, স্বামীর সে পবিত্র হিন্দুভাব, সেই জলন্ত ব্রাহ্মণ্য তেজ উপেক্ষা করিতে গিয়া এখন নিজেই পুড়িয়া মরিতেছি। হায়! সে পবিত্র মূরতি এখন কোথায়; কোথায় স্বামীন্—আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

যৌবনে স্বামীর অভাব এখন অপরাজিতা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে—তাই এখন সে সদা-সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীর সহিত কেবল ঐ কথা লইয়া দুঃখ করে—সময়ে সময়ে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়। সে হাবভাব

সে ইংরাজী ধরণ এখন আর তাহার নাই—এখন চেয়ারে বসিয়া হারমোনিয়ামের সুরে গান করা এখন আর তাহার ভাল লাগে না। হিন্দু রমণীর মত ঘরের কোণে আবদ্ধ হইয়া পূজনীয় স্বামীদেবতার সেবা করার ইচ্ছা এখন তাহার মনে বলবতী হইয়াছে; হিন্দু স্ত্রীর সেই সুখই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়, অপরাজিতার এখন তাহা বেশ বোধ হইয়াছে।

"লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছি—তাহাতে ক্ষতি কি, আমাপেক্ষা অনেক শিক্ষিতা মহিলা হিন্দুর পবিত্র সংসার উজ্জ্বল করিয়া স্বামী-পুত্রের সহিত ভগবানের মহামহিমা বিস্তার করিতেছে; আমি কোন্ নগণ্য কীটানুকীট! তাঁহারা হয় আমার মত এত পুস্তক পড়েন নাই, মেম সাহেবের দ্বারা এত বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিতা নহেন, কিন্তু জ্ঞানে আমার সহিত তাঁহাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমি লেখা পড়া শিখিয়া অজ্ঞানীর ন্যায় অধঃপাতে যাইতেছি, ঘৃণায় লোকের নয়ন সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আর তাঁহারা সাংসারিক জ্ঞানে আমাপেক্ষা কত চরমে উঠিয়াছেন, লোকে তাঁহাদের দেখিবার জন্য, তাঁহাদের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। হিন্দুর পবিত্র সংসারের ছায়াতলে লালিতপালিত হইয়া আমি কর্ম্মদোষে নরকে পতিতা, আর তাঁহারা এই পবিত্র সংসারে জন্মলাভ করিয়া কর্ম্মগুণে স্বর্গের দেবকন্যারূপে প্রপূজিতা। এখন বুঝিয়াছি—এতদিন আমি যাহা করিয়াছি—তাহা সমস্ত ভুল করিয়াছি, পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য আজীবন আমাকে কষ্টভোগ করিতেই হইবে। হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, এই পবিত্র কাশীক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে যখন আমার চৈতন্য হইয়াছে, ভগবান ভবানীপতি যখন আমার চমক ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তখন যত কষ্টই হউক, আমি ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিয়া দেখিব, যদি এ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। আর প্রাণের একটী সামান্য ইচ্ছা এই—কাশীধামে ত অনেকেই আসেন, অনেকেই

এ পবিত্র তীর্থের স্বর্ণরেণু মাথা পাতিয়া লয়েন। ভগবান! একবার মাত্র দয়া করিয়া যদি আমার সে প্রাণের দেবতাকে সম্মুখে আনিয়া দাও, আমি তাঁহার সেই আরাধ্য পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া পরিণামে পরিত্রাণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি। আর কোন আশা পিপাসা নাই, আর কোন কামনা বাসনা নাই, কেবল একবার মাত্র দেখা!"

অপরাজিতা গঙ্গাতীরে একটী সামান্য গৃহ ভাড়া লইয়া পাচিকা ব্রাহ্মণীর সহিত তথায় বাস করিতেছে, এখন আর বাটীর বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা হয় না—কোন প্রকার বিলাসিতায় আর তাহার প্রবৃত্তি নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থাদিও কম হইয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণীকে না রাখিলে নয়—একজন উত্তর-সাধক, অভিভাবক ত চাই—নতুবা একাকিনী কেমন করিয়া থাকিবে—এই জন্য তাহাকে রাখিয়াছে। আর ব্রাহ্মণীরও এখন তত অর্থের লোভ নাই, খাওয়া পরার কষ্ট না হইলেই হইল, নগদ যত পাওয়া যাক আর নাই যাক; এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে অর্থ দিয়া আর পাচিকা রাখিবে কে? আর বেশী লোকের রন্ধন-কার্য্য এখন তাহার সামর্থে কুলাইবেই বা কেন?

অপরাজিতা এখন ঠিক দরিদ্র গৃহস্থের মত অতি প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্ম করে, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন পূর্ব্বক প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়া গৃহে আসে, ব্রাহ্মণীর সহিত রন্ধন করিয়া চারিটি আহার করে—তারপর রামায়ণ মহাভারত লইয়া বৃদ্ধার সহিত ধর্ম্মালোচনা করে—ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সময়ে সময়ে এখন তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে; আজ কয়েক মাস হইল—সেই কঠিন প্রাণ এত কোমল হইয়াছে।

গঙ্গাস্নান এখন নিত্যকর্ম্ম, তাই সে পবিত্র সলিল স্পর্শে দেহের মালিন্য অনেকটা নষ্ট হইয়াছে, এখন তাহাকে দেখিলে পবিত্র

হিন্দুরমণী বলিয়াই অনুমান হয় কিন্তু যাহারা তাহাকে এতদিন দেখিয়া আসিতেছে, কুলটা বলিয়া যাহারা তাহার নাম শুনিয়াছে, তাহাদের নিকট এখনও তাহার অপযশ বিঘোষিত হয়, তাহারা তাহাকে দেখিলে বা তাহার নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, কাছে যাইলে সরিয়া দাঁড়ায়—চরিত্রদোষ এমনই ভয়াবহ। অপরাজিতা প্রত্যহ একটী পিতলের কলসী লইয়া স্নানে যায়; স্নান করিয়া কুম্ভ ভরিয়া জল আনিয়া কোনও দেবতার স্থানে বা ব্রাহ্মণকে ঐ জল কলসীটী প্রদান করে—যে তাহাকে জানে না—সে গ্রহণ করে, যে জানে সে বেশ্যার জল বলিয়া গ্রহণ করে না—অপরাজিতা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ফিরিয়া আসে। এত করিয়াও তাহার কলঙ্ক ঘুচে নাই। সে তুলসীদাসের দোঁহাবলী পড়িয়া দেখিয়াছে—"অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন যায়তে"। কলঙ্ক কালিমায় বিমলিন হইলে দুই একদিন মাত্র গঙ্গাস্নানে কি হইবে, এখনও বিলম্ব আছে, অপরাজিতা হতাশ হইল না—সে বুঝিল—"কয়লাকা ময়লা ছুটে যব্ আগ করে প্রবেশ"—স্নান করিতে করিতে যখন বিবেক-বহ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, তখন এ অপবাদ অপসারিত হইতে পারে, হিন্দুস্ত্রীর চরিত্রের উপর দোষারোপ যে বড় ভয়ানক। এত শীঘ্র কি তাহা ছুটিয়া যাইতে পারে? অপরাজিতা নিরাশ হইল না—সে এখন এক জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না। তবে একটু ভয় করে পাপিষ্ঠ রমজানকে, সে সেদিন তাহার দ্বারা অপমানিত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, সুবিধা পাইলে সে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে কিন্তু এখন অপরাজিতা এমন নিভৃত স্থানে বাস করিতেছে, যে সহজে তাহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন, আর পথে ঘাটে দেখা হইলেও তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া লইবারও উপায় নাই—দৈহিক এত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় সে একা যায় না, ব্রাহ্মণী সঙ্গে থাকে। রমণী মণ্ডলে ঘৃণা করিলেও সে তাহাদের সহিত দলবদ্ধ হইয়া স্নানঘাটে যাইতে ক্রটী করে না। রমজান ত সহসা ভদ্র গৃহস্থের রমণী মহলে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিবার সাহস করিবে না। তাহার গৃহের চারিপাশে দোকানী-পসারী সমস্ত রাত্রি কার্য্য করে, সেখানে পাষণ্ডের দ্বারা অত্যাচারিত হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। ভগবান এখন অপরাজিতাকে সকল দিক দিয়া রক্ষা করিতেছেন, মানবের সাধ্য কোথায় তাহার অনিষ্ট করে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।



গ্রহণে স্নান।

আজ সূর্য্যগ্রহণ, কাশীর পথে চারিদিক হইতেই লোক সমাগম হইতেছে, মণিকর্ণিকার ঘাট আজ লোকে লোকারণ্য, সকলেই গ্রহণের পর মুক্তি-স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া আজ পতিত পাবনী ভাগীরথী তীরে সমাগত। ঘাটে একদিকে পুরুষ আর একদিকে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতেছে। পুরুষগণ নানাবিধ স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে, কেহ কেহ সঙ্কল্প করিয়া তীরে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে আর একবার একবার দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছে এখনও—কত বাকী, রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইবার এখনও কত বিলম্ব। ঘাটে কত প্রকারের ভিক্ষার্থী ভিক্ষা লাভাশায় গান গাহিতেছে, খোল করতাল বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে, দাতাগণের নিকট হইতে ভিক্ষা লাভ করিয়া পাত্রপূর্ণ করিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা জলে নামিয়া কেহ "মাতর্গঙ্গে পতিতপাবনী" বলিয়া

জলমগ্ন হইতেছে, কেহ কেহ "মাতঃ শৈলসুতা সপত্নি বসুধা শৃঙ্গার হারাবলি" বলিয়া ভাগীরথীর স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা পূজাদি সম্পন্ন করিয়া করযোড়ে "সদ্য পাতক সংহন্ত্রি" বলিয়া প্রণাম করিতেছে। কেহ ডুবিতেছে, কেহ উঠিতেছে, পুণ্যলাভার্থ মণিকর্ণিকার ঘাটে আজ সজাগ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী যুবতী ভিক্ষুকগণকে ইচ্ছামত ভিক্ষা দিয়া ঘাটের এক ধারে আসিয়া জলে নামিল। সে যুবতী—অপরাজিতা। রমণীগণ সকলেই তাহাকে বেশ্যা বলিয়া জানিত। তাই সকলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্থ সতী রমণীগণ সক্রোধ চক্ষু করিয়া বলিল,—"আঃ মর এ পাপ্‌টা আবার কোথা হইতে এলো?" যাহারা পূজা ও স্তব পাঠ করিতেছিল, তাহারা ক্ষণেকের জন্য তাহা স্থগিত রাখিয়া বলিল, "মর্ মাগী! স্নান ক'র্‌বার কি আর যায়গা পাস্‌নি, গা ঘেসে আসা।" অপরাজিতা বেশ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে জানে—সে অতিশয় পাপিনী। তবে যে সে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, তাহার কারণ—পতিত-পাবনী জাহ্নবী-সলিলে অবগাহন করিলে—সকল পাপ ধৌত হয়, ইহাই তাহার বিশ্বাস। 'তুমি যত বড় পাপীই হও না কেন যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, যদি প্রেমাশ্রুনীর এই ভাগীরথী-নীরে মিশাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পার, "মাতঃগঙ্গে পতিতপাবনী" বলিয়া ডাকিতে, পার, তাহা হইলে তুমি বেশ্যাই হও, আর যাহাই হও, নিষ্পাপ হইবে—মা গঙ্গা এমনি মহিমাময়ী।

অপরাজিতা এত তথ্য কিছুই ভাবে না। অন্য দিনের মত আজও সে আসিয়াছে, অতিশয় লাঞ্ছিত ঘৃণিত হওয়া সত্ত্বেও সশঙ্ক-চিত্তে দাঁড়াইয়া স্নান করিল—একটী পিতলের কলসী জল পূর্ণ করিয়া তীরে উঠিল। তখন গ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে ভাগীরথী জলে স্নান

সমাপন করিয়া কেহ বিশ্বেশ্বরের, কেহ অন্নপূর্ণার মন্দিরে, আবার কেহ কেহ বা চামুণ্ডা মন্দিরে জল দিবার জন্য সোণারপুরার পথ অবলম্বন করিল। অপরাজিতা একধারে সঙ্কুচিতা হইয়া দাড়াইয়াছিল, তাহার ইচ্ছা হইল—অন্যান্য রমণীগণের মত সেও আজ চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরে জল দিবার জন্য গমন করিবে। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরে বহু লোক সমাগম হইয়াছে—সেখানে যাইলে সে প্রবেশ করিতেই পাইবে না—দেব দেবী দর্শন হওয়া ত পরের কথা, কারণ তাহাকে না জানে কে? সে চামুণ্ডার নিভৃত মন্দিরে যাইবে বলিয়া স্থির করিল; দ্রুতপদে সিক্তবস্ত্রে মাথার কাল কেশরাশি পৃষ্ঠ বিলম্বিত করিয়া গৃহাভিমুখী হইল!

ঘাটের অনতিদূরে তাহার বাসভবন—গৃহদ্বারে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে তাহার মনোগত ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চামুণ্ডা-মন্দির অভিমুখে চলিল, যাইতে যাইতে তাহার কেমন চিন্তা হইতে লাগিল,—"আমার জল কি ঠাকুর লইবেন? ঠাকুর লইলেও পুজারীরা ত লইবে না—তাহারা যে আমাকে বেশ্যা বলিয়া জানে, তবে উপায়—তবে কি আমার আশা পূর্ণ হইবে না? আচ্ছা আমার জল যদি দেবতার কোন কাযে না লাগে, সিঁড়ি-উঠান ধোয়া ত হইতে পারে।" অপরাজিতা সাহসে ভর করিয়া চলিল—তাহার প্রাণ এখন দেবতার জন্য লালায়িত হইয়াছে। যে দেবতা মানিত না, মন্ত্র বুঝিত না, এখন সেই অপরাজিতা করযোড়ে প্রণাম করিতে শিখিয়াছে। সময়ের গতি অনুসারে মনের পরিবর্ত্তন—মানবের চিন্তার অতীত!

সোণারপুরার পথ অতিবাহিত করিয়া অপরাজিতা চামুণ্ডামন্দিরে সমুপস্থিত; মন্দিরটী ইষ্টক-নির্ম্মিত হইলেও চারিধারের গৃহ গুলি খোলার নির্ম্মিত; বেশ নয়ন-মনোহর শোভা সমন্বিত; চারিদিকে পুষ্প-বাটিকা, অতি শান্তিময় স্থান। অপরাজিতা মন্দিরের সন্নিকটে যাইয়া একধারে দাঁড়াইল। তখন মন্দিরে অনেক ভদ্রগৃহস্থের স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া-

ছেন, পূজা আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই—একজন পরিচারিকা সম্মার্জ্জনী হস্তে চারিদিক পরিষ্কার করিতেছে। ভিতরে একটী গৈরিক-বসনা আলুলায়িত-কুন্তলা সন্ন্যাসিনী, বয়স খুব বেশী নয়—মায়ের পূজার আয়োজন করিতেছেন। রমণীগণ ঠাকুর দেখিয়া আসিবার সময় সিঁড়ির ধারে অপরাজিতাকে দেখিয়া বলিল,—"আঃ মর—এ মাগীও যে আবার আমাদের সঙ্গে মন্দিরে এসেছে, মাগীর লজ্জা নাই গা, আর লজ্জা যদি থাক্‌বে, ত কুলে কালি দিবে কেন?" এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেল। অপরাজিতা তখনও ঠিক সমভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, পরিচারিকা প্রাঙ্গন পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল,—"কি আশায় দাঁড়িয়ে লো কলঙ্কিনী, মনে ক'রেছিস্ বুঝি, তোর জল নিয়ে দেবীর ভোগ রাঁধা হবে?"

অপরাজিতা অতি নম্রভাবে বলিল,—"না তা কেন, এ জলে ত ঘর দুয়ার ধুয়া হ'তে পারে, সেই জন্য আশা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।"

পরিচারিকা। মাগীর আশাও ত কম নয়—ওঁর ছোঁয়া জলে দেবীর ঘর দুয়ার ধোয়া হবে! বলে আমাদের জলই মন্দিরে উঠে না, মা নিজে, নয় বাবা স্বয়ং জল এনে দেবীর গৃহ পরিষ্কার করেন! ওর জলে এবার পরিষ্কার ক'র্ত্তে হবে, অভাগীর আশা দেখ!

উভয়ের কলরব শুনিয়া গৃহমধ্যস্থিতা ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"হাঁগা মা! কার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছিস্?"

পরিচারিকা বলিল,—"দেখুন মা! এক মাগী বেশ্যা, এক কলসী জল এনে বলে—মায়ের ভোগ রান্না না হউক, মন্দির ধুইবার জন্য এই জল নিতে হবে।"

ভিতর হইতে উত্তর হইল,—"তা কি হ'তে পারে? প্রভু আসিয়া রাগ করিবেন—যাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

এই সময় একটী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ভগবতীর স্তোস্ত্র পাঠ করিতে

করিতে মন্দির চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচারিকা অপরাজিতার পরিচয় ও তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

ব্রাহ্মণ রুষ্ট না হইয়া অতি মিষ্ট কথায় বলিলেন,—"তাও কি হয় মা! ইহা যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কেমন করিয়া ঐ জল স্পর্শ করিতে পারা যায়? তুমি উহা কোন বৃক্ষের তলায় ঢালিয়া দিতে বল—তাহাতেও ফল হইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ত্বরিত পদে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অপরাজিতা ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক একবার চকিতের ন্যায় দেখিয়া লইল—কি যেন কি মনে করিয়া ত্বরিত পদে মন্দিরের অপর পার্শ্বে যাইয়া একটী আম্র বৃক্ষের তলে "মা জগদম্বে" বলিয়া জল ঘড়াটী ঢালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। অদ্যকার এই ব্রত গ্রহণে তাহার প্রাণ যেন কতই আনন্দে ভরিয়া উঠিল; তারপর সে প্রতিদিনই এইরূপ করিয়া এক কলসী জল লইয়া মন্দিরে আসে, উঁকি মারিয়া দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; পুরোহিত ও পুরোহিত পত্নীর দর্শনান্তে তাহাদের পদে প্রণিপাত করত ভরা কলসী সেই বৃক্ষতলে খালি করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। মন্দিরের পরিচারিকা তাহাকে কত কথা বলে, কত ঘৃণা করে, অপরাজিতা তাহার কথা গ্রাহ্য করে না। ইহাতে তাহার প্রাণে যে অপরিসীম শান্তি আসিয়াছে; তাহার নিকট লোকের কটুবাক্য অতি তুচ্ছ; যে প্রাণ অশান্তির আগার হইয়াছিল—কিছুতেই শান্তি অনুভূত হইত না। এ কার্য্যে তাহার এখন বেশ আনন্দ হইতেছে—যাহা করিলে মনের আনন্দ হয়, অন্যের কথা শুনিয়া তাহা সে বন্ধ করিতে পারিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সন্ন্যাসীর কৃপা।

আজ প্রায় একবৎসর হইল—অপরাজিতা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছু মানে না—কেবল এই কার্য্য করিতেছে; ইহাতে তাহার অতুল আনন্দ—অভাবনীয় সুখশান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে!

একদিন ভূতচতুর্দ্দশী তিথিতে অপরাজিতা অতি প্রত্যুষে জল লইয়া আসিয়াছে। তখন দেবীমন্দিরের দ্বার খোলা হয় নাই—অপরাপর দ্বার মুক্ত, পুরোহিত—পুরোহিত-পত্নী স্নান করিতে গিয়াছেন; পরিচারিকাও বোধ হয়—সঙ্গে গিয়াছে, আর আজ ইনি আবার কে আসিয়াছেন? ইহাঁকে ত কখন এখানে দেখা যায় নাই; এমন অদ্ভুত প্রভাবিশিষ্ট, দীর্ঘ জটা শশ্রু সমন্বিত সন্ন্যাসীমূর্ত্তি ত এ মন্দিরে কখন নয়নগোচর হয় নাই, ইহাঁকে আগন্তুক বলিয়া বোধ হইতেছে না—মন্দিরের সর্ব্বত্রই ও ইহাঁর গতিবিধি রহিয়াছে, তবে ইনি কে; মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি কি তবে এই মহাপুরুষ স্থাপিত। অপরাজিতা কিছু বুঝিতে না পারিয়া একধারে দাঁড়াইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল—ইচ্ছা আজ প্রাণ ভরিয়া মায়ের পূজা দেখিবে।

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী পরিচারিকার সহিত স্নান করিয়া মন্দিরে আসিলেন এবং সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করত স্বাগত প্রশ্ন করিলে—সন্ন্যাসী বলিলেন,—"হাঁ বাবা! সমস্তই মঙ্গল; মা চামুণ্ডার কৃপায় তোমরা বেশ কুশলে আছ ত?"

"আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া উভয়ে পুনরায় পদধূলি লইয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। অপরাজিতাকে সিড়ির এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—"আঃ এ মাগী যে বড়ই বিরক্ত ক'র্‌লে; রোজ রোজ সকাল-

বেলা মাগীকে দেখ্‌তে হয়, মাগীর স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে দেখ্‌ছি।" অপরাজিতা তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; প্রায় একঘণ্টা হইল সন্ন্যাসী তাহাকে ঠিক ঐ অবস্থায়ই দেখিতেছেন, বৃহৎ জল পূর্ণ কলসীর ভারে তাহার কাঁকাল বোধ হয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—তথাপি কলসী নামায় নাই, অতিরিক্ত কষ্ট হইলেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐরূপ কাঁদিতেছে। রমণী কোন মানসিক করিয়া পূজার জন্য মন্দিরে আসিয়াছে ভাবিয়া, সন্ন্যাসী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। সিঁড়ির পার্শ্বে সেদিন অপরাজিতাকে দেখিয়া অমায়িক প্রকৃতি পুরোহিত ও পুরোহিত পত্নী একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"ও কে, কি চায়?"

পুরোহিত। শুনেছি, ওমাগী বেশ্যা ছিল; এখন কি রকমে মতিগতি ফিরিয়া গিয়াছে। আজ প্রায় এক বৎসর হইল—প্রত্যহ ঐ রকম এক কলসী করিয়া জল আনিয়া বলে—আমার জল কলসী লও, পূজার কাযে না লাগে, মন্দির প্রাঙ্গন ধুইয়া দিও। আমি উহাকে কোন গাছের তলায় ঢালিয়া দিতে বলিয়াছি—বেশ্যার জল কি দেবগৃহের কোন কাযে লাগিতে পারে?

সন্ন্যাসী অপরাজিতার আপাদমস্তক—তাহার ভাবভঙ্গী, প্রেমাশ্রু-সিক্ত সেই কমনীয় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"তোমার কি ইচ্ছা মা! তুমি কি চাও?"

অপরাজিতা কোন কথা কহিতে পারিল না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিল।

ভাব দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত সন্ন্যাসীর হৃদয় গলিয়া গেল—তিনি পুনরায় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভয় কি মা, বল না—পূজার জন্য কি জল এনেছ?"

অপরাজিতা। না তা নয় আমি—

সন্ন্যাসী। কি বলনা, ভয় কি ?

"আজ ভূতচতুর্দ্দশী, একবার দেবী-দর্শন"। অপরাজিতা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

সন্ন্যাসী। একবার দেবীমূর্ত্তি দেখিতে চাও কি ?

অপরাজিতা করযোড়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তাই বল না মা! এর জন্য আর ভাবনা কি; এস, আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।"

সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া ডাকিলেন,—"এস মা!"

অপরাজিতা মন্দির দ্বারে যাইতে সাহস করিল না—দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল—মূর্ত্তি দেখিয়া ডাগর ডাগর চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুনীরে ভরিয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "অত সঙ্কোচ কেন মা! মায়ের দর্শনে মেয়ের আবার সঙ্কোচ কিসের? এস, দ্বারের নিকট এস।"

অপরাজিতা ভয়ে ভয়ে বলিল,—"অতদূরে যাইয়া, মন্দিরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া দেবী-দর্শনে আমার অধিকার আছে কি ?"

সন্ন্যাসী। কেন নাই মা! দেবীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই যাহার হৃদয় এত প্রেমবিহ্বল হয়, নয়নকোণে এমন প্রবলবেগে অশ্রু দেখা দেয়—দেবী-দর্শনে, দেবীর পাদপদ্ম স্পর্শনে তাহার সকল অধিকার আছে।

অপরাজিতা। ঠাকুর আমি যে—

সন্ন্যাসী। তুমি কি মা ?

অপরাজিতা। আমি যে পতিতা।

সন্ন্যাসী। যে পতিতা, সেই ত ভক্ত-প্রধানা; যে বেশী পতিত—সেই ত মায়ের বেশী অনুগত; তুমি ভয় ক'রো না—কাছে এস।

অপরাজিতা পতিতা, সকলে তাহাকে বেশ্যা বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে; আজ সে ভক্ত, মায়ের অনুরক্ত—তাহার এমন কপাল। অপরাজিতার হৃদয় পুলকপূর্ণ, মন ভক্তিপূর্ণ—সর্ব্বাঙ্গ কি যেন একটা বৈদ্যুতিক তেজে

তেজোময়। অপরাজিতা আর কোন সন্দেহ—কোন [illegible] মনোমধ্যে স্থান দিল না। ঠাকুরের অনুমতি শিরোধার্য্য করিয়া, সে মন্দিরের সিংহ-দ্বারে গিয়া সেই ত্রিলোকারাধ্যা মাতৃ-মূর্ত্তির পদে প্রণাম করিল—সে বুঝিতে পারিল না, আজ সে স্বর্গে—কি মর্ত্তে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

সৌভাগ্য।

একটা বারবনিতার প্রতি সন্ন্যাসীর এরূপ উদারতা দেখিয়া পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী একটু বিচলিত হইলেন কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। অপরাজিতা নির্ণিমেষ নয়নে মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিল, তারপর কলসীর জলে মন্দির-প্রাঙ্গন ধৌত করিয়া দিয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত বদনে সেদিনকার মত বাটী প্রস্থান করিল। অপরাজিতা চলিয়া যাইবার পর সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারাদাস! তুমি হয়ত মনে মনে একটু বিচলিত হইয়াছ—নয়?"

তারাদাস। হাঁ গুরুদেব! শুনেছি, ও মাগী বেশ্যা; উহাকে এরূপভাবে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? ইহা ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তাহা আপনিই জানেন?

বিমলা ও পরিচারিকা বিস্ময় সহকারে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গুরুশিষ্যের তর্ক-বিতর্ক দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ বলিলেন,—"বাবা! তাহাতে দোষ কি?"

তারাদাস। বেশ্যা পতিত জাতি, তাহাদের পক্ষে দেবতার মন্দিরে আগমন বা দেবতাকে স্পর্শ করণ—একেবারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ, আমিত বড় বড় পণ্ডিতের মুখে—ইহা শুনিয়াছি।

সন্ন্যাসী। বাবা! পীঠস্থানে বা কোনও প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে সে নিয়ম নাই, বেশ্যা পতিত বলিয়া সে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে না, ঠাকুর দেখিবে না—এ কেমন কথা?

তারাদাস। স্ত্রীলোকে দেবতা স্পর্শ করিলে তবে, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত পঞ্চগব্য দিয়া স্নান করাইবার নিয়ম আছে কেন?

সন্ন্যাসী। ও সকল নিজের মন প্রত্যয়ের জন্য, নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া খাঁটী হইবার জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা, নতুবা ঠাকুরের জন্য নহে, ঠাকুর কখনও অপবিত্র হন না।

তারাদাস। ও মাগীর ফুল-জল তবে এবার হইতে মন্দিরে মায়ের পূজার জন্য গ্রহণ করা হইবে?

সন্ন্যাসী। তোমরা যাহা মনে করিতেছ—ঐ স্ত্রীলোকটী তাহা নহে, ও নষ্টচরিত্রা বেশ্যা হইলে উহার প্রাণ ঐরূপ হইত না, হৃদয়ে দেবতাকে ফুল-জল দিবার এত সাহসও হইত না; নিজের চরিত্র ত নিজে অবগত আছে, তাহা হইলে নিজেই ভয় পাইত। আমি প্রাতঃকাল হইতে তাহার একাগ্রতা, তাহার প্রাণের ঐকান্তিকতা দেখিয়া কুলটা বা চরিত্রহীনা বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয়, প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পাপপথে ধাবিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। নতুবা এত সাহস কি বেশ্যার হইতে পারে?

তারাদাস আর কোন কথা কহিলেন না, সন্ন্যাসীর আদেশে পূজায় বসিলেন। বিমলা মায়ের ভোগ রন্ধনের জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। পূর্ণানন্দ মন্দির দ্বারে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন।

তারাদাসের আজ পূজায় মন বসিতেছে না, অনবরত চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিতেছে। কে ঐ রমণী, ঠিক যেন পাপিষ্ঠা ডেপুটীকন্যা

অপরাজিতার মত. আবার মনে করিতেছেন—সে এখানে কেমন করিয়া আসিবে, আর তাহার ঐরূপ ধর্ম্মভাবই বা কেমন করিয়া হইবে? যে চিরকাল বিদেশীয় হাব-ভাবে পরিপুষ্টা, বিদেশীয় চাল-চলনে অভ্যস্থা, সে কি এমন হীনভাবে একেবারে বৈরাগ্যের আশ্রয় লইতে পারে? হবে অন্য কোন রমণী, তাহার মত কতকটা সাদৃশ্য উহাতে আছে কিন্তু সে হইতে পারে না; এত সহজে, এত অল্প দিনের মধ্যে সে দম্ভ, সে তেজ, সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া সাধনলব্ধ বিষয়-বৈরাগ্য আসিতে পারে না—তাহার ন্যায় পাপিনীর কি এত সৌভাগ্যোদয় হইতে পারে? আবার বলিতেছেন—মায়ের ইচ্ছায় কি না হয়, বাস্তবিক কিন্তু বেশ্যার মত কটাক্ষ, পতিতা রমণীর মত অপাঙ্গদৃষ্টি তাহার চক্ষে নাই, কেমন যেন একটা কমণীয় ভাব মুখে-চক্ষে ব্যাপিয়া রহিয়াছে—বারবনিতার বদনে কি অমন সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে—গুরুদেব ঠিক অনুমান করিয়াছেন, তবে আমার অনুমান ঠিক নহে, ও রমণী অপরাজিতা কখনই হইতে পারেনা। দূর হউক ছাই-- আমার এ সকল বৃথা চিন্তায় আজ মন এত বিচলিত হইতেছে কেন? মা মনোময়ী! আমার ভ্রান্ত মনকে তোমার পদতলে স্থান দাও। তারাদাস আচমন করিয়া পুনরায় ধ্যানে বসিলেন। মনকে সংযত করিয়া ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে শিব-শিবানীর পদে আবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইলেন। তারাদাস কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। যখন ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন বিমলা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেবীর সেবার জন্য আনয়ন করিয়াছেন। সাধক বিশ্বেশ্বরীকে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। কাঁসর-শঙ্খ-ঘণ্টা ঘটারোলে বাজিয়া উঠিল।

যখন পূজাদি শেষ হইল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিমলা স্বামী-দেবতা ও গুরুদেবের ভোজনের

আয়োজন করিয়া দিলেন। মায়ের সেই অমৃতোপম প্রসাদ দুই ভক্তে প্রাণ ভরিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। পরে বিমলা পরিচারিকার সহিত আহার করিয়া, সে দিনকার মত রন্ধনশালার কায সমাপন করিলেন। আহারাদির পর সন্ন্যাসীর সহিত তারাদাস প্রাতঃকালের সে রমণীটীর কথা কহিতে লাগিলেন। তারাদাস বলিলেন, "ও মাগী অনেকদিন এখানে যাওয়া-আসা করিতেছে, উহার প্রাণের ইচ্ছা—যে ফুল-জল আনিয়া দিবে, তাহাতে যেন মায়ের পূজা হয়। কিন্তু বেশ্যা বলিয়া আমরা কেহই উহা গ্রহণ করি নাই।"

সন্ন্যাসী। বাবা! পাপের আকর সাধারণ বেশ্যার কি এত সাহস হইতে পারে? ও কিছুতেই বেশ্যা নহে, বেশ্যার ভাব উহাতে আদৌ নাই, বোধ হয় লোকে একটা ভদ্র-বংশের স্ত্রীলোককে মজাইবার জন্য এইরূপ কলঙ্ক রটাইয়াছে।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পরিচারিকা বলিল, "আমি সেদিন বাঙ্গালী-টোলায় গিয়াছিলাম, একটা মুসলমান উহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত আস্ফালন করিতেছিল—কত লোককে উহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে-ছিল কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিয়া দিল না।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ মা! সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি, দুষ্ট লোকে যে ঐ স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।" এইবার সকলেরই সেই বিশ্বাস হইল, অতঃপর রমণীকে মন্দিরে আসিলে আর কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না—ইহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

তারাদাস রমণীকে কখন কোনও প্রকার কটু কথা বলেন নাই, তবে তাহার ফুল-জল না লইয়া তাহাকে মন্দির পার্শ্বে একটী গাছের তলায় উহা ঢালিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, রমণী ভক্তিভরে তাহাই এতদিন করিতেছিল। সন্ন্যাসী সে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া

বুঝিলেন যে রমণী যেখানে প্রত্যহ জল ঢালিত, তথা হইতে একটী সুড়ঙ্গ হইয়া উহা মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে প্রকারান্তরে মায়ের মন্দিরে জল প্রদান করাই হইতেছে। বিমলা আসিয়া সাক্ষ্য দিলেন, "আমি প্রত্যহ তাহাকে ফুল-জল ঢালিবার সময় আকুল নয়নে কাঁদিতে দেখিয়াছি, সেরূপ কান্নার জল পাপিষ্ঠা বারবনিতার নয়ন হইতে কখনও বাহির হইতে পারে না, হৃদয় ভক্তি-ভাবে পরিপূর্ণ না হইলে চক্ষু দিয়া ঐরূপ অশ্রু পতিত হওয়া সহজ নহে।"

রমণী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা লইয়া সমস্ত বৈকাল বেলা কাটিয়া গেল। রমণী যে নষ্ট-চরিত্রা নহে—তাহা সকলের মনেই স্থান পাইল। ধার্য্য হইল, এবার মন্দিরে আসিলে সে সমাদৃতা হইবে—দেবীর প্রসাদ পাইবে—ইচ্ছা করিলে এখানে থাকিয়া সৎ উপদেশ শ্রবণ করিবার অধিকারও তাহাকে দেওয়া হইবে।

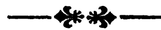
আজ সন্ধ্যার সময় মায়ের আরতি সাধক পূর্ণানন্দ স্বয়ং সমাহিত করিবেন। তজ্জন্য মায়ের শীতলের ব্যবস্থাও ভালরূপ হইতে লাগিল। কয়েকজন ভদ্রলোক আজ মন্দিরে আরত্রিক দেখিতে আসিবেন; নিকট-বর্ত্তী স্ত্রীলোকত অনেকেই প্রত্যহ চামুণ্ডা-মন্দিরে মায়ের আরতি দেখিতে আসিয়া থাকে; অনেকক্ষণ বসিয়া জপ-তপ করে, তারপর গৃহে গমন করে। দিন দিন চামুণ্ডার মন্দিরের নাম কাশীর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—লোক সমাগমও যথেষ্ট হইতে লাগিল। এইবার পূর্ণানন্দ শ্যামাচরণ প্রদত্ত অর্থে মায়ের মন্দির সংলগ্ন অপরাপর গৃহগুলি সংস্কার এবং পূজাদির পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চিরতরে কাশী ত্যাগ করিবেন। পার্থিব যাবতীয় কার্য্য তাঁহার শেষ হইয়াছে, কেবলমাত্র তারাদাস ও বিমলার এই মন্দিরে থাকিবার একটা চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত করিয়া, তিনি মণিপুরে গুরুদেবের সহিত মিলিত হইয়া হিমাচলে মহা প্রস্থান করিবেন, এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে নবাগতা

রমণীর প্রতি তাঁহার মন যেন আরও একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কি জানি কেন—তাহার উদ্ধার-সাধনও যেন পূর্ণানন্দের একান্ত কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মায়ের শীতল ও পরে আরতি আরম্ভ হইল, পূর্ণানন্দ আজ মায়ের আরতি করিতেছেন ; আর মনে মনে সেই নবাগতা রমণীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। রমণী তাঁহার কেহ নহেন, তথাপি সাধক প্রকৃতি এমনি উদার—পরোপকারে এমনি সিদ্ধহস্ত যে তাহার কষ্টময় ও ভবিষ্যৎ জীবনের একটা প্রতিকার না করিলে বুঝি তাঁহার চিত্ত স্থির হইবে না। জগতের উপকারার্থ যাঁহাদের জন্ম, ভগবৎ প্রেরিত হইয়া পাপীর পরিত্রাণের জন্য যাঁহারা মর্ত্তধামে পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহাদের সুদৃষ্টি যাহার প্রতি একবার নিবদ্ধ হয় —তাহার পরকাল নিস্তারের আর কোন ভাবনাই থাকে না।

আরত্রিক ক্রিয়া শেষ হইলে, ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পূর্ণানন্দ মায়ের প্রসাদ পাইলেন, তারপর সকলে একে একে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলে, মা চামুণ্ডা প্রিয় পুত্রগণকে আপনার ক্রোড় মধ্যে লইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।



দুর্গতি-নাশ।

অপরাজিতা মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বপাকে চারিটী আহার করিল। পাচিকা ব্রাহ্মণী আজ কয়েকদিন হইল—স্বদেশে গিয়াছে, এখনও আসে নাই। এখন অপরাজিতার যে অবস্থা, তাহাতে না আসিলেও আর কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; সে এখন নিজেই প্রাণ ধারণের মত চারিটী

অন্ন ফুটাইয়া লইতে পারিবে—দিন দিন অপরাজিতা যে ঠিক হিন্দুরমণীর মত কষ্ট-সহিষ্ণু হইতেছে; সে এখন ভাল মন্দ বুঝিতে পারিয়াছে—জীবন এখন যেভাবে গড়িয়া উঠিতেছে—তাহাতে আর পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও চলে না; নর-নারী ঈশ্বর বিশ্বাসী হইলে সত্য সত্যই আত্মনির্ভর-শীল হইয়া পড়ে—কখন কেহ কিছু দিবে কি না তাহার জন্য আশা করিয়া বসিয়া থাকে না; দৈবানুগ্রহে তাহাদের একটা স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইয়া পড়ে।

আহারাদির পর সন্ধ্যা হইলে, অপরাজিতা সন্ন্যাসীর মায়া-মমতার আচার ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। যতই তাঁহার দয়ার কথা অপরাজিতা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আজ এক বৎসর হইল—এরূপ আদর যত্ন ত তাহাকে কেহ করে নাই, সকলেই ত তাহাকে ঘৃণার চক্ষে, উপেক্ষার ভাবে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, কাছে বসিলে অবজ্ঞায় পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতে বুঝি তাহাকে দয়া করিবার আর কেহ ছিল না; এতদিন অপরাজিতা হতাশ হৃদয়ে স্রোতের সেহলার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; আজ পূর্ণানন্দ তাহাকে কুল দিয়াছেন। পিতার গৃহত্যাগ করিবার পর একবৎসর হইল মা বুলি অপরাজিতা কাহারও নিকট শ্রবণ করে নাই, "দূর ছি" তাহরা অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল, আজ যোগীবরের নিকট "মা বুলি" শুনিয়া, তাঁহার অমৃতময় উপদেশবাণী কর্ণ দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া প্রাণ আশান্বিত, মন শান্তিবারি সিঞ্চিত হইয়াছে। অপরাজিতা গভীর আনন্দভরে একখানি "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্র লইয়া চামুণ্ডার স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এই সময় যদি একবার তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারিতাম, প্রাণনাথের পদে যদি একবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিতাম—তাহা হইলে হৃদয়ভার অনেকটা লাঘব হইত। হৃদয়

দেবতা, এখন তুমি কোথায় নাথ! আমি আর তোমার সঙ্গ করিতে সাহস করি না, তোমার পবিত্র পদপূজার অধিকার আমাকে নাই দাও, তাহাতে ক্ষতি নাই—একবার প্রাণ খুলিয়া বল দেব! "অপরাজিতা! অভাগিনী! আমি তোর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম"। তাহা হইলে আমার ইহজীবনের সমস্ত কষ্ট, প্রাণের সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইবে,—আমি তোমার সেই নয়নানন্দ—অভিনব পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে, আলিঙ্গন করিতে পারিব! কোথায় তুমি অভাগিনীর আরাধ্য দেবতা! তোমাকে যে আমি কত অগ্রাহ্য করিয়াছি, তথাপি তুমি একটীবারও আমার প্রতি কুপিত বা বিরক্ত হও নাই; সে দেব-চরিত্রে কি বিরক্তি ছিল না প্রভু! তুমি একটু চক্ষু রক্তিম করিলে, একটু রোষের ভাব দেখাইলে বোধ হয়, আমার স্বভাব এত প্রশ্রয় পাইয়া—দিন দিন এরূপ পাপপঙ্কিল হইত না।' চামুণ্ডা মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরের ভাবভঙ্গি কতকটা তাঁহারই মত—তবে তাঁহার চক্ষু দুইটীর ঐরূপ বক্রভাব ছিল না, তিনি ত অত কাল ছিলেন না। দূর হউক ছাই, এখনও আবার সেই কথা—সেই পর-পুরুষ চিন্তা, পাপের এত তীব্র তাড়নায় মন! তথাপি তোমার লজ্জা হয় না! অপরাজিতা আর কোন চিন্তা না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর—চারিদিক নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই—অপরাজিতা উদাস প্রাণে মাতৃপদে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তন্ময়ভাবে কখন গান করিতেছেন, কখন "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছেন। এমন সময় গৃহপ্রাঙ্গনে কাহার পদশব্দ শুনা গেল—নির্জ্জন স্থানে মনুষ্য পদশব্দ কাহার? অপরাজিতা চমকিত হইয়া যেমন আলোক হস্তে বাহিরে আসিবেন—অমনি সম্মুখে সেই পিশাচ মূর্ত্তি, যবনাধম রমজানের সেই কলুষিত মূর্ত্তি দেখিয়া

ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন। মদ্যপানে ঢুলু ঢুলু আঁখি রমজান—জড়িত স্বরে বলিল,—"কি বিবিজান্! বাবা! এত অন্ধকারের ভিতরেও কি মানুষ থাকে? অপরাজিতা! সেদিনকার কথা মনে আছে, আমি বলিয়াছিলাম, একদিন না একদিন ইহার প্রতিশোধ লইব, এইবার তোমাকে কে রাখে?" বিপদে একেবারে বিচলিত হওয়া ভাল নয়—বিদূষী মহিলা অপরাজিতা সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"রমজান! বয়স ত অনেক হইল, চিরজীবনটা কি একভাবেই কাটাইবে—ধর্ম্মের প্রতি, উপরে খোদার প্রতি কি একবারও চাহিয়া দেখিবে না। রজনী অধিক হইয়াছে এবং একাকিনী আমাকে গৃহ মধ্যে পাইয়া আমার সর্ব্বনাশের আশা করা কি বীরত্বের পরিচায়ক? ভীরু কাপুরুষ! পাশববৃত্তি চরিতার্থের স্থান ত জগতে যথেষ্ট আছে, অপরাজিতা কুলকলঙ্কিনী নয়, এখনি এস্থান ত্যাগ কর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত পায়ে ধরিয়া বলিতেছি—রমজান! ছোট ভগিনী বলিয়া ক্ষমা কর!"

মদে যাহার চিত্তবিকৃতি হইয়াছে—তাহার হিতাহিত জ্ঞান কোথায়? পাপিষ্ঠ অপরাজিতার অনুনয় বিনয় না শুনিয়া বিপুল বিক্রমে তাহার উপর পতিত হইল—অপরাজিতা চীৎকার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিবে বলিয়া ছুটিল কিন্তু দুরাত্মার হস্ত অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন আর্ত্তস্বরে—"ভগবান রক্ষা কর, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে রমজানের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া কবলচ্যুত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন অপরাজিতা দুর্বৃত্ত নরপশুর হস্তে আর নিষ্কৃতির উপায় দেখিল না—তখন ধূলায় পড়িয়া আর্ত্তস্বরে প্রাণের কপাট খুলিয়া, ঠিক কুরুসভাস্থলে বিবস্ত্রা দ্রৌপদীর, মত ডাকিল,—"দীননাথ! আর আমার কেহ নাই—বুঝি এতদিনের অমূল্যধন সতীত্বরত্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়।" যখন সমস্ত নির্ভরতা ভগবানের উপর ন্যস্ত, জীব যখন অনন্যশরণ, তখন কি দীনের বন্ধু দীননাথ আর

থাকিতে পারেন? বাহির হইতে জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—"ভয় নাই! ভয় নাই! কাহার ক্ষমতা, কাশীতে নারীনিগ্রহ করে, সতীর সতীত্ব নষ্ট করে—পাষণ্ড রমজান—এই তোর শেষ দিন!" বলিয়া একজন ভীষণ আকৃতি, বলিষ্ঠ যুবক বেগে গৃহপ্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে পাপীষ্ঠের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভীষণ লগুড়াঘাত করিল, রমজানের মস্তকে না পড়িয়া উহা তাহার স্কন্ধ আহত করিল, সে তখন উদ্ধত-ফণা ফণীর মত অপরাজিতাকে ছাড়িয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিল। রমজান খুব বলিষ্ঠ এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হইলেও, সেদিন সে আততায়ীর সহিত সমকক্ষ হইতে পারিল না—মত্ততা তাহাকে হার মানাইয়া দিল। পাষণ্ড গুরুতর রূপে প্রহার খাইয়া, তথা হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। আগন্তুক পুনরায় তাহাকে ধরিয়া বলিল,—"শুধু প্রাণ লইয়া পলাইলে হইবে না, রমণীকে মাতৃসম্বোধন কর্ এবং প্রতিজ্ঞা কর্, আর কখনও এরূপ কার্য্য করিবি না—তবে পরিত্রাণ, নতুবা আরও ভীষণ ভাবে প্রহার দিয়া পুলিশের হস্তগত করিব।" ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া পাষণ্ড রমজান ক্ষমা ভিক্ষা এবং অপরাজিতাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া সে যাত্রা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

অপরাজিতার চৈতন্যলোপ পাইয়াছিল—যুবক পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিলেন এবং অপরাজিতার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন,—"দিদিমণি! এখন কেমন আছ?"

ব্যাঘ্র কবল হইতে অপরাজিতা যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবে, তাহার কোন আশা ছিল না, তাই ভয়ে লজ্জায় অচৈতন্য হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আগন্তুকের শুশ্রূষায় চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিল,—চক্ষের সম্মুখে এ কে! আলোক বেশ উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছিল—ভাল করিয়া দেখিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিল,—"কে, কে! ভাই চারুচন্দ্র! নতুবা এমন মধুর আহ্বান আর কে করিবে। চারু, ভগবান অভাগিনীর সতীত্ব রক্ষার

জন্য তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এমন না হইলে কি দীনের ঠাকুর! কেমন করিয়া আসিলে—এতদিন কোথায় ছিলে ভাই! আমি যে তোমাদিগকে অশেষপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছি, দেবতা তুমি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার দেবী-স্বরূপিনী জননী কোথায়?"

চারুচন্দ্র। দিদিমণি, পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া আর নিজেকে শোক-সন্তপ্ত করিও না—সমস্ত ভগবানের ইচ্ছা! আমার শ্বশুর মহাশয় কাশীতে পীড়িত হওয়ায় আমরা সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিতে এখানে আসিয়াছিলাম—আজ কয়েক দিবস হইল—তিনি কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্ত্রীর শোকাপনোদনের জন্য কল্য সন্ধ্যাকালে মা চামুণ্ডার মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম—তথায় একটী স্ত্রীলোকের বিষয় আলোচনা শুনিয়া তোমার কথা আমার মনে হয়। সন্ন্যাসী যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিলেন—তাহাতে তোমার যে ধর্ম্মবিষয়ে এতদূর উন্নতি হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া সমস্ত দিন তোমার সন্ধান করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী স্ত্রীলোকের নিকট তোমার বাসস্থানের কথা জানিতে পারিয়া, আহারাদির পর এখানে আসিয়াছি। পাপিষ্ঠ রমজান যে এখনও তোমার পশ্চাৎ লাগিয়া আছে, তাহা জানিতাম না, যাহা হউক ভগবান তাহাকে আজ উচিত মত শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আমাদের বাসায় চল—এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে আর থাকিয়া কায নাই, মা দেশেই আছেন—আমি সস্ত্রীক একটী শ্যালক ও দুইটী চাকর লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি।

চারুচন্দ্রের সেই ধর্ম্মোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া অপরাজিতা বলিলেন,—"ভাই চারু! তখন তোমাকে এক চক্ষে দেখিয়াছিলাম—আর এখন আর এক চক্ষে দেখিতেছি, তুমি ঠিক আমার সহোদর প্রতিম, দেবহৃদয় তুমি—তোমার মত সংযমীর হস্তে না পড়িলে, এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত বলিতে পারি না। ভগবান্ তোমার ধর্ম্মপ্রাণতারপুরস্কার প্রদান করুন!"

চারুচন্দ্র। দিদি! তাঁহার দয়ার সীমা নাই, তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের অভাব দূর হইয়াছে; ভগবান মূল হইলেও তোমাদের দয়া এজীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—এ উন্নতির মূল তুমি এবং কর্ত্তামহাশয় (শ্যামাচরণ)! তিনি এখন কোথায় দিদি!

অপরাজিতা। ভাই! তিনি বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট। এই অভাগিনীই তাঁহার শেষ জীবনে অশান্তি আনিবার মূলকারণ—আমাকে বিপথ-গামিনী বুঝিয়া তিনি কোথায় গিয়াছেন—জানিনা, জীবিত কি মৃত তাহারও স্থিরতা নাই। জীবন ত যন্ত্রণাময় হইয়াছে, প্রাণে আর কিছু মাত্র মমতা নাই—তবে শেষ দশায় একবার আরাধ্য-ধনের সন্ধান পাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিলে প্রাণটা যেন—কতকটা ভারহীন হইত—তাঁহার সন্ধান কি কিছু জান চারুচন্দ্র?

চারুচন্দ্র অবাক হইয়া—বলিলেন,—"দিদি! তারাদাস দাদার সন্ধান কি তুমি এতদিন পাও নাই?—তিনি ত তোমার কাছে কাছেই রহিয়াছেন?"

হারাণমাণিক হাতে পাইলে লোকে যেমন আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে—অপরাজিতা বিষম আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আমি কিছু জানি না—বল বল ভাই! আমার হৃদয়-দেবতা কোথায়! কোন্ গুপ্ত স্থানে অবস্থান ক'র্‌ছেন?"

চারুচন্দ্র। গুপ্ত কেন দিদি! তিনি ত ব্যক্তই আছেন—চামুণ্ডা মন্দিরের পুরোহিতই ত দাদা তারাদাস—আর দেবী স্বরূপিণী বিমলাই যে তাঁহার প্রথম পক্ষের সহধর্ম্মিণী, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন!

"হৃদয় শান্ত হও, স্থির হও, সম্মুখে আরাধ্য-বস্তু পাইয়া অত উতলা হইলে সব নষ্ট হইবে—একবার পদে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলেই এ জীবনের সমস্ত সাধ পরিসমাপ্ত হয়—অত অস্থিরতা প্রকাশ করিও না।" হৃদয়বেগ সাম্য করিয়া অপরাজিতা বলিলেন,—"তাঁহার দৈহিক অনেক

বিকৃতি দেখিয়া আমি চিনিতে পারি নাই, তবে দর্শন মাত্রেই প্রাণে একটা ধাক্কা লাগিয়াছে—এইরূপ হইবার কারণ কি?"

চারুচন্দ্র। শুনিলাম, তোমাদের বাটী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া উঁহার মতিভ্রম হয়, তাঁহার জীবনের আশা ছিল না, ঐ সন্ন্যাসীই নাকি উঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অপরাজিতা আর কোন কথা কহিলেন না, গৃহমধ্যে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেন। চারুচন্দ্র বলিল,—"দিদি! আমাদের বাটী যাবে কি?"

অপরাজিতা। যাব বইকি? নববধূকে একবার দেখিব, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব—দেবতার সহধর্ম্মিণী দেবীর সহিত আলাপ করিব না? তবে আজ আর নয়, রজনী প্রায় প্রভাত হইল, কাল প্রাতঃকালে আসিও, আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া, যে কয়দিন এখানে থাক, তোমার বাসায় থাকিব।

চারুচন্দ্র পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, অপরাজিতা মনে করিল এই যৌবন-শ্রীই আমার যত কাল, ইহাকে আর রাখা হইবে না—তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনিও চিনিতে না পারেন—এ পাপিনীর মুখ আর সে দেব-দেবীর নিকট দেখাইব না—দেহ বিকৃত করা একান্ত আবশ্যক।

অপরাজিতা কাঁচি আনিয়া আলুলায়িত সুন্দর কেশদাম কাটিয়া ফেলিল—উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া নধর গণ্ডদেশের চারিধারে বিকৃত চিহ্ন করিয়া দিল। স্বামীর নিকট এবং সকলের নিকট অপরাজিতা এখন নূতন রূপে দেখা দিতে পারিবে—এই রূপই ত যত কাল, এই শরীর কান্তিই ত যত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবন পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছে। অপরাজিতা আজ সে অহঙ্কারের মাথায় পদাঘাত করিল। যখন উষার আলোক ধরা বক্ষ আলোকিত করিতে লাগিল—অপরাজিতা তখন অন্যান্য দিন অপেক্ষা নির্ভয়ে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—:*:—

দেহত্যাগ।

অপরাজিতা আজ প্রাতঃকালেই একবার গঙ্গাস্নান করিল—বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চারুর বাসায় গেল—তাহাকে শয্যা হইতে তুলিয়া বলিল,—"কই চারু! তোমার বউ দেখি?"

চারু শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া রন্ধনশালায় তাহার সহধর্ম্মিণীর কাছে লইয়া গেল। স্বামীর সহিত একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া চঞ্চলা বধূ লজ্জায় একহাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বউটী দেখিতে বেশ সুন্দরী, খর্ব্বাকৃতি যেন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত। অপরাজিতা তাড়াতাড়ি ঘোমটা খুলিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিল, তারপর কাপড়ের মধ্যে করিয়া তাহার নিজের একজোড়া সোণার বাউটী আনিয়াছিল—বধূর হাতে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল,—"ভাই! জন্ম জন্ম এরূপ গহনা প'রে দাদার সংসার উজ্জ্বল কর!" বধূ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

চারু বলিল,—"ইহাঁদেরই অন্নে আমরা জীবন ধারণ করিয়া এতবড় হইয়াছি, ইহাঁকে প্রণাম কর, পায়ের ধূলা লও।" বধূ তাহাই করিল—গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

অপরাজিতা আর অপেক্ষা করিল না! চারুচন্দ্র বলিল,—"দিদিমণি! কোথায় যাইতেছ, এই বলিলে আমাদের বাসায় থাকিবে—আর বাটী ভাড়া দিবে না, আবার যাইতেছ কেন?"

অপরাজিতা বলিল,—"আজ কয়েক দিন হইল, নিত্যকর্ম্ম কিছুই করা হয় নাই। চামুণ্ডামন্দিরে ফুলজল দেওয়া বন্ধ রহিয়াছে, পথে যাইতে ভয় হইত, রাত্রে তুমি চলিয়া আসিবার পর, এই দেখ সে ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি।" চারু দেখিল—অপরাজিতার রূপে লোকের

নজর পড়িত বলিয়া আজ সে কেশ কাটিয়াছে, সুন্দর গণ্ডদেশ লৌহ সলাকার দাগে পূর্ণ করিয়াছে। চারু বুঝিল—অনুতাপের মাত্রা যখন অপরাজিতার এত অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন উহার উদ্ধারের পথ সুপ্রশস্ত, ভগবান উহাকে নিশ্চয়ই দয়া করিবেন।

চারু বলিল,—"দিদি! তুমি যাও, আমরা সন্ধ্যার পর যাইব।"

অপরাজিতা আর দাঁড়াইল না—তাড়াতাড়ি স্নানঘাটে গেল। পুনরায় অবগাহন করিয়া স্নান করিল। কলসীপূর্ণ করিয়া জল লইয়া গজেন্দ্র-গমনে মায়ের মন্দির উদ্দেশে চলিল। আজ একটু বেলা বেশী হইয়াছে, কিন্তু কেহ পাছে দেখে—কোন নিন্দা করে, আজ সে সন্দেহ আর তাহার নাই। বাস্তবিক আজ আর কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, সে কুরূপা কালিন্দীকে দেখিয়া কে দৃষ্টিশক্তির অপচয় করিবে? অপরাজিতা স্বাধীনভাবে পথ চলিয়া কিয়ৎক্ষণের পর চামুণ্ডা মন্দিরে উপস্থিত হইল। তখন মায়ের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আজ আর কেহ তাহাকে ঘৃণা করিল না। বিমলা শশব্যস্তে বলিলেন,—"ফুল-জল আনিয়াছ দিদি! এইখানে রাখ।" অপরাজিতা দাওয়ার একধারে তাহা রাখিয়া নীচে বসিতে যাইতেছিল, পরিচারিকা বলিল,—"আহা! নীচে কেন উপরে ব'সো।" অপরাজিতা উপরেই বসিল; মন্দিরের সকলে অপরাজিতাকে কালিন্দী নামে জানিত, এখানে সে নামই প্রকাশ করিয়াছিল। আজ তাহার জ্যোতিঃ যেন কালিমা-ময়—কেশরাশি কাটিয়া ফেলিয়া যেন শ্রীহীন দেখাইয়াছে। কালিন্দী একধারে বসিয়া মায়ের পূজা দেখিতে লাগিল, পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন—সন্ন্যাসী চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সে অবহিত-চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে করিতে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। বিদুষী রমণী চণ্ডীর পুঁথি অনেকবার পড়িয়াছে কিন্তু শ্রবণ-সুখকর এরূপ সুস্বরে ত সে একদিনও পড়িতে পারে নাই। চণ্ডীর পুঁথি—মাতৃ-

মাহাত্ম্যে পূর্ণ, প্রেম ভক্তিময় হৃদয় লইয়া না পড়িলে এমন মধুর হইবে কেন? অপরাজিতা তখন পড়িয়াছিল—বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য; শুধু বিদ্যা দেখাইবার জন্য ত ইহার পাঠ নহে—হিন্দুর প্রাণের জিনিষ ইহা, প্রাণ দিয়া প্রাণময়ী মাকে প্রাণের মধ্যে আবরিয়া ইহার পাঠ অভ্যাস করিতে পারিলে—এক চণ্ডীপাঠেই জীবের মোক্ষলাভঅনিবার্য্য।

বিমলা রন্ধনশালায় ভগবতীর ভোগ রাঁধিতেছেন—আর এক একবার বাহিরে আসিয়া কালিন্দীর ভক্তি-উচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে মনে বলিতেছেন,—"আহা! আমরা এতদিন ইহাকে কুলটা বিশ্বাস করিয়া কি পাপ কার্য্যই করিয়াছি, যাহার হৃদয় এত ভক্তিভাবপূর্ণ, সে কি কুলটা হইতে পারে? মা! আমাদের—মিথ্যা অনুমানে কোনও অপরাধ লইও না"—বলিয়া উদ্দেশে করযোড়ে চামুণ্ডাকে প্রণাম করিতেছেন। পরিচারিকা আজ কালিন্দীর ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেও মনে মনে বলিতেছে,—"এ পূণ্যবতী রমণীকে কুলটা বলিয়া কি ঝকমারীই করিয়াছি কিন্তু সেত আমার দোষ নয়—শুনা কথা বলিয়াছি—তাহাতে যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, মা চামুণ্ডে আমায় ক্ষমা কর!"

ক্রমে পূজা হইয়া গেল, ভোগ প্রদান করিয়া পুরোহিত মহাশয় মায়ের আরতি করিতে আরম্ভ করিলেন—কালিন্দী দাঁড়াইয়া করতালি দিতে লাগিল—আজ যেন সে ভাবোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে—করতালি দিতেছে, "চামুণ্ডে—চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। যখন আরতি শেষ হইয়া গেল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; সন্ন্যাসী আজ কালিন্দীকে মন্দিরে দেখিয়া অত্যধিক স্নেহে বলিলেন,—"মা! এ কয় দিন আস নাই কেন, শরীর কি অসুস্থ ছিল?"

কালিন্দী। পূর্ব্বে অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু যে দিন আপনি অভাগিনীকে কন্যাস্থানীয়া করিয়া দয়া করিয়াছেন—সেইদিন হইতে আমার সকল অসুস্থতা একেবারে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। তবে মা! কেশচ্ছেদ ও গণ্ডে ওরূপ দাগ দিয়াছ কেন?

কালিন্দী। বাবা! বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে আর দরকার নাই, আশীর্ব্বাদ করুন—অন্তর আমার সৌন্দর্য্যময় হউক, শীঘ্র শীঘ্র যেন এ জীবনলীলা শেষ করিতে পারি।

সন্ন্যাসী। কেন মা! জীবনের প্রতি এত মায়াহীন হইতেছ?

"আজীবন যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে নাই—তাহার জীবন, এ যাত্রা যত শীঘ্র হয়, পরিবর্ত্তন করাই ভাল। আমি যে স্ত্রী জন্মিত কিন্তু আমার স্ত্রীত্ব কই প্রভু! রমণীর একমাত্র আরাধ্য-দেবতা স্বামীর সেবাই যদি জীবনে না করিলাম ত, স্ত্রী জন্মের এ দেহ রাখিয়া ফল কি?' কালিন্দীর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা তপ্তঅশ্রু পতিত হইল, তারাদাস তাহা দেখিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, কালিন্দী তৎক্ষণাৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল,—"বাবা! আপনাদের সেবার আর বিলম্ব কেন, বেলা অনেক হইয়াছে।"

"হাঁ মা, এই যে" বলিয়া—সন্ন্যাসী ও পুরোহিত আহারে বসিলেন. বিমলা বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের আহারীয় পরিবেশন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের আহার অপর কাহাকেও দেখিতে নাই, কালিন্দী সরিয়া গিয়া মন্দিরদ্বারে বসিয়া নির্ণিমেষ নয়নে মায়ের রূপ দেখিতে লাগিল—আর নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। কালিন্দীর নয়নের জল আজ আর নয়নে থাকিতেছে না—দুকুল প্লাবিয়া যেন উছলিয়া উঠিতেছে। কালিন্দী মনে করিতেছে—এইবার শেষদিনের সাধ মিটাইয়া লইবার অবসর মা দিয়াছেন, এখন পদে মাথা রাখিয়া মরণের অবসর কি দিবেন না? কালিন্দী যেন আজ কোথায় যাইবার জন্য, কাহার শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কালিন্দী আজ কি মানসিক করিয়াছে; তাই বিমলা অনেক করিয়া ধরিলেও কিছু খাইল না। আহারাদি কার্য্য সমাপন হইয়া গেলে, সন্ধ্যা

আরত্রিকের আয়োজন হইতে লাগিল। কালিন্দী আনন্দিত মনে মন্দির চত্বরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। আজ তাহার দেহে কি জানি কেন নবশক্তি, মনে নব উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে। আষাঢ়ের এত বড় সুদীর্ঘ বেলা, কালিন্দী জলস্পর্শ না করিয়া বেশ মনের আনন্দে কাটাইল।

সন্ধ্যার পর আরতি আরম্ভ হইল। কালিন্দী নিঃসঙ্কোচ হৃদয়ে মায়ের মন্দিরে উঠিয়া আরতি দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালীন আরতি সন্ন্যাসী স্বয়ং সমাধা করেন—এ আরত্রিকে মায়ের চিত্তবিনোদন করিতে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পুত্রের প্রাণভরা আকিঞ্চন, দেখিলে বাস্তবিক হৃদয় গলিয়া যায়। অতি বড় পাষণ্ডও যখন এ আরতি দেখিলে মুগ্ধ হয়, তখন কালিন্দীর কোমল হৃদয় ত গলিয়া যাইবেই। কালিন্দী পুরোহিতের বামে—সন্ন্যাসীর পশ্চাতে দাড়াইয়া মায়ের সুন্দর বদনের প্রতি পলক-বিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। আরতি শেষ হইলে সন্ন্যাসী ফিরিয়া দেখিলেন—কালিন্দী পশ্চাতে দাড়াইয়া আত্মহারা হইয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"কালিন্দী! মাকে প্রণাম কর।"

কালিন্দী তখন একদৃষ্টে দেবীর সেই রক্তজবা শোভিত, বিধি-বিষ্ণু-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদের প্রতি চাহিয়াছিল। সে বলিল,—"মাকে প্রণাম করিব, তাঁকে ত অনবরতই প্রণাম করিতেছি, মাথা যে তাঁহার চরণ তলে নিয়ত পাতিয়া রাখিয়াছি—সদাসর্ব্বদাই যে ঐ অভয়পদে গড়াগড়ি দিতেছি। প্রভু! আবার নূতন করিয়া প্রণাম কেমন করিয়া করিব?"

কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী গলিয়া গেলেন। পুরোহিত কালিন্দীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বাস্তবিক কালিন্দীর দেহে কি একপ্রকার দিব্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাকে অমানুষিক ভাবে সজ্জিত করিয়াছে, মানুষের এরূপ অপরূপ রূপ তিনি আর কখন দেখেন নাই।

সন্ন্যাসীও ভাববিহ্বল হইতেছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, মা! "সমস্তদিন উপবাস করিয়াছ, মায়ের চরণামৃত খাবে কি?"

"চরণামৃত! কোথায় খাব? এ সব যে মায়ের হইয়াছে, আর স্থান কোথায়! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে মা আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন—আরত স্থান নাই।" পুরোহিত চমকিত হইলেন, বিনা তপস্যায় কালিন্দীর সৌভাগ্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী মুগ্ধ হৃদয়ে বলিলেন,—"মা! দেবীর প্রসাদী ফুল লইবে কি?"

"মায়ের পায়ের ফুল একান্তই যদি দিবেন ত মাথায় দিন।" বলিয়া কালিন্দী ধ্যানস্থা হইল। তারপর সে দৌড়িয়া বাহিরে আসিল এবং বিভ্রান্ত প্রাণে কত কি বলিতে লাগিল। কালিন্দীর এখনকার ভাব দেখিলে—স্বর্গের দেবী ভিন্ন আর কিছুই অনুমান হয় না। সে মন্দিরের রোয়াকের উপর পড়িয়া এক একবার চৈতন্য হারাইতেছে—এক একবার, "কই দেবতা আমার! মা! অভীষ্ট ফলদাত্রী! আমার দেবতাকে তুমি লুকাইয়া রাখিয়াছ- কই দাও দাও, আমার হেলায়-হারাণ-ধনকে দাও, আমি মাথায় করিয়া রাখি।" পাগলের এ প্রলাপোক্তি কেহ বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময় চারুচন্দ্র সস্ত্রীক বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আরতি দেখিয়া চামুণ্ডার মন্দিরে আসিলেন। অপরাজিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন এই ইচ্ছা। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে, তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দিদি অপরাজিতা! এই করিতেই কি তুমি আজ সমস্ত দিন অনাহার ব্রত ধরিয়াছিলে? জীবনস্রোত কেমন করিয়া ফিরাইতে হয় দিদি! তুমিই তাহার আদর্শ দেখাইলে। হায় শ্যামাচরণ! প্রভু! তুমি কোথায়! যে কন্যার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তুমি দেশত্যাগী হইয়াছ; আজ সেই কন্যার আদর্শ মৃত্যুদর্শন করিয়া, এস ধন্য হও; আসিয়া দেখ তোমার

সন্দেহ সমস্ত ভুল।” তারপর তারাদাসের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, —“ভাই তারাদাস! আর কেন, চির-অপরাধিনী অপরাজিতা আজ পদতলে বিলুণ্ঠিতা—একবার শেষ আলিঙ্গন কর—তাহার দেহ পবিত্র হউক।”

তারাদাস আর থাকিতে পারিলেন না—বুকের ভিতর যেন কিরূপ আন্‌চান্ করিতেছিল, তিনি একেবারে সেই পবিত্র দেহ বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—“অ্যাঁ অ্যাঁ! আমার যা সন্দেহ—তাই, আজ আমার উপেক্ষিতা অপরাজিতা চিরতরে ছাড়িয়া যাইতেছে!”

“উপেক্ষিতা আমি না তুমি প্রভু! আমি মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবতার অনাদর করিয়াছি, বিদ্যা ও ধনের গৌরবে—তোমাকে কত কষ্ট, ত লাঞ্ছনা দিয়াছি। আমার শিরোমণি—হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা এখন আর আলিঙ্গনের সময় নাই,—আমি হতভাগিনী, হেলায় রমণী জীবনের এ স্পর্শসুখ ত্যাগ করিয়া চিরজীবন জ্বলিয়া মরিয়াছি। আ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কৃপায়, আমার সে কষ্ট একেবারে নষ্ট হইয়াছে মরণে আর আমার ভয় নাই। এখন আর সময় নষ্ট ক'র না, মাথা পা'দুখানি দাও; সঙ্কল্প করিয়া যে ব্রত ধারণ করিয়াছি—তাহা আ উদ্‌যাপন করিব। আজ প্রাণ খুলিয়া বল—তুমি আমার সম অপরাধ ক্ষমা করিলে, তাহা হইলে আমার সদ্গতির আর কোন য় থাকিবে না।”

তারাদাস। অপরাজিতা তোমার সদ্গতির আর বাকী কি, মা (মার সহায়?

অপরাজিতা। বাকী অনেক, তুমিই ত আমার সব—দেবত অপেক্ষাও বড়, তুমি না রাখিলে মায়ের সাধ্য নাই,—তুমি আগে, তা পর মা, বল তুমি আমায় ক্ষমা করিলে?

তারাদাস আকুলপ্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“অপরাজিতা

প্রাণপ্রতিমে! বিশ্বজননী জগদম্বার সম্মুখে বলিতেছি—তোমার প্রতি আমার কোন রাগদ্বেষ নাই—মা তোমাকে পদতলে স্থান দিন।”

অপরাজিতা। হৃদয় দেবতা! মা পদতলে না রাখিলে এতদিন অপরাজিতা এ ধরাধামে থাকিত না, তোমার সহিত আবার দেখা হইত না। মা ত পদে পদে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে তোমার পদে তুলিয়া দিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা ক'রো আমি সতী কি অসতী।

তারাদাস। দেবী! ধন্য তুমি; সতী-অগ্রগণ্যা! মা তোমায় দেবলোকে স্থানদান করুন।

অপরাজিতা। প্রভু! 'অতৃপ্ত-বাসনা লইয়া মরিতেছি—মুক্তি আমার নাই, তবে জন্মাইতে যদি হয়—তাহা হইলে পরজন্মে বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যেন তোমাকেই স্বামীরূপে পাই।

সতী আর কিছু বলিতে পারিলেন না—কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বিমলা পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—“ভাই অপরাজিতা! দিদি আমার, এ ত আমাদের ফাঁকি দিয়া ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপাইয়া চলিয়া গেলে? সাক্ষাৎ সতী প্রতিমা, রমণী শিরোমণি অন্ধকারে লুকাইয়া লুকাইয়া এতদিন রহিলে, আমাদের চিনিতে দিলে না?”

অপরাজিতা। সতী! আমার প্রাণনাথের যে পদ পূজা করে, সে সতীসীমন্তিনী, জগতীতলে সে ধন্যা; মা সৌভাগ্য দিয়াছেন—মনে সাধে পতিপূজা কর।

বুকের মাঝে একটা শ্লেষ্মা ক্রমশঃ বাক্য রোধ করিতে লাগিল। সতী এইবার করযোড়ে মায়ের প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর কথা কহিলেন না।

এমন সময় আর্ত্তস্বরে একজন বৃদ্ধ দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, “কই

কই! আমার মা কই—আমার অপরাজিতা কই, আমি ভুল বুঝিয়া এমন সতীকে কলঙ্কিনী বলিয়া অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"বাবা বাবা! তোমার জন্ম-অপরাধিনী কন্যা আজ তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—তুমি এসেছ, আমায় ক্ষমা কর বাবা! দেবতা সাক্ষী, আমি কুলটা নহি।" আর কোনও কথা বাহির হইল না, সতী অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। কাশীতে শবদেহ অপবিত্র হয় না, স্বামী পূর্ণানন্দ পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই পরম পবিত্র সতীর দেহলতা কোলে করিয়া, সেই জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনীতে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন নক্ষত্ররূপ নয়ন বিস্তার করিয়া বুঝি স্বর্গের দেবতাগণ সে পবিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখনও সে মূর্ত্তি কিছু-মাত্র বিমলিন হয় নাই, যেন জীবন্ত হাসিরাশি মাখা, পূর্ণানন্দ নূতন বাস পরিধান করাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ ঘৃতচর্চ্চিত করিয়া সীমন্তে সিন্দুরশোভিত এবং পদদ্বয় অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত করিয়া বলিলেন,—"আজ আমার জীবন ধন্য হইল, এতদিনে যোগী তপস্যার সুফল জগদম্বা আমাকে প্রদান করিলেন, আমি ধন্য হইলাম।" বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় একখানি কি কাগজ বস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল—তখন আর তাহা কেহ দেখিল না। চিতা সজ্জিত করিয়া সে অনিন্দসুন্দর পবিত্রমুরতি অগ্নির লকলক রসনায় তুলিয়া দেওয়া হইল, অগ্নিদেব নিমেষ মধ্যে তাহা উদরস্থ করিলেন—সব ফুরাইল।

উপসংহার।

যখন সকলে শ্মশানে সতীর শবদেহের দাহকার্য্যে ব্যাপৃ মন্দিরগৃহে বিমলা ও পরিচারিকা অর্গলবদ্ধ করিয়া শূন্য মনে রহ যাপন করিতেছেন। তখন দেখিতে পাওয়া গেল মন্দিরসংলগ্ন মা ঘর সকল অগ্নি সংযুক্ত হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা পা ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইতে হাততালি দিয়া নাচি নাচিতে বলিতেছে,—"প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিল, সব পুড়াইয়া ছ খার করিবে। পণ্ডিত রামনিধির মেয়ে বিমলাও এখানে, অপরাজিত এখানে—এককাযে দুই কায হইল—এক তীরে দুই পাখী মরিল—স নাশী বিমলাও যে আমাকে যৌবনে অশেষ দাগা দিয়াছে।" গৃহ বদ্ধা বিমলা ও পরিচারিকা উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল খোলার ঘরের কাঠাম পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার অগ্রে দাহকারিং আসিয়া উপস্থিত হইল—শিকল খুলিয়া রমণীদ্বয়ের প্রাণ বাঁচাইল তারপর পাগলকে বাঁধিয়া পুলীশে চালান দিল। সকলে দেখিল, রমজান সেখ—প্রতিহিংসায় পাগল হইয়াছে।

সমস্ত মায়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় যে স্ত্রীলোকদ্বয়ের প্রাণ বাঁচি ইহাই যথেষ্ট। সন্ন্যাসী পরদিন অপরাজিতার নিকট প্রাপ্ত কাগঃ খানি খুলিয়া সকলের সম্মুখে পড়িলেন—অপরাজিতা তাহার সম সম্পত্তি তারাদাস ও বিমলাকে দান করিয়া গিয়াছে—দেশের বাড় খানিও ইহার সহিত দানপত্র করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখ হইল, তখনও প্রায় পাঁচহাজার টাকার সম্পত্তি বিমলার ছিল।

সন্ন্যাসী মহাসমারোহে সতীর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া তাহা ও শ্যামাচরণ প্রদত্ত অর্থে দেবী-মন্দিরের সমস্ত গৃহ ইষ্টকনির্ম্মি